বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : চল্লিশ থেকে ষাটের দশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

পিএইচডি গবেষক

মাসুদা খাতুন জুঁই

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম

ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাস্কর্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

মাসুদা খাতুন জুঁই
পিএইচডি গবেষক
নিবন্ধন নং : ১৭২/২০১৭-২০১৮ (পুনঃ)
ভাস্কর্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : চল্লিশ থেকে ষাটের দশক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার একক গবেষণার ফল। অধ্যাপক লালা রুখ সেলিমের (ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) তত্ত্বাবধানে রচিত এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি বা অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

মাসুদা খাতুন জুঁই
পিএইচডি গবেষক
নিবন্ধন নং : ১৭২/২০১৭-২০১৮ (পুনঃ)
ভাস্কর্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : চল্লিশ থেকে ষাটের দশক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষক মাসুদা খাতুন জুঁইয়ের একক গবেষণার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম
তত্ত্বাবধায়ক
ভাস্কর্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্তসার		i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iii
ভূমিকা		১
প্রথম অধ্যায়	: বাংলাদেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	: অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতা ও শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	২৪
তৃতীয় অধ্যায়	: চল্লিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ ও এস. এম. সুলতানের চিত্রকর্ম	৪০
চতুর্থ অধ্যায়	: পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত ও দেবদাস চক্রবর্তীর চিত্রকর্ম	১৪৩
উপসংহার		২১৪
গ্রন্থপঞ্জি		২২৭
চিত্রসূচি ও প্রাপ্তিস্বীকার		২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্তসার

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার শুরু হয়। চিত্রকলা যেহেতু সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকাণ্ড নয়, সে কারণে সমাজের আধুনিকতার সাথে শিল্পের আধুনিকতা যুক্ত। ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পচর্চার শুরু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্যায়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্যায়েই পশ্চিমাকরণের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার সূচনা হয়। এ অঞ্চলের আধুনিকতায় উপনিবেশবিরোধী ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের আধুনিকতার শুরু হয়। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে আধুনিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। সমাজের এ পরিবর্তন ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশ অঞ্চলে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) চলমান থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়ে শিল্পচর্চায়। জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, এস. এম. সুলতানের শিল্পশিক্ষার শুরু অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতায়। দেশবিভাগের পর তাঁরা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) চলে আসেন এবং এখানে চিত্রচর্চা অব্যাহত রাখেন। এখানে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৎকালীন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশ তাঁদের শিল্পচেতনায় প্রভাব ফেলে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রভাবে তাঁরা আত্মপরিচয় নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলার গ্রামীণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে চিত্রে নিরীক্ষার মাধ্যমে তুলে আনেন। পাশ্চাত্য বিভিন্ন রীতি যেমন কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফোবিজম প্রভৃতি রীতিকৌশলের সাথে তাঁদের চিত্রে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষয়বস্তুর এবং অনেকের ক্ষেত্রে লোকশিল্পরীতির সংশ্লেষ ঘটে। এভাবে তাঁদের চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রথম পর্যায় নির্মিত হয়। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত ও দেবদাস চক্রবর্তী (এবং এঁদের সাথে কলকাতা থেকে আসা মোহাম্মদ কিবরিয়া) প্রমুখ শিল্পী যে চিত্রভাষা নির্মাণ করেন, তাকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁরা অনেকেই পশ্চিমা দেশে শিল্পে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। চিত্রচর্চায় তাঁদের প্রধান অবদান বিমূর্ত রীতির ব্যবহার। তাঁরা এ দেশের বিষয় যেমন, সাধারণ মানুষ, গ্রাম ও শহরের পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে বিমূর্ত আঙ্গিকে প্রকাশ করেন। তাঁদের দ্বারা নির্মিত অবয়বধর্মী এবং নিরাবয়ব বিমূর্ত চিত্রভাষা আমাদের চিত্রকলার দ্বিতীয় পর্যায় নির্মাণ করেছে। এভাবে চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের ওপরে উল্লিখিত শিল্পীদের চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রচর্চার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় তৈরি হয়েছে। শিল্পীরা পাশ্চাত্য রীতিকৌশলের দ্বারা আমাদের দেশের বিষয়াবলি, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব আধুনিক চিত্রভাষা নির্মাণ করেছেন। এভাবে চল্লিশ থেকে ষাট দশক পর্যন্ত চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়েছে। এই চিত্রচর্চা বাংলাদেশের পরবর্তীকালের শিল্পচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার অভিসন্দর্ভটি লেখার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়, তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম। তাঁর তত্ত্বাবধান ছাড়া এই অভিসন্দর্ভটি আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হতো না। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত আমাকে সাহায্য করেছে যুক্তি দিয়ে আমার ভাবনাকে সুসংহতভাবে লিখতে। তিনি যত্ন নিয়ে মনোযোগসহকারে আমার লেখা সংশোধন করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ মতামত আমাকে সাহায্য করেছে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যেতে। শুধু তাঁর সুচিন্তিত মতামত নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে আমি তাঁর কাছে পেয়েছি অপার স্নেহ এবং ভালোবাসা, যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে প্রেরণা জুগিয়েছে। আমি তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ এবং তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গবেষণার অংশ হিসেবে দুটি সেমিনারের আয়োজন করেছে ভাস্কর্য বিভাগের একাডেমিক কমিটি। আমি ভাস্কর্য বিভাগের একাডেমিক কমিটির সদস্যদের নিকট কৃতজ্ঞ এই আয়োজন এবং আমাকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য। আমার সেমিনার দুটিতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শামীম রেজা চৌধুরী এবং ভাস্কর্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাসিমা হক মিতু। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছাড়া সেমিনার দুটিতে চারুকলা অনুষদের শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতি ও মতামত প্রদান আমার গবেষণায় সহায়ক হয়েছে। সেমিনারের আলোচক হিসেবে উপস্থিতি ছাড়াও অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক আমাকে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন, যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। জনাব নাসিমা হক মিতুর সাথে আমি বিভিন্ন সময়ে গবেষণার বিষয়ে মতবিনিময় করেছি। তাঁর মতামত আমার গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই চারুকলা অনুষদের গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমাকে সহায়তা করার জন্য। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক আমার গবেষণা লেখায় সহায়ক হয়েছে। ওই গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্যালারি আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছে। এ ক্ষেত্রে গ্যালারি চিত্রকের কর্মকর্তা মো. জহির উদ্দিন এবং মো. মনিরুজ্জামান, বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে কর্মরত শিল্পী জাফরিন গুলশানের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বাতিঘরের কর্মকর্তা জনাব জাফর আহমদ রাশেদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য। লেখা কম্পোজের জন্য ধন্যবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের নিম্নমান সহকারী

Dhaka University Institutional Repository

জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেনকে। চিত্রসমূহ সম্পাদনা ও কম্পোজ এবং অন্যান্য সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই অনুজপ্রতিম মো. রকিবুল ইসলাম খান তূর্যকে।

এ ছাড়া আমার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আমাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য। বিশেষভাবে আমার জীবনসঙ্গী জনাব আতিক সোহেল এবং আমার শাশুড়ি লুৎফরনাহার বেগমের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে গবেষণায় অধিক সময় ব্যয় করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সবশেষে আমার অনুজপ্রতিম সালাহউদ্দিন আহমেদ রবিনকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

প্রস্তাবনা

এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের বিশ শতকের '৪০, '৫০ ও '৬০–এই তিন দশকের চিত্রকলার আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিত্রভাষার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার চর্চা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে এই চিত্রকলা চর্চার প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে এর বিকাশ ও চর্চা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই জানার অভিপ্রায় থেকে এই অভিসন্দর্ভের সময় '৪০, '৫০ ও '৬০-এর দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। '৪০-এর দশকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার চর্চা শুরু হয়। '৪০ থেকে '৬০-এর দশকে চিত্রকলা চর্চার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু চিত্রভাষা গড়ে ওঠে, যা আমাদের আধুনিক চিত্রকলার চর্চাকে চিহ্নিত করে। এই তিন দশকের মধ্যে কী চিত্রভাষা গড়ে উঠল এবং কীভাবে গড়ে উঠল, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করার উদ্দেশ্যেই এই গবেষণাকর্মটি করা হয়েছে।

সাহিত্য সমীক্ষা

বাংলাদেশের '৪০, '৫০ ও '৬০-এর দশকের চিত্রচর্চা নিয়ে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু গবেষণাকর্ম, প্রবন্ধ ও বই রচিত হয়েছে। এসবের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, *কামরুল হাসান*, *দেশজ আধুনিকতা : সুলতানের কাজ*, *চিত্রশিল্প : বাংলাদেশের* বইসমূহের কথা। এসব বইয়ে লেখক শিল্পীদের শিল্পকর্ম আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। আবুল মনসুরের *জয়নুল আবেদিন* বইতে শিল্পীর চিত্রকর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে। আবুল মনসুরের *শিল্পকথা শিল্পীকথা* বইয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধে এই তিন দশকের শিল্প ও শিল্পীদের নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে "পঞ্চাশ-ষাটের শিল্পরূপ : 'ভালোমন্দ মিলায় সকলি'" একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। নজরুল ইসলামের *জয়নুল আবেদিন : তাঁর কাজ ও কথা* বইটিতে সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে শিল্পী ও তাঁর কাজ নিয়ে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাহমুদ আল জামানের *সফিউদ্দীন আহমেদ* ও *কাজী আবদুল বাসেত*, আনিসুজ্জামানের *দেবদাস চক্রবর্তী*, ওসমান জামালের *আমিনুল ইসলাম*, হাসনাত আবদুল হাইয়ের *মুর্তজা বশীর*, মফিদুল হকের *কাইয়ুম চৌধুরী*, সাদেক খানের *এস. এম. সুলতান*, নজরুল ইসলামের *জয়নুল আবেদিন* ও *আবদুর রাজ্জাক*, সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের *মোহাম্মদ কিবরিয়া*, সৈয়দ আজিজুল হকের *কামরুল হাসান*, রবিউল হুসাইন ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের *সৈয়দ জাহাঙ্গীর* গ্রন্থগুলোতে শিল্পীর জীবন, শিল্পমানস ও শিল্পকর্ম কীভাবে গড়ে উঠল ও বিকশিত হলো তা আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প ও শিল্পী পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের 'জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান : বাঙালির কল্পচিত্রের কারুকার', 'মোহাম্মদ কিবরিয়া নতুন যুগের উদ্‌ঘাটন', 'কামরুল হাসানের চিত্রকলা', নজরুল ইসলামের 'বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের শিল্প ও শিল্পী', 'কাইয়ুম চৌধুরীর ছবি', 'ষাটের দশকের শিল্প ও শিল্পী : বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রাধান্য', আবুল মনসুরের "ঔপনিবেশিক ভারতের 'আধুনিক' শিল্পধারা বনাম জয়নুল আবেদিন", 'জন্মদিনে ফিরে দেখি : রশিদ চৌধুরী', 'দৃশ্যকলার সন্ধিক্ষণ সফিউদ্দিনের গুরুত্ব' ইত্যাদি প্রবন্ধ শিল্পী, তাঁর কাজ ও তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতের সাথে শিল্পীর কাজের সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত লালা রুখ সেলিমের সম্পাদনায় *চারু ও কারু কলা বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* বইটিতে আবুল মনসুরের 'ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল' নিসার হোসেনের 'জয়নুল আবেদিন', সৈয়দ আজিজুল হকের 'কামরুল হাসান' ও 'কাইয়ুম চৌধুরী', শোভন সোমের 'সফিউদ্দীন আহমেদ', শাওন আকন্দের 'এস. এম. সুলতান', মইনুদ্দীন খালেদের 'হামিদুর রাহমান' ও 'আমিনুল ইসলাম', মাহমুদুল হোসেনের 'মোহাম্মদ কিবরিয়া' নাসিমা হক মিতুর 'রশিদ চৌধুরী' ও 'আবদুর রাজ্জাক' এবং ঢালী আল মামুনের 'মুর্তজা বশীর' গবেষণামূলক সমৃদ্ধ প্রবন্ধ।

সৈয়দ আজিজুল হকের *সফিউদ্দীন আহমেদ* নামক বইটিতে শিল্পীর শিল্পকর্মের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ রয়েছে। এ ছাড়া সৈয়দ আজিজুল হকের *কামরুল হাসান জীবন ও কর্ম* এবং *জয়নুল আবেদিন সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র* বই দুটি শিল্পীর জীবনবৃত্তান্তের গবেষণামূলক উপস্থাপন।

শিল্পীর আত্মজীবনী এবং স্মৃতিচারণামূলক লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমিনুল ইসলামের *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর প্রথম পর্ব ১৯৪৭-১৯৫৬* এবং মুর্তজা বশীরের *আমার জীবন ও অন্যান্য*। তাঁদের সময়ের শিল্পচর্চা ও সাংস্কৃতিক ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের চিত্র পাওয়া যায় বই দুটিতে।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

আমার গবেষণাকর্মটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক–উভয় উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস অর্থাৎ চিত্রকর্মের ক্যাটালগ, চিত্রকর্ম ও শিল্পীকে নিয়ে বিভিন্ন লেখকের লেখা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বেশি। শিল্পীদের নিজের লেখা, বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত চিত্রকর্ম ইত্যাদি প্রাথমিক উৎস হিসেবে গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায় বিন্যাস

অভিসন্দর্ভটি চারটি অধ্যায় এবং উপসংহারে বিন্যাস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া'। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া দিয়ে এ আলোচনা শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের '৬০-এর দশক পর্যন্ত আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য কী, তা আলোচনায় এসেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কীভাবে এ অঞ্চলের নিজস্ব আধুনিকতা গড়ে ওঠে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনা, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের নীতিনির্ধারণ কীভাবে এ অঞ্চলের সমাজ এবং ভাবনার জগতে পরিবর্তন আনে, তা আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের অসম বিকাশকে চিহ্নিত করে এ আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। দেশবিভাগের পর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান) পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিবাদ এবং বাংলা ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে কীভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করে, তা আলোচনা করা হয়েছে। এরই সূত্র ধরে স্বাধিকার আন্দোলন এবং এ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বর্ণনা এসেছে। সমাজকাঠামোর আধুনিকায়ন বা এই সার্বিক পরিবর্তন কীভাবে যে কোনো একজন ব্যক্তিকে শিল্পী হওয়ার ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করে, তা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতা ও শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'। এখানে অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতা ও শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার প্রধান দিকগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বে সার্বিকভাবে শিল্পচর্চার জগতে যে পরিবর্তন আসে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমা আদলে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং স্বভাববাদী রীতির বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। চিত্রচর্চা কীভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবনা এবং প্রাচ্যতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হলো, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বভাববাদী রীতির প্রতিক্রিয়ায় অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব রীতির উদ্ভাবন, কী উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ধরন কেমন ছিল–এ বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চিত্রচর্চার অগ্রপথিকেরা কোন প্রেক্ষাপটে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন, তা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'চল্লিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ ও এস. এম. সুলতানের চিত্রকর্ম'। এই অধ্যায়ে এই চারজন শিল্পীর '৪০ থেকে '৬০-এর দশক পর্যন্ত চিত্রকর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক মননের বিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ চারজন শিল্পীর কলকাতা পর্বের চিত্রকর্ম আলোচনা করা

হয়েছে এবং কীভাবে তাদের চিত্রকর্ম একাডেমিক গণ্ডি অতিক্রম করেছিল, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেশভাগের পর তাঁরা যখন বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) চলে আসেন, তখন এখানকার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁদের কীভাবে প্রভাবিত করল, তা আলোচনা করা হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনা তাদের কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা আলোচনায় এসেছে। এ পর্যায়ে তাদের চিত্রভাষা কীভাবে বিকশিত হলো, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। তাঁদের ব্যক্তিমানস, দেশপ্রেম, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনা, বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পাশ্চাত্য চিত্রভাষা–এসবের সমন্বয়ে কীভাবে তাদের নিরীক্ষামূলক চিত্রকর্ম গড়ে উঠল, তা আলোচনা করা হয়েছে। '৪০ থেকে '৬০-এর দশকের মধ্যে করা এ চারজন শিল্পীর চিত্রভাষাকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি '৪০ থেকে '৬০-এর দশকের মধ্যে তাদের চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার প্রথম পর্যায়ে কীভাবে নির্মিত হলো, তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত এবং দেবদাস চক্রবর্তীর চিত্রকর্ম'। এই শিল্পীদের চিত্রকর্মের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের চিত্রভাষার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তাঁদের চিত্রভাষার সাথে '৪০-এর দশকের শিল্পী অর্থাৎ জয়নুল, কামরুল ও সফিউদ্দীন আহমেদের চিত্রভাষার পার্থক্য কী, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। তাঁদের চিত্রচর্চায় জয়নুল আবেদিনের শিল্পদর্শন আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের শিল্পীজীবন সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। নিরীক্ষামূলক চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে পাশ্চাত্যে বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের প্রভাবে তারা কীভাবে অবয়বধর্মী এবং নিরাবয়ব বিমূর্ত রীতির চর্চা শুরু করেন, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোন বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তাদের বিমূর্ত চিত্রচর্চা বিকশিত হয়, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার নেতৃত্বে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম কীভাবে একটি প্রাধান্য বিস্তারকারী চিত্রভাষা হয়ে উঠল, এর পশ্চাতে কী রাজনীতি ক্রিয়াশীল ছিল, সে সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য এই রীতিকে এই পর্বের শিল্পীরা কীভাবে আত্মস্থ করলেন, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূলত বিমূর্ত রীতি চর্চার মধ্য দিয়ে এ পর্বের শিল্পীরা কীভাবে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রচর্চার দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণ করল, তার বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

উপরিউক্ত চারটি অধ্যায়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের '৪০ থেকে '৬০-এর দশকের চিত্রচর্চার যে দৃশ্যটি উঠে আসে, তার মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে উপসংহারে। বাংলাদেশের '৪০-এর দশকের শিল্পীরা তাঁদের নিরীক্ষামূলক চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার প্রথম পর্যায় নির্মাণ

করেন। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীরা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুল থেকে পাস করে (মোহাম্মদ কিবরিয়া ব্যতীত) '৫০ থেকে '৬০-এর দশকের মধ্যে নতুনভাবে চিত্রভাষা নির্মাণ করে চিত্রচর্চার আরো একটি পর্যায় সৃষ্টি করেন। দুই পর্বেই দেশজ অভিজ্ঞতার সাথে সম্মিলন ঘটে পাশ্চাত্য আধুনিক চিত্ররীতির কৌশল। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় আমাদের নিজস্ব আধুনিক চিত্রভাষা। এই চিত্রভাষাকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

আমার গবেষণাকর্মটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে (Qualitative Research Method) করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য প্রধান এবং মাধ্যমিক–উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস অর্থাৎ চিত্রকর্মের ক্যাটালগ, চিত্রকর্ম ও শিল্পীর ওপর লিখিত বিভিন্নজনের লেখা ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বেশি।

অন্যান্য সীমানা

আমার গবেষণাকর্মে যেসব শিল্পীর চিত্রকর্ম আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের সকলেই প্রয়াত। সে কারণে শিল্পীদের সাথে সরাসরি কথা বলার কোনো সুযোগ ছিল না। বিভিন্ন কারণে শিল্পীদের '৪০ থেকে '৬০-এর দশকের অধিকাংশ চিত্রকর্মই সরাসরি দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। অল্প কিছুসংখ্যক চিত্রকর্ম বিভিন্ন গ্যালারি ও সংগ্রহশালার সৌজন্যে দেখার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটালগ বা গ্রন্থে অধিকাংশ চিত্রের ছাপানো ছবি প্রত্যক্ষ করে গবেষণার কাজ করতে হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া

এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের বিশ শতকের '৪০ থেকে '৬০-এর দশকের চিত্রচর্চা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। চিত্রচর্চা বা সামগ্রিক অর্থে শিল্পচর্চা সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকাণ্ড নয়। তাই কোনো দেশ বা সমাজের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতির দ্বারা শিল্পচর্চা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়। সমাজের আধুনিকতার সঙ্গে শিল্পের আধুনিকতার যোগসূত্রের কারণে আধুনিক চিত্রচর্চা আলোচনার আগে দেশ ও সমাজের আধুনিকায়নের আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ ছিল। ১৯৪৭ সালের আগে বাংলাদেশ বা পূর্ব বাংলা অখণ্ড ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিকায়ন শুরু হয়। সমাজের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। প্রাচীন বা মধ্যযুগে শিল্প ধর্মকে আশ্রয় করে অথবা শাসক বা অভিজাত শ্রেণির তত্ত্বাবধানে নির্মিত হতো। কিন্তু আধুনিক সময়ে এসে শিল্প স্বতন্ত্র নির্মাণপ্রক্রিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পী ব্যক্তিক অথবা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন এবং তাঁর কর্মের অনন্যতার চেতনা বিকশিত হয় (Burger, 1992: 57)।[১] পশ্চিমা বিশ্বে আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে ১৮৫০ থেকে ১৯৫০–এ সময় ছিল নজিরবিহীন নিরীক্ষার যুগ (Cahoone, 1996 : 13)।[২] এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। ব্রিটিশ শাসনের একপর্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশে চিত্রচর্চায় পাশ্চাত্য আধুনিকতার লক্ষণগুলো, যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরীক্ষাধর্মিতা প্রকাশ পেতে থাকে। এর সঙ্গে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়, যা এ অঞ্চলের চিত্রচর্চার একান্ত নিজস্ব, তা হলো আত্মপরিচয় নির্মাণ। বৈশিষ্ট্যটি কেন এবং কীভাবে আমাদের আধুনিকতার অংশ হলো, সে ব্যাখ্যায় যেতে আমাদের ইউরোপের আধুনিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হবে।

আধুনিকতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সাম্রাজ্যবাদ। ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে আধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়া ছিল আধুনিকতার অন্যতম দিক। ইউরোপের জাতিগুলো অ-ইউরোপীয় দেশগুলোতে উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের শাসন বিস্তার করে (Aschroft et al. 2007 : 131)।[৩] এখন প্রশ্ন আসে, উপনিবেশভুক্ত অঞ্চলগুলোতে কীভাবে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনগুলো প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে :

> Paradoxically, anti-colonialist movements often expressed themselves in the appropriation and subversion of forms borrowed from the institutions of the colonizer and turned back on them. Thus the struggle was often articulated in terms of a discourse of anti-colonial 'nationalism' in which the form of

the modern European nation-state was taken over and employed as a sign of resistance' (Ashcroft et al. 2007 : 12).

এ কারণে উপনিবেশভুক্ত অঞ্চলগুলোতে যে আধুনিকতা জন্মলাভ করেছে বা বিকশিত হয়েছে, তাকে গীতা কাপুর সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, '...as modernism evolves in conjunction with a national or, on the other hand, revolutionary culture, it becomes reflexive' (Geeta, 2001 : 276)। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ধার করে জাতীয়তাবাদের ছক নিয়ে এ অঞ্চলের আধুনিকতা তৈরি হয়েছে। ভারতীয় সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশ অনন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আধুনিক ধারণার আত্তীকরণের পরও তাদের একটা জাতীয় পরিচয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। আধুনিক ভারতের অগ্রপথিকদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে সম্মিলন ঘটে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উদীয়মান জাতীয়তাবাদের ধারণা (Geeta, 1982 : 5)।[৪] উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণের এ সময়টিতে নতুন শিল্পীরা পশ্চিমা ভাবনা, রীতি ও কৌশলের দীক্ষা নিয়ে তার মাধ্যমে তাঁদের আধুনিক সত্তা গঠন করার পরও প্রণোদিত হলেন তাদের ঔপনিবেশিক অবস্থান এবং পশ্চিমা পরিচয় অতিক্রম করতে। তাই শিল্পীরা অতীতের থেকে বিষুক্ত হওয়ার (অর্থাৎ আধুনিক সত্তা গঠন করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাবনা ও ধ্যানধারণা থেকে আলাদা হওয়া) পাশাপাশি অতীত থেকে যথাযথ নির্বাচিত উপাদান (জাতীয়তাবাদ দ্বারা পুনরুদ্ধার, পরিশুদ্ধ ও পুনঃকল্পিত) গ্রহণ করলেন এ অঞ্চলের নতুন শৈল্পিক ভাষা নির্মাণে (Tapati, 1995 : 8)।[৫] এভাবে আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রচেষ্টা শিল্পে পরিস্ফুট হয়। এ কারণে এ অঞ্চলে ইউরোপ থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক শিল্প তথা চিত্রচর্চার যাত্রা শুরু হয়। যেহেতু আধুনিকতার এ লক্ষণগুলো পরিবর্তনশীল সমাজ থেকেই উৎসারিত হয়েছে, সে কারণে আধুনিক চিত্রচর্চার স্বরূপ বুঝতে গেলে সমাজের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার কিছুটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া কোনো সরলরৈখিক ব্যাপার ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা, ধ্যানধারণা, ভাবাদর্শ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নগরায়ণের ধরন প্রভৃতি এ অঞ্চলের বিদ্যমান সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষকে অসমভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষ যে সমানভাবে পাশ্চাত্যকে অভিযোজন করবে না, এটা স্বাভাবিক ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু সম্প্রদায় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে যেভাবে আধুনিকতার গোড়াপত্তন করেছিল, মুসলিম সম্প্রদায়ের সেভাবে এ পর্যায়ে আসতে সময় লেগেছে অনেক বেশি। এই ব্যবধানের বহুবিধ কারণ ছিল। দুই সম্প্রদায়ের এই ব্যবধান শেষ পর্যন্ত ভারতভাগের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাকে সম্ভব করে তুলেছিল।

পুরোনো মূল্যবোধকে ত্যাগ করে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লেষের মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তায় আত্মজাগরণের প্রক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেই সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক পর্বের আধুনিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এ কারণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকপর্বে এ

উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য বা প্রাসঙ্গিক দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় হিন্দু ও মুসলিম–দুই সম্প্রদায়ের অগ্রযাত্রাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) সমাজ ও সংস্কৃতিতে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া কী রূপ নিয়েছিল, তারও বিশ্লেষণ রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ এবং ব্যবধানকে সামনে রেখে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) দ্বিজাতিতত্ত্বের গুরুত্ব কতটা ছিল, তা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে যে অগ্রগতি বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে অসম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানা আন্দোলন-সংগ্রাম।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ফলে দরবারি চিত্রচর্চা ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয় এবং ইংরেজদের চাহিদামতো এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রচর্চা শুরু হয়। সময়ের সাথে সাথে পশ্চিমা জগতের সংস্পর্শে এসে শিল্পীরা আত্মচেতনাসঞ্জাত চিত্র নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হয়। তবে সমাজের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের সময়ের ব্যবধানে আধুনিক চেতনার বিকাশ এবং আদর্শের ভিন্নতা চিত্রচর্চাকে প্রভাবিত করেছে। বিভাগ-পূর্ব সময়ে নবজাগরণের ফলে উচ্চ শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে যে পদচারণ ছিল, সেখানে মুসলমান শিল্পীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। দেশবিভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলমান শিল্পীরাই আধুনিক চিত্রচর্চার গোড়াপত্তন করেন। উল্লেখ্য যে এই মুসলমান শিল্পীরা বিভাগ-পূর্ব সময়ে কলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এ কারণে কলকাতাকেন্দ্রিক বা অবিভক্ত ভারতের আধুনিক চিত্রচর্চার সাথে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্র আন্দোলনের যোগসূত্র আছে।

এই অধ্যায়ে ইংরেজ শাসনের সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং দেশবিভাগের পর মুক্তিযুদ্ধের আগপর্যন্ত বাংলাদেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি পরিবর্তনশীল সমাজকাঠামোর চেহারা দৃশ্যমান করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে দরবারি চিত্রচর্চার অবসান হয়ে নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকের মাধ্যমে চিত্রচর্চা শুরু হচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় দেশবিভাগের পর বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রচর্চার সূচনা ও বিকাশ হচ্ছে।

'ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে আমাদের সমাজের আধুনিকতার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে' (শেখর, ২০১২ : ১)। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হাওয়া বয়। পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে এসে ধীরগতিতে হলেও এ অঞ্চলে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ব্রিটিশ শাসন এ উপমহাদেশের প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরায়। গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ত অর্থনীতির পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করে এ অঞ্চল। পশ্চিমা রুচির আদলে নগরায়ন প্রক্রিয়া

শুরু হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সামাজিক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে এবং এই নতুন শ্রেণি সমাজের অগ্রগতি এবং আধুনিক সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করে। উনিশ শতকের শুরু থেকে যে আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তার জন্য অনেকটাই দায়ী ছিল এই বিদেশি শাসনের নানা ধরনের নীতি (শেখর, ২০১২ : ১)।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্য একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজনে ১৭৮৪ সালে প্রণীত পিটস ইন্ডিয়া আইনের অধীনে লর্ড কর্নওয়ালিসকে নিয়োগ দেওয়া হয় (সিরাজুল, ২০০৭ : ৮)। কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে ভূমিনীতি ঘোষণা করেন এবং এ ব্যবস্থাকে সফল করতে ও টিকিয়ে রাখতে প্রবর্তিত হয় বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থা (সিরাজুল, ২০০৭ : ৯)। নবাবি আমলের হিন্দু রাজস্ব সংগ্রহকারীদের হাতে নগদ অর্থ মজুত থাকার কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে তারা জমিদারি লাভ করতে পারলেন এবং নিজেদের পুনর্গঠনের সুযোগ পেলেন। নগদ অর্থের অভাবে মুসলমানরা এই সুযোগ এবং পুনর্গঠন থেকে বঞ্চিত হলেন (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৩১-৩২)। তবে শাসক শ্রেণি ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা আগে থেকেই পশ্চাৎপদ ছিল। নবাবদের শাসনকালে উচ্চবর্ণের হিন্দু বানিয়া, মুৎসুদ্দি, বড় জমিদার এবং প্রশাসনের আমলারা ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণি। নবাবি শাসকেরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিয়ে একটি আমলা শ্রেণি গঠন করেছিলেন। নবাবি শাসনের সময়ে রাষ্ট্রের সামরিক ও বিচার বিভাগ ছিল অস্থানীয় মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। স্থানীয় মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ছিল এবং ছিল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (সিরাজুল, ২০০৭ : ১৩)। স্থানীয় মুসলমানরা পেশাগতভাবে ছিল কৃষক, তাঁতি, কারিগর, ধোপা ইত্যাদি (সিরাজুল, ২০৭ : ১৬)। এ অবস্থায় ইংরেজদের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ মুসলমানদের আরো পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

ইংরেজি ভাষাকে ১৮৩৫ সালে শিক্ষার মাধ্যম এবং ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ফলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতরাই শুধু সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৪৫)। এ ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের তুলনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ কথা সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে 'ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ইংরেজ শাসনের প্রতি ঘৃণাবশত এ দেশের মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।' মূলত 'আর্থিক সংগতির অভাবই বাঙালি মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল' (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯, ৪৫-৪৬)। মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পেছনে আরো একটি কারণ হলো লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ। অনেক অভিজাত মুসলমানের ভরণপোষণের জন্য সম্রাট নিষ্কর ভূমি প্রদান করতেন যাকে লাখেরাজ সম্পত্তি বলা হতো। উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজ প্রশাসন লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করে এবং এসব জমির ওপর কর আরোপ করলে অভিজাত মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (সিরাজুল, ২০০৭ : ১৭)। এভাবে ঔপনিবেশিক পর্বের শুরু

থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। ইংরেজ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের ফলে অভিজাত মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ক্ষতি বেশি দেখা যায়। কারণ, 'একশ্রেণির হিন্দু ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পেশা থেকে চ্যুত হলেও আরেক শ্রেণির হিন্দু এসে সে শূন্যতা পূরণ করেছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এরা শুধু হারিয়েছে, এদের মধ্যে থেকে অন্য কোনো শ্রেণি এ শূন্যতা পূরণ করেনি' (সিরাজুল, ২০০৭ : ১৭)।

আঠারো শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল পাঠশালা, টোল ও মাদ্রাসা। হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থী গ্রামের পাঠশালায় লেখা, পড়া ও অঙ্ক করা শিখত। উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দুদের ছিল টোল ও মুসলমান ছাত্রের জন্য ছিল মাদ্রাসা। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাহিত্য ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, আইন প্রভৃতি শেখানো হতো। অভিজাত শ্রেণি, জমিদার, রাজা, নবাব প্রমুখের দানে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। পলাশী যুদ্ধের আগেই ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। যদিও ইংরেজ প্রশাসক প্রথম দিকে এই প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, যার ফলে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং কাশীতে জোনাথান ডানকান গড়ে তোলেন সংস্কৃত কলেজ। তবে আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ইংরেজ প্রশাসন ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ তারা মনে করে প্রশাসন পরিচালনার জন্য ইংল্যান্ড থেকে বেশি বেতন দিয়ে কর্মচারী আনার চেয়ে ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করলে তাদের ব্যয় কম হবে। অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক সংস্থাগুলো ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন চেয়েছিল। কারণ তারা মনে করত এর ফলে ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করা সহজ হবে। এ ছাড়া অনেক উদার মানবতাবাদী ইংরেজ যেমন উইলবার ফোর্স ও ডেভিড হেয়ারের মতো মানুষেরা ভারতবর্ষকে 'কুসংস্কারাচ্ছনতা' থেকে মুক্তি দিতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন চেয়েছিলেন। শুধু ইংরেজরাই নয় রামমোহন রায়ের মতো এ দেশের মানুষেরা 'মধ্যযুগীয় মানসিকতায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলেন' (সুবোধ, ২০০৯ : ২৩০)। এসব দাবির ভিত্তিতে ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্টের ৪৩ ধারায় ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয় এবং বছরে ১ লাখ টাকা বরাদ্দ করে। ১৮২৩ সালে গঠন করে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (GCPI)। তবে এই কমিটির সদস্যদের শিক্ষানীতির বিষয়ে মতভেদ থাকার কারণে তারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি (সুবোধ, ২০০৯ : ২৩১)। ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গভর্নর জেনারেলের আইনবিষয়ক উপদেষ্টা এবং শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত টি বি মেকলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানোর কথা বলেন। তাঁর শিক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদনে তিনি 'সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন'। 'মেকলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী হিসেবে তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরি করতে

চেয়েছিলেন। এরা বর্ণে ও রক্তে হবে ভারতীয়, রুচি, আদর্শ ও চিন্তায় হবে ইংরেজ'। ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসে মেকলের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারিভাবে শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন (সুবোধ, ২০০৯ : ২৩২)।

কাজেই ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল এবং শিক্ষার বিস্তারও সীমিত রাখা হয়েছিল শহরে বসবাসকারী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুদের মাঝে (আবদুল মওদুদ, ১৯৬৯ : ৯৮)। বাংলায় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ হয়েছিল এই শ্রেণির দ্বারা। এদের দ্বারাই বাংলা ভাষায় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং আধুনিক চিত্রকলার জন্ম হয়। এদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে স্বদেশচেতনা এবং জাতীয়তাবোধ। ক্রমে এই গোষ্ঠী রাজনীতিসচেতন হয়ে ওঠে এবং সভা, সমিতি প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ ঘটাতে আরম্ভ করে। শুধু শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, অর্থনৈতিক পরিবর্তনও এসবের জন্য দায়ী ছিল। ব্রিটিশ শাসনের সময়েই ভারতে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় (এ আর দেশাই, ২০০১ : ৮৫)। এটি সম্ভবপর হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল রেলপথ, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়। এ সময় পর্যন্ত এ অঞ্চলে ইংরেজরাই ছিল 'আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ'। তারা নীল, চা, কফি প্রভৃতি বাগানশিল্প শুরু করে। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রথম সুতাকল, কয়েকটা চটকল বা পাটকল এবং কয়লাখনির কাজ শুরু হয়। ১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষে ৫৬টি সুতাকল, ১৮৮০ সালে ৫৬টি কয়লাখনি এবং প্রধানত ইউরোপীয় মালিকানায় ১৮৮২ সালে ২০টি পাটকল চলছিল (এ আর দেশাই, ২০০১ : ৮৬)। অনেক কারণে ভারতবর্ষে শিল্পের উন্নয়ন অপ্রতুল ও ভারসাম্যহীন থাকলেও এর প্রভাবে যে নগরের জন্ম হয়েছিল, তা নানা প্রগতিশীল আন্দোলন উদ্ভূত হওয়ার প্রেক্ষাপট হয়েছিল (এ আর দেশাই, ২০০১ : ৮৫)।

যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভৃতির অভিঘাতে শুধু যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে সংস্কার আন্দোলন এবং আধুনিক চেতনার জন্ম হয়েছিল, তা নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আধুনিক জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনচেতনার আলোকে যে নতুন মুসলমান-মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্মসম্ভাবনা দেখা দিল, তা পূর্ণাঙ্গ শ্রেণিচরিত্রে রূপ পেয়েছিল বিশ শতকের সূচনাপর্বে (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৫)। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এ মুসলমান প্রজন্মের মধ্য থেকে অনেকেই শিক্ষকতা, আইন, সাহিত্যচর্চা, সাংবাদিকতা এবং অন্যান্য পেশা গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্য থেকেই আবির্ভাব হয় বিশ শতকের আধুনিক মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণি (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৬০)।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান সমাজের নিষ্ক্রিয়তা, নির্জীবতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে সমাজের জাগরণ সম্ভব হয়নি। এই সময় কলকাতার মুসলমান সমাজ নিষ্ক্রিয় থাকলেও গ্রামের মুসলমান সমাজ বেশ সক্রিয় ছিল। এ সক্রিয়তার প্রকাশ হলো ২৪ পরগনায় তিতুমীর, ফরিদপুরের হাজি শরীয়তউল্লাহ ও দুদু মিয়া এবং ওহাবি নেতৃত্বের ধর্মসংস্কার আন্দোলন। "এসব আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব থাকলেও 'শ্রেণি সংগ্রামে'র একটা অন্তর্লীন রূপ ছিল। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টাননির্বিশেষে জমিদার-নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়" (ওয়াকিল, ১৯৮৩ : ৩৭)। এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধ মতবাদ প্রচার করা। এটি আরবের ওহাবি আন্দোলন থেকে উৎসাহ লাভ করেছিল (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯ : ৫১)। বাংলায় ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে রানা রাজ্জাক লিখেছেন :

> ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের সময় থেকেই বাংলায় ইসলাম মিথস্ক্রিয় উপাদান বহন করছিল। যেহেতু বেশির ভাগ মুসলিম, বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, সেহেতু তারা তাদের আদি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রথা বজায় রেখেছিল। এর ফলে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা জোরালো মিথস্ক্রীয় ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। মুসলিম সুফি-সাধক এবং হিন্দু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গ মধ্যযুগ থেকেই মিথস্ক্রীয় ইসলাম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (রানা, ২০০৭ : ১৩৩)।

সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে ওহাবি চিন্তাধারা ম্রিয়মাণ হতে থাকে এবং ব্রিটিশদের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়। ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের নীতির পরিবর্তন করে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য নতুন নীতি গ্রহণ, চাকরিতে নিয়োগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। এ কারণে মুসলমানরা তাদের চিন্তা ও মনোভাবে পরিবর্তন আনেন এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে মুসলিম সমাজকে পুনর্বিন্যাস এবং আধুনিক শ্রেণি হিসেবে গড়ে তোলার আন্দোলন শুরু করেন (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৬০)।

মুসলমান চিন্তাবিদেরা দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। এক ধারায় সংস্কারবাদীরা সম্পূর্ণভাবে শরিয়া মতবাদ অনুসারে সমাজকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। অন্য ধারায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদী চর্চার মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে গতিশীল করে তোলার প্রগতিশীল ভাবনা কাজ করছিল। এই ধারার চিন্তাবিদেরা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে, উভয় সম্প্রদায়ের মিলনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পক্ষে ছিলেন। এ চিন্তাধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক, স্যার আবদুর রহিম, আবদুল করিম গজনভী প্রমুখ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৬১)। এ সময় মুসলিম সমাজের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো বাংলা ভাষার চর্চা। যদিও মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানরাই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের ভাষানীতি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তারা সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে বাংলার পরিবর্তে আরবি,

ফারসি ও উর্দুকে স্থান দেন। উনিশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিকাশ ঘটে, সেখানে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অবদান খুবই কম (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৬১)। 'উনিশ শতকে নওয়াব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আমীর আলীসহ সকল মুসলমান সংস্কারক বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা হিসেবে গণ্য করেন এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে ফারসি, আরবি ও উর্দুকে মুসলমানদের ভাষা হিসেবে অভিহিত করেন' (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৬২)। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকে গ্রামাঞ্চলে পাট অর্থনীতির প্রসার ঘটলে, এই ব্যবসা থেকে উপার্জিত সম্পদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে একটি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে, যারা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয়। এই শ্রেণি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মর্যাদা দিয়েছিল এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শুধু সাহিত্য সৃষ্টি নয়, ধর্মীয় কাজেও এই ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিল। এ ছাড়া বাঙালি সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখেই তারা সকল ধরনের সংস্কারে আগ্রহী ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' (১৮৯৯) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলা (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৬২)। বিশ শতকের শুরুতে এই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির আর একটি প্রকাশ হলো মুসলমানদের জন্য শিক্ষা সমিতি গঠন করা। যেমন ১৯০৩ সালে 'প্রাদেশিক মুসিলম শিক্ষা সমিতি' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল 'বিজ্ঞান, সাহিত্য ও পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রতি সাধারণ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা'। এ ছাড়া 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয় ১৯০৩ সালে এবং 'চট্টগ্রাম মুসলমান শিক্ষা সভা' গঠিত হয় ১৮৯৯ সালে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'মোহাম্মদী', 'দি মুসলমান' প্রভৃতি পত্রিকা এই সমিতিগুলো এবং ব্যক্তিগত সংস্কারকগণের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৬৩)।

এভাবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, পশ্চিমা যুক্তিবাদী ভাবাদর্শ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্ম, বাংলা ভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় নির্মাণ–প্রভৃতির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে জীবনচেতনায় পরিবর্তন আসে। এ ছাড়া একই প্রকার শাসনপ্রণালি, স্থানীয় শাসন প্রবর্তন এবং আইনব্যবস্থার ফলে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবাদর্শ ও রাজনীতিসচেতনতা জন্মলাভ করে। এই সামাজিক ঐক্যবোধ ও রাজনীতিসচেতনতা তাদের জাতীয়তাবোধ ও বিভিন্ন দল গঠনে প্রেরণা জোগায় (ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম et al. ২০১৩ : ৩৮৩)।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বিভিন্ন সভা-সমিতি, সংগঠন গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে জাতীয় সচেতনতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছিল। এসব সংগঠনের অধিকাংশই পেশার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। যেহেতু ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে যেসব পেশাজীবী শ্রেণি জন্মলাভ করেছিল তার প্রায় সবাই ছিল হিন্দু, সে কারণে প্রথম দিকের সংগঠনগুলো হিন্দুদের দ্বারা গঠিত ছিল। উল্লেখযোগ্যগুলোর মধ্যে ছিল 'জমিদারি অ্যাসোসিয়েশন'

(১৮৩৭), 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ন্যাশনাল ফিলিং' (১৮৬৬), 'হিন্দু মেলা' (১৮৭৫), 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬) প্রভৃতি। এসব সংগঠনের চূড়ান্ত রূপ ছিল 'জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫)। অন্যদিকে মুসলমানরাও এর বিপরীতে 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি অব ক্যালকাটা' (১৮৬৩), 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৭)-সহ স্থানীয় পর্যায়ে অসংখ্য আঞ্জুমান গঠন করেছিল। এসব সংগঠনের পরিণতি ছিল 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' (১৯০৬) (সিরাজুল, ২০০৭ : ২২)।

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার ফলে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্মানো স্বাভাবিক ছিল। আর এ আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত প্রয়াসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে ব্রিটিশ সরকারের আরও কিছু পদক্ষেপ এ অঞ্চলের ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেসিক শাসন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি তৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই তাৎপর্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জন আর ম্যাকলেন লিখেছেন :

> ...বঙ্গভঙ্গের অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের যোগদানের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের বিকাশের যেকোনো সম্ভাবনা বিনষ্ট করা। ...বঙ্গভঙ্গ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি প্রচেষ্টা। পাশাপাশি এর লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস থেকে স্বতন্ত্র একটি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ জাগিয়ে তোলা এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শক্তি গড়ে তোলা (জন আর ম্যাকলেন, ২০০৭ : ১৫২)।

মূলত ব্রিটিশ শাসক হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের অসম ব্যবধানের সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং তার ঔপনিবেশিক স্বার্থে এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিরোধ অবসান না ঘটিয়ে, তা বৃদ্ধি করার কৌশল অবলম্বন করেছেন (ওয়াকিল, ১৯৮৩ : ৬৪)।

ব্রিটিশরা আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করলেও অনেক ঘটনা বা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারার বাইরে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টায় বাঙালি জাতিসত্তাভিত্তিক রাজনীতির চর্চা হচ্ছিল। যেমন 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' (১৯১৬), 'খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন' (১৯১৯-১৯২২), সি আর দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩), ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রজা আন্দোলন ও ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-১৯৪৩) গঠন, ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠনের সুপারিশ, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন-উত্তর কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বাংলায় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস এবং দেশবিভাগের প্রাক্কালে সোহ্‌রাওয়ার্দী-আবুল হাশিম-শরৎ বসু-কিরণশঙ্কর রায়ের 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ প্রভৃতি (ড. হারুন, ২০০৩ : ১৪)। ১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাবে' হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হিসেবে

ভারতকে বিভক্ত করার দাবি উঠে আসে। সে সময়ে ভারতে মুসলমান ছিল মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। 'ঐক্যবদ্ধ ভারতে কেন্দ্রে (এবং সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণে) মুসলমানদেরকে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্যাধীনে থাকতে হবে এবং অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে'–এ অবস্থা থেকে স্থায়ী পরিত্রাণ কামনাই ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক সর্বভারতীয় মুসলিম ঐক্য ও সংহতির মূলমন্ত্র (ড. হারুন, ২০০৩ : ২১)।

জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানরা হিন্দু আধিপত্যের ভীতি থেকে পরিত্রাণ পেল বটে, তবে তার স্থলে প্রাধ্যন্য পেল বাঙালি-অবাঙালি দ্বন্দ্ব। পূর্ব বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একযোগে তাদের সাধারণ শত্রু পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভাষা আন্দোলনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শ (ড. হারুন, ২০০৩ : ২২)। পাকিস্তান রাষ্ট্র চব্বিশ বছর টিকে ছিল। ধর্মনির্বিশেষে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে বাংলাদেশ নামক নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে (ড. হারুন, ২০০৩ : ১৭)।

জাতিরাষ্ট্র বা nation state-এর প্রকাশিত রাজনৈতিক রূপ হলো জাতীয়তাবাদ, যা একটি আধুনিক ধারণা। জাতীয়তাবাদ হলো বিশেষ একধরনের অনুভূতি, যা একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সত্তা বা স্বকীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ সচেতনতাবোধ থেকে জন্মলাভ করে। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বা এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম, রক্তসম্বন্ধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, একক অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে একধরনের একাত্মবোধ থেকেই জাতিসত্তার সৃষ্টি হয় (ড. হারুন, ২০০৩ : ৪৩)।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো ভাষা। 'জাতীয় ভাষা ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় হিসেবে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে চৌদ্দ ও পনেরো শতকে'। সুলতানি শাসকেরা সচেতনভাবে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৪৫)। সুলতানিরা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য বাঙালি কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিদ্যাসুন্দর, মনসামঙ্গল ও পদাবলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল হোসেন শাহি আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮)। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময়ে (১৩৪২-১৩৫৯) এ অঞ্চলের মানুষেরা প্রথমবারের মতো বাঙালি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা ভাষার উন্নতি ও বাঙালি হিসেবে পরিচয় লাভ–এসব কারণে এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈকট্য বৃদ্ধি পায় (রানা, ২০০৭ : ১২১)। তবে সুলতানি ও মোগল শাসকেরা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রকে দ্বিভাষিক করেন–কেন্দ্রীয়ভাবে ফারসি হয় সরকারি ভাষা এবং স্থানীয়ভাবে বাংলাকে সরকারি ভাষা করা হয় (সিরাজুল, ২০০৭ : ২৪৫)। আধুনিক রাজনৈতিক ধারণা হিসেবে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি

জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও পরে পূর্ব পাকিস্তান)।

রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান–এই দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ–এই তিন ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র নিয়ে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানি শাসকের সুপরিকল্পিত শোষণের ফলে এই বৈষম্য আরো তীব্র হয় (মোরশেদ, ২০১২ : ৩১)। শুরুতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো আমলাতন্ত্র গঠিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারত থেকে আসা মোহাজেরদের নিয়ে। পূর্ব বাংলায় প্রশাসনের উচ্চপদগুলোও ছিল তাদের অধিকারে। পাকিস্তান রাষ্ট্র উত্তরাধিকারসূত্রে যে সেনাবাহিনী লাভ করেছিল, তা ছিল পাঞ্জাবি, পাঠান ও বালুচদের নিয়ে গঠিত এবং কোনো বাঙালি অফিসারও সেখানে ছিলেন না। দেশবিভাগের আগে পূর্ব বাংলার পেশাজীবী শ্রেণি, যেমন : শিক্ষক, উকিল, চিকিৎসক প্রভৃতি, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং অফিস-আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। দেশবিভাগের কারণে এবং বিশেষ করে ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করলে এসব ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা পূরণ করে ভারত থেকে আসা বাঙালি-অবাঙালি মোহাজের ও পশ্চিম পাকিস্তানিরা। ভারত থেকে ধনী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণির খুব অল্পসংখ্যক এখানে বসতি স্থাপন করে এবং পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বরং তারা পুঁজি বিনিয়োগ করে। ফলে শিল্প-কারখানার অধিকাংশ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরুতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, আমলা ও ব্যবসায়ীদের সম্মিলনে একটি শক্তিশালী শাসকশ্রেণি গঠিত হয় যারা পাকিস্তানের শাসনকাঠামো ও অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই শাসকগোষ্ঠীর কাছে পূর্ব বাংলা হয়ে ওঠে শোষণের ভূমি (মোরশেদ, ২০১২ : ৩২)। 'করাচিকে পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে নির্বাচন, পূর্ব বাংলা থেকে পাকিস্তান গণপরিষদের আসনে অবাঙালি মোহাজের নির্বাচনের ব্যবস্থা, উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা, এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই কায়েমি স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটে' (মোরশেদ, ২০১২ : ৩২-৩৩)।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো ব্রিটিশ শাসনের সময়ে পূর্ব বাংলার উচ্চবিত্ত শ্রেণি ছিল জমিদার শ্রেণি। যদিও তারা বসবাস করতেন কলকাতা শহরে। দেশবিভাগের পর এই জমিদাররা প্রায় সকলেই ভারতে চলে যান। ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির আইন পাস হলে জমিদারি ব্যবস্থার অবসান ঘটে। এ ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের দিক দিয়ে পূর্ব বাংলা পশ্চাৎপদ থাকার কারণে এখানে উচ্চবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি দ্বারা। আর এদের সমর্থন দিয়েছে গ্রামের সাধারণ মানুষ (মোরশেদ, ২০১২ : ৩১)।

পাকিস্তানে সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি। "প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সামরিক অভ্যুত্থান, নির্বাচনের রায় নস্যাৎকরণ, আমলাতন্ত্রের ওপর অবাধ নির্ভরশীলতা, 'মৌলিক গণতন্ত্রের' প্রবর্তন" প্রভৃতি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেও এসবের সাথে দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো রকম সম্পর্ক ছিল না। এই জনগোষ্ঠীর মতামত প্রকাশের স্বাভাবিক পথের অভাব রূপ নিয়ে ছিল 'অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানের' (সাঈদ, ২০০১ : ৪)। তাই '১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাস ছিল মুখ্যত ঘোরতর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠীর সঙ্গে উঠতি বাঙালি কাউন্টার–এলিটের মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিবৃত্ত' (কামাল, ২০০৭ : ৩৬৯)। পাকিস্তানি শাসকদের পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা করা, পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং দমনমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি ঘটনা পূর্ব বাংলায় আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতির জন্ম দেয় এবং বাংলার মানুষেরা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ব্যাপক গণ-আন্দোলন করতে বাধ্য হয় (কামাল, ২০০৭ : ৩৬৯)।

পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বা পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। 'প্রকৃতপক্ষে এ আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের পৃথক অস্তিত্বের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে' (বদরুদ্দীন, ২০০৭ : ৩৩৭)। 'রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের পটভূমিতে ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে দুদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়' (মোরশেদ, ২০১২ : ৫৮)। সম্মেলনে ড. শহীদুল্লাহ্ যে বক্তব্য প্রদান করেন, তা অনেকের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ড. শহীদুল্লাহ্ বলেন 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য, আমরা বাঙালি। ...মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই' (মোরশেদ, ২০১২ : ৫৯)।

ভাষা আন্দোলনের সময়ে পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ ও সংগঠনগুলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ হয় (রোজিনা, ২০০৪ : ৪৮)। বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই নতুন চেতনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। প্রগতিশীল ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিবর্গ প্রথমবারের মতো সুসংগঠিতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে'র আয়োজন করে ১৯৫৪ সালে (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৫৩)। পাঁচ দিনব্যাপী (২৩ থেকে ২৭ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ, গণসংগীত, লোকসংগীত, নৃত্যনাট্য, লোকনাট্য, চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন (রোজিনা, ২০০৪ : ৩৭)।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য পূর্ব বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথাযথ আসন নির্ধারণ এবং সকল বিকৃতি, কূপমণ্ডূকতা, সম্প্রদায়গত বৈরীভাবের বিরুদ্ধে মানবতার আদর্শকে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা–এই সবই ছিল এ সম্মেলনের লক্ষ্য (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৫৩-৫৪)। '১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিল অধিবেশন হয়, সেখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের সাংস্কৃতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৫৪)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চারুশিল্পীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী স্বাধিকার আন্দোলন পর্যন্ত। বিভিন্নভাবে যাঁরা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় তাঁদের মধ্যে মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন ইমদাদ হোসেন (শাওন, ২০০৯ : ১৭)। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলা সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান হাউসে আয়োজিত আলোকচিত্র ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (শাওন, ২০০৯ : ২২)। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কামরুল হাসানের ব্যবস্থাপনায় একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সন্তোষের রাজবাড়ীতে। এই প্রদর্শনীতে তৎকালীন আর্ট ইনস্টিটিউটের ৩০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। কাগমারী এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রদর্শনীর চিত্রগুলো আঁকা হয়েছিল (শাওন, ২০০৯ : ২২)। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে হাতে আঁকা কার্টুন, পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার প্রভৃতি তৈরি করার যে চর্চা বা রীতি শুরু হয়েছিল, তা ষাটের দশকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সময় আরো বেড়ে যায় (শাওন, ২০৯ : ৪৭)। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শিল্পীদের এ অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের আর্থনৈতিক জীবনে দুর্দাশা নেমে আসে। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর নানা নির্যাতন চালানো হয়। এসব নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাদের রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে (বদরুদ্দীন, ২০০৭ : ৩৫৩)। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে গঠিত শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারক কমিটি ১৯৫০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টের সুপারিশে 'সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীভূত করার এবং পূর্ব বাংলা সরকারের হাতে যেটুকু ক্ষমতা তখনও ছিল, সেটুকু কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা ছিল'। এ সুপারিশ প্রকাশ পাওয়ার পরপরই পূর্ব বাংলায় ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয় (বদরুদ্দীন, ২০০৭ : ৩৫৬)। দিন দিন বিক্ষোভ তীব্রতর হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দানের দাবি উঠে আসে (কামরুদ্দীন, ১৯৭০ : ১০১)। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল

অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কামাল, ২০০৭ : ৩৭১)। 'মুসলীম লীগ ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অনদিকে, যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি' (কামাল, ২০০৭ : ৩৭৩)। ১৯৫৪ সালে সর্বপ্রথম পূর্ণবয়স্কদের ভোটের অধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়েই পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামবাসীরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়। সাধারণভাবে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষরা নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সচেতনতা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকায়ও প্রভাব ফেলে। এই নির্বাচনে যারা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেছিল, জনগণ তাদেরই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল। শহরের উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক নেতারা এই নির্বাচনে পরাজিত হলেন (কামরুদ্দীন, ১৯৭০ : ১৩৯)।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এবং তৎপরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের ফলে বাঙালি লেখক ও ছাত্রসমাজ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শকে লালন করে। যেমন–কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও সুকান্তের জন্মজয়ন্তী এবং বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন (ড. আবুল ফজল, ২০১৪ : ৩৬)। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে পড়ে। ফলে সকল সামরিক স্থাপনা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে 'যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান তথা সারা বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ে। এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারে না, তা স্পষ্ট হয়ে যায়'। এ অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬ দফার মূল কথা ছিল 'পূর্ব পাকিস্তানকে একটি আঞ্চলিক রাজ্য (State) হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং তার পরিচালনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে'। ৬ দফা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করার ফলে সরকার ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে এবং প্রধান আসামি হিসেবে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে (ড. আবুল ফজল, ২০১৪ : ৪৫)। সরকার গণ-আন্দোলনের কারণে ২২ ফেব্রুয়ারি এই ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিবসহ সকল আসামিকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় (আবুল ফজল, ২০১৪ : ৪৬)। আইয়ুবের 'উন্নয়নের দশকে' জাতির মূল রাষ্ট্রকাঠামো ধ্বংস হয় এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। আইয়ুব খান ও তাঁর অনুসারী এবং তাঁদের স্বৈরচারী শাসন–সবকিছুকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে। পূর্ব

পাকিস্তানে বাঙালি জনসাধারণের পক্ষে সংঘটিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে অধিকার আদায়ের রক্ষক হিসেবে শেখ মুজিব আবির্ভূত হন (এনায়েতুর, ২০০৭ : ৪৬৪)।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের দ্বীপসমূহে ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং ৩,৫০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। ১৫ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেও 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় ত্রাণ ও পুনর্নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেননি'। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের এই অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তায় 'বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আবেগের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে' এবং 'প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি হয়' (এনায়েতুর, ২০০৭ : ৪৬৬)। ঘূর্ণিঝড়ের পর বাঙালির আবেগ-অনুভূতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে '৭ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন' (এনায়েতুর, ২০০৭ : ৪৬৭)। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচির পক্ষে নিরুঙ্কুশ রায় প্রদান করেন। 'বস্তুত, নির্বাচনে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পরাজয় ছিল প্রগতিশীল শক্তির নিকট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয়'। জাতি গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মিত হয় এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। 'এই প্রগতিশীল শক্তিই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং জন্ম দেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ১১২)।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটটি চিত্রচর্চা আলোচনা বা বিশ্লেষণের জন্য কেন জরুরি, সে বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা যে চিত্রচর্চাকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্র বলছি, যার শুরু চল্লিশের দশকে, সেই চর্চায় কিছু লক্ষণ পরিস্ফুট, যাকে আমরা আমাদের আধুনিক চিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করি। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরীক্ষাধর্মিতা, আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রভৃতি। এই উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাচীন বা মধ্যযুগের চিত্রে অনুপস্থিত। তখন চিত্রচর্চার ধরন ভিন্ন ছিল, পৃষ্ঠপোষকও ভিন্ন ছিল। চিত্রের চর্চা ছিল হয় ধর্মকেন্দ্রিক কিংবা শাসক, রাজা বা অভিজাত শ্রেণির রুচি বা চাহিদা অনুযায়ী। ইংরেজরা যখন উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে শাসন শুরু করে তখন স্বভাবতই শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন হয়। শাসনপ্রণালির পরিবর্তনের ফলে সমাজকাঠামোতেও পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বভাবতই চিত্রচর্চা এবং ব্যাপক অর্থে শিল্পকলাচর্চায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময়ে চিত্র শুধু শাসকের চাহিদামতো তৈরি না হয়ে শিল্পীর ইচ্ছার প্রাধান্যে তৈরি হতে থাকে। শাসক শ্রেণি ছাড়াও সমাজের অন্য শ্রেণির চাহিদাও শিল্পী প্রাধান্য দেওয়া শুরু করে। এ ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্প বা চিত্র শেখার জন্য প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। চিত্রচর্চা বা শিল্পকলাচর্চা কৌলিক বৃত্তি বা গুরুশিষ্য পরম্পরার ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা যেকোনো ব্যক্তিকেই চিত্রচর্চা বা অন্য কোনো মাধ্যমের শিল্পচর্চা শেখার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার নতুন পেশাজীবী শ্রেণির আবির্ভাব, ধর্ম ও সমাজের

সংস্কার, শহরের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক–প্রভৃতি মানুষের ভাবনার জগতে পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং ভাবনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। মানুষ কিছুটা হলেও স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে এবং নিজের আবেগ বা আগ্রহকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। চিত্রচর্চা বা শিল্পকলাচর্চা আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা শিল্পী হওয়া আধুনিক সময়ে এসে ইচ্ছার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে কৌলিক পেশা না হলেও নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) কিংবা জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) শুধু আগ্রহ, ভালো লাগা বা ছোটবেলায় ছবি আঁাকার দক্ষতাপ্রকাশ–এসব কারণে শিল্পবিদ্যা বা চিত্রশিক্ষা লাভ করতে এবং শিল্পীজীবন বেছে নিতে আগ্রহী হলেন। অর্থাৎ শিল্পীর অবস্থান সমাজে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সমাজ পরিবর্তনের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। সমাজের এই পরিবর্তনগুলোই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতি, শাসনপ্রণালি ও রাজনীতির পরিবর্তন, নতুন সমাজ ও শ্রেণির বিকাশ, শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, নতুন পেশাজীবী শ্রেণির আবির্ভাব, ধর্ম ও সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন–এসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে চিত্রচর্চা এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পকলাচর্চার ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটতে থাকে। সমাজে শিল্পীর অবস্থান শুধু বদলে যায় না চিত্রের ভাষা কী হবে, তা-ও আমূল বদলে যায় ক্রমান্বয়ে। শিল্পী পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা, চিত্ররচনার কৌশল, ভাবনা আত্মস্থ করে এবং ভাবতে থাকে এর সমন্বয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে কীভাবে চিত্রে প্রকাশ করবে। এই অভিজ্ঞতা স্বদেশ, সমাজ, সময়নিরপেক্ষ নয়। কাজেই পরিবর্তমান পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা তার চিত্রে প্রকাশ পায়। কাজেই চিত্রভাষাকেও সমাজের পরিবর্তন বা ধরন বা সমাজকাঠামো প্রভাবিত করে।

উনিশ শতকের শেষ সময় থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য এবং এর সাথে এ অঞ্চলের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে চিত্রচর্চায় আধুনিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই আধুনিক চিত্র নির্মাণ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় দেশবিভাগের পর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) আধুনিক চিত্রের গোড়াপত্তন হয়। কারণ, আমাদের আধুনিক চিত্রের অগ্রপথিকেরা দেশবিভাগের আগে কলকাতায় চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং শিল্পী হিসেবে আবির্ভূত হন। দেশবিভাগের আগের অর্থাৎ ঔপনিবেশিক পর্বে সমাজকাঠামো এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, এ কারণে যে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রচর্চার যাঁরা অগ্রপথিক ছিলেন তাঁরা ওই সমাজকাঠামোর ভেতর শিল্পশিক্ষা লাভ করে একধরনের প্রস্তুতি নিয়ে পূর্ব বাংলায় আসেন। তাঁদের এই প্রস্তুতি পর্ব বোঝার জন্য ঔপনিবেশিক পর্বের আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের সময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) হাত ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক চিত্রচর্চার শুরু। এই নবজাগরণের পুরোটাই ছিল উচ্চশ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের আধুনিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হতে এবং তা প্রকাশ করতে সময় লেগেছে বিশ শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত। সে কারণে আধুনিক চিত্র আন্দোলনের প্রথম দিকে তাদের অনুপস্থিতিটাই ছিল স্বাভাবিক। দুই সম্প্রদায়ের অসম অগ্রযাত্রার অন্তর্নিহিত কারণও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দেশভাগের পর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনার জন্ম হয়। এ ভাবনাই এ অঞ্চলের মানুষের মানসজগৎ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ভাবনার কোনো সাম্প্রদায়িক বিভাজন ছিল না। ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ। এই ভাবনার গঠনপ্রক্রিয়া আলোচনা করতে গিয়ে সে সময়কার সমাজ-রাজনীতির প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রচর্চা শুরু থেকে এই জাতীয়তাবাদী ভাবনা দ্বারা জারিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভাবনার একটি মূলস্রোত ছিল এটি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি বহির্বিশ্বের চিত্রভাবনার উপাদান, চিত্ররচনার কৌশল, শৈলী, আঙ্গিক প্রভৃতি। এ কারণে এই অধ্যায়ে দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনার গঠনপ্রক্রিয়া এবং এর দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে এ অঞ্চলের মানুষের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

টীকা

[1] 'Yet the detachment from the sacral tie is a first step in the emancipation of art. ('Emancipation' is being used here as a descriptive term, as refusing to the process by which art constitutes itself as a distinct social subsystem.) The difference from sacral art becomes particularly apparent in the realm of production : the artist produces as an individual and develops a consciousness of the uniqueness of his activity' (Berger, 1992 : 57).

[2] 'It can also refer to a much more historically circumscribed movement in the arts during the period 1850 to 1950. As mentioned above, this period saw unprecedented experimentation in the arts : in painting, from the realism of Gustave Courbet and the impressionism of Claud Monet to the abstract expression of Jackson Pollack; in literature, the abandonment of objective narrative in Virginia Woolf and James Joyce, and of Idealized treatment of subject matter in Earnest Hemingway; in music Arnold Schönberg's and Alban Berg's atonality, and Igor Stravinsky's dissonance and non-thematic structure, to name but a few examples. In architecture, the modernism of Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, and Walter Gropius has played a particularly important role' (Cahoone, 1996 : 13).

[3] 'The emergence of modernity is co-terminous with the emergence of Euro-centrism and the European dominance of the world effected through imperial expansion. In other words, modernity emerged at about the same time that European nations began to conceive of their own dominant relationship to a non-European world and began to spread their rule through exploration, cartography and colonization' (Ashcroft et al. 2007 : 131).

[4] 'The need for a national identity arose even as the Indian intelligentsia assimilated the modern concept of a unique individuality. In the pioneering figures of modern India cultural traditions of a pre-colonial past and an emergent nationalism coalesce to inform the very quest for selfhood' (Geeta, 1982 : 5).

[5] 'The new breed of artists, even as they found their modern self constituted through the initiation in western ideas, styles and techniques, were impelled to supersede their colonized status and westernized identity within a reformulated 'Indian' authenticity. Thus, with each artist, a sharp sense of a break with the past would coexist with an urge to selectively appropriate elements of that past (revived, refined and reimagined by nationalism) in the formulation of new artistic idioms' (Tapati; 1995 : 8).

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতা ও শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার পথিকৃৎ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতায় চিত্রকলা শিক্ষা ও চর্চা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তাঁরা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গে) চলে আসেন। এ কারণে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার চর্চা শুরু হলেও '৪৭-পূর্ববর্তী কলকাতাকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার ধারাবাহিকতায় শুরু হয় এ অঞ্চলের আধুনিক চিত্রচর্চা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানি রীতির চিত্রচর্চা থেকে শুরু করে সরকারি আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা, নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন ও বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮), সুনয়নী দেবী (১৮৭৫-১৯৬২), নন্দলাল বসু, যামিনী রায় (১৮৮৭-১৯৭২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), রাম কিঙ্কর বেইজ (১৯০৬-১৯৮০), বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০) প্রমুখ শিল্পীর আবির্ভাব চিত্রচর্চার একটি বলিষ্ঠ ধারা তৈরি করেছিল। এসবের মধ্যে থেকে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯২২-২০১২), এস. এম. সুলতান (১৯২৩-১৯৯৪) প্রমুখ শিল্পী স্বতন্ত্র চিন্তায় পুষ্ট হয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রচর্চার অগ্রপথিক হন। এ কারণে এ অঞ্চলের আধুনিক চিত্রকলা সৃষ্টির পশ্চাতের পটভূমি হিসেবে কলকাতাকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার আলোচনা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে চিত্রচর্চা কীভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং ভারতীয় আধুনিক চিত্রচর্চার সূত্রপাত কীভাবে হলো, এ বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে ভারত উপমহাদেশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিকরণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রশিল্পের চর্চায় পশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে ব্রিটিশ একাডেমিক রিয়েলিজম বা স্বভাববাদী রীতির চর্চা ও বিকাশের মধ্য দিয়ে। আঠারো শতকে ইংরেজদের প্রভাবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সূচনা পশ্চিমা শিল্পের অনুপ্রবেশকে সহজ করেছিল (Partha, 1994 : 12)। তবে পশ্চিমা শিল্পের অনুপ্রবেশ এটাই প্রথম নয়। এর আগেও এ উপমহাদেশে পশ্চিমা শিল্পের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তা ছিল মোগল দরবারে ষোলো শতকে (Asok, 1978 : 12)। ১৫১০ সালে পর্তুগিজদের গোয়ায় অবস্থানের পর ইউরোপ থেকে অনেক ব্যবসায়ী এবং ভ্রমণকারী ভারতে আসতে থাকে। তারা অনেকেই হয়তো চিত্রকলার নমুনা সাথে এনেছিলেন কিন্তু এর গুরুত্ব সম্রাট আকবরই প্রথম অনুধাবন করতে পারেন (Asok, 1978 : 229)। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকারীরা আকবরের

ইবাদতখানায় ধর্মীয় বই, ধর্মীয় ছবি, মূর্তি প্রভৃতি নিয়ে আসেন। এসবের মধ্যে 'যিশু' কিংবা 'ম্যাডোনা' এবং 'মেজাইয়ের ভক্তি' প্রভৃতি ছবি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন রীতির চিত্র, এনগ্রেডিং এবং চিত্রায়িত বই মোগল চিত্রকলার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। ধীরে ধীরে মোগল ছবিতে প্রায়শ ইউরোপীয় স্বভাববাদী চিত্ররীতির বৈশিষ্ট্য যেমন মডেলিং, পরিপ্রেক্ষিত, মানুষের অবয়বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দেখা দিতে শুরু করে (Asok, 1978 : 230)।

মোগল আমলে চিত্রশিল্পে এই পাশ্চাত্যকরণ শুধু চিত্রের রীতিকৌশল আত্তীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে চিত্রশিল্পের পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছিল পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ। পার্থ মিত্র যেমন বলেছেন, '... its (European art) introduction by the Raj was part of a comprehensive package that sought to reproduce the cultural values of the West' (Partha, 1994 : 12)।

১৭৫৭ সালে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি শক্ত অবস্থান নিলে এ অঞ্চলের শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের আনুকূল্য লাভ করেন (Partha, 1994 : 14)। ১৭৭০ সালের দিকে কোম্পানি রীতির চিত্রকলা নামে একটি চিত্ররীতির উদ্ভব ঘটে এ দেশীয় শিল্পীদের দ্বারা, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা (Murphy, 1990 : 197)। ইংরেজদের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পীরা জলরং, পরিপ্রেক্ষিত এবং আলোছায়ার প্রয়োগ ঘটাতে থাকেন তাঁদের মিনিয়েচার চিত্র নির্মাণের কৌশলের সঙ্গে (Archer, 1992 : 18)। কোম্পানি রীতির শিল্পীদের ছবির বিষয় ছিল ভারতবর্ষের মানুষজনের শ্রেণি, পেশা, আচার, প্রকৃতি, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, ধর্মীয় জীবন, সমাজজীবন, প্রাচীন স্থাপত্য প্রভৃতি।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে জনজীবন ও প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের জন্য পিকচারেস্ক (picturesque) বা সুন্দর বা ছবির মতো–এই নামে একটি নতুন নান্দনিক ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াটি ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ভারতবর্ষেও প্রচলিত হয় এবং কোম্পানি রীতির শিল্পীদের বিষয় নির্ধারণে প্রভাব ফেলে (Archer and Archer, 1955 : 2-3)। ১৭৭০ সালের পর পেশাদার ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীরা ভারতে আসতে থাকেন এবং ভারতকে ব্রিটিশ রুচির দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন (Archer and Lightbown, 1982 : 8)। শিল্পীরা অর্থ উপার্জন বা ভাগ্য ফেরানোর আশা–যে কারণেই এই অঞ্চলে আসুক না কেন, তাঁদের সামনে ছবি আঁকার আদর্শ হিসেবে ছিল 'sublime' বা 'পরম বিস্ময়কর ও ভয়ংকর' এবং 'পিকচারেস্ক' মতবাদ। ভারতের প্রকৃতি, জনজীবন, শিল্প ও স্থাপত্য প্রভৃতির মধ্যে তাঁরা এই মতবাদের প্রতিফলন খুঁজে পেলেন (Partha, 1992 : 120-122)। ভারতে আসা বিদেশি শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন টিলি কেটল (Tilly kettle) টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েল (Thomas and William Danniell), উইলিয়াম হজেস (William Hodges), চার্লস ডয়েলি (Charles D'oyly) প্রমুখ। ভারতে আসা বিদেশি

শিল্পীরা সবাই ব্রিটিশ একাডেমিক রিয়েলিজম বা স্বভাববাদী রীতিতে, প্রধানত তেলরং ও জলরঙে ছবি আঁকতেন। তাঁদের ছবি আঠারো এবং উনিশ শতকে এ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির শিল্পরুচি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ ছাড়া কোম্পানি রীতির বিকাশেও তাদের ভূমিকা ছিল (মৃণাল, ২০০৫ : ১০০)।

এভাবে তেলরং এবং স্বভাববাদী চিত্ররীতি ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রচর্চার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এটি আরো জোরালো হয় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কোম্পানি চিত্রকলা এবং শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান শুরুর মাঝের কয়েক দশকে অনামা শিল্পীদের দ্বারা আরো একটি চিত্রচর্চার বিকাশ ঘটে। ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রভাবে বা তাদের সান্নিধ্যে এসে এ অঞ্চলের লৌকিক বা দরবারি শিল্পীরা, যাঁরা জীবিকার জন্য শহরে চলে এসেছিলেন, তাঁরা তেলরং মাধ্যমে ছবি আঁকেন। এঁদেরই অনামা শিল্পী বলা হয়ে থাকে (মৃণাল, ২০০৫ : ১০২)। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুরসংখ্যক এই অনামা তেলরঙের ছবি পাওয়া গেছে, যার বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয় এবং পৌরাণিক। এই ছবিগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোতে স্বভাববাদী রীতির তিন মাত্রার ভ্রম তৈরির প্রচেষ্টার সঙ্গে লোকচিত্রকলার সমতলভাব ও আলংকারিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান (Tapati, 1992 : 35-39)। এই ধারায় অনেক ছবি পাওয়া গিয়েছে পুরোনো জমিদারবাড়ির অন্দরমহল থেকে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির মতো এগুলো গুরুত্ব না পেলেও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির কাছে এই ছবির আবেদন ছিল (মৃণাল, ২০০৫ : ১০২)।

কোম্পানি আমলে অভিজাত শ্রেণি বা শাসক শ্রেণির রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দৃশ্যশিল্পের ক্ষেত্রে উল্লিখিত রূপান্তরগুলো ঘটে, যা তাদের নান্দনিক চাহিদা মেটাত বা তৃপ্ত করত। এ ছাড়া সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যেও নান্দনিক চেতনার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কলকাতা শহরে এ রকম দুটি পরিবর্তনের একটি হলো কালীঘাট অঞ্চলে মন্দিরকে কেন্দ্র করে কালীঘাটের পটচিত্রের উদ্ভব এবং বটতলা অঞ্চলের ছাপাই ছবির উদ্ভব। এই দুটি ধারার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শোভন সোম লিখেছেন, লোকচিত্রকলার শৈলীর প্রভাব দ্বারা এই দুটি চর্চা নিয়ন্ত্রিত হলেও এখানে নাগরিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছিল বিষয় নির্বাচনে, যা এই চর্চাগুলোকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল (শোভন, ১৯৯৩ : ৪৬)। কলকাতা নগর হিসেবে গড়ে ওঠার সময়েই গ্রামীণ শিল্পীদের জীবিকা বা উপার্জনের জন্য কলকাতা ও এর উপকণ্ঠে অভিবাসনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল এ ধরনের চিত্রকলা তথা শিল্পের বিস্তার।

ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে চিত্রচর্চার সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি হয় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ একাডেমিক রিয়েলিজম বা স্বভাববাদী চিত্ররীতি ব্যাপকতা লাভ করে ও প্রতিষ্ঠা পায়। প্রথম দিকে পাশ্চাত্যধর্মী আর্ট স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে। স্যার চার্লস ম্যালে (Sir Charles Malet) ব্রিটিশ পর্যটক শিল্পীদের সহায়তা করার জন্য স্থানীয় শিল্পীদের শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭৯৮ সালে পুনেতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (Partha, 1994 : 30)। এরপর ১৮৩৯ সালে ফ্রেডেরিক কোরবিন

(Frederic Corbyn) কলকাতায় Mechanic Institution and School of Art প্রতিষ্ঠা করেন। আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যে ছিল এ অঞ্চলকে সভ্য জীবনের শিল্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া (Partha, 1994 : 30-31)। এরপর মাদ্রাজে প্রথম শিল্প বিদ্যালয়ের সূচনা হয় ১৮৫০ সালে ড. আলেকজান্ডার হান্টারের (Dr. Alexandar Hunter) উদ্যোগে এবং বোম্বেতে ১৮৫১ সালে জামশেদজি জিজিভাই নামে একজন পারসি শিল্পপতির অর্থসাহায্যে (Partha, 1994 : 31)। কলকাতায় মেকানিক ইনস্টিটিউট অল্পসময় স্থায়ী হয়েছিল এবং ১৮৫৪ সালে Society for the Promotion of Industrial Art-এর সহায়তায় আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় (Partha, 1994 : 31)। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই স্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৮৫৫ সালে Department of Public Instruction প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রমান্বয়ে স্কুলগুলো এর অধীনে আসে (Partha, 1994 : 32)।

আর্ট স্কুল ভারতবর্ষের শিল্পের ধারণাকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়। ইংরেজি শিল্পশিক্ষাব্যবস্থা কাঠামোগতভাবে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিক্ষানবিশি থেকে ভিন্ন। আর্ট স্কুলে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আনুষ্ঠানিক, যা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিক্ষানবিশি থেকে ভিন্ন। এ ছাড়া ভারতীয় শিল্প নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রাচীনকাল থেকে ছিল কল্পনা বা ধারণাপ্রসূত আর পাশ্চাত্যের ধরন হলো প্রত্যক্ষজাত। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রথমে বহিঃরেখা আঁকা হয় বা stencil করা হয় এবং এরপর রং প্রয়োগ করা হয় আকার বা রূপের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়াই। অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিত্র রচনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই তিন মাত্রার ভ্রম তৈরি করা হয় প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে (Partha, 1994 : 30)। কাজেই আর্ট স্কুল থেকে যেসব ছাত্র প্রথম দিকে পাস করেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্বভাববাদী রীতি দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। এভাবে ইংরেজদের চাহিদামতো স্কুল তৈরি হলো বটে কিন্তু চিত্রচর্চা এই স্কুলের নিয়মে প্রবহমান রইল না। চিত্রচর্চা সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাবনা প্রক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা প্রভৃতিতে জারিত হয়ে অগ্রসর হলো।

ঔপনিবেশিক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ, নগরায়ণ প্রভৃতির কারণে সমাজে যে চিন্তার পরিবর্তন ঘটে, তাকে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ নাম দেওয়া হয় এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের মাঝে। ঔপনেবেশিক সময়ে কেন হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে এই পরিবর্তন আগে হলো, তা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমাজচিন্তায় এই যে পরিবর্তন, তার স্বরূপ কেমন ছিল তার বিশ্লেষণ স্বল্প পরিসরে হলেও একটু প্রয়োজন। কারণ, এই পরিবর্তন চিত্রচর্চাকে প্রভাবিত করে। চিত্রচর্চার গতিপ্রকৃতি বা চরিত্রের ছাঁচ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতিহাস-গবেষক সালাহ্উদ্দিন আহমদের মতে, ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাবধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, যা পশ্চিমের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতা এবং অনুসন্ধিৎসু মানসিকতাকে উৎসাহিত করে। তিনি আরো বলেন, ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ যখন এই জ্ঞানচর্চার সংস্পর্শে

আসে, তখন তা নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং এ কারণে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি হিন্দুর সমাজচিন্তায় তিনটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠে। সেগুলো হলো রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থী ও আমূল সংস্কারবাদী। এদের মধ্যে সংস্কারপন্থীরা হিন্দুধর্মকে সমকালীন জ্ঞান ও সমালোচনার আলোকে পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেন (সালাহ্উদ্দীন, ২০০০ : ৩৮-৩৯)। এ ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুবাদ উল্লেখযোগ্য দুটো বিষয় (জয়া, ২০১৪ : ১৮০)। বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ইংরেজদের বঞ্চনা ও বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয় এবং এই জাতি তৈরি করতে গিয়ে তারা হিন্দুত্বকে গ্রহণ করে (স্বপন, ২০১১ : ৩৮৮-৩৮৯)। জাতীয়তাবাদ নির্মাণে হিন্দুত্ব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদীদের লেখা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। যেমন ম্যাক্সমুলারের গবেষণার সূত্রে আর্যদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক জানার পর বাঙালি হিন্দুর স্বদেশচেতনার সঙ্গে আর্যগৌরব মিলেমিশে যায় (স্বপন, ২০১১ : ৩৮৯)। এ ক্ষেত্রে স্বপন বসু আরো লেখেন, 'এ দেশ আর্যভূমি, আমরা আর্যজাতির বংশধর, মুসলমানরা বহিরাগত, তাঁরাই অপহরণ করেছেন এ দেশের স্বাধীনতা–এ রকম একটা মনোভাব বাঙালি হিন্দুর একাংশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর্যরাও যে বহিরাগত, উত্তেজনার বশে এ কথা তাঁরা ভুলে যান' (স্বপন, ২০১১ : ৩৮৯-৩৯০)। ম্যাক্সমুলারের মতো প্রাচ্যবাদীরা ভারতকে উপস্থাপন করেছিলেন দার্শনিকের দেশ হিসেবে, টানাপোড়েনহীন সহজ-সরল সমাজ যেখানে বিদ্যমান। এবং এখানকার মানুষ পার্থিব চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন (ডি এন ঝা, ২০০৮ : ১৫-১৬)। জেমস মিল তাঁর *ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস* (১৮১৭) গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ যুগ–এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এই যুগ বিভাজনের মধ্য দিয়ে মিল 'সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন' (ডি এন ঝা, ২০০৮ : ১৬-১৭)। ডি এন ঝা এই সাম্প্রদায়িককরণের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

> এই যুগবিভাগের ভিত্তি ছিল এই অযৌক্তিক ধারণা যে ১২০০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় রাজগণ ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। কয়েকটি প্রধান রাজবংশ, যেমন ইন্দো-গ্রিক, শক এবং কুষাণগণ হিন্দু ছিলেন না, এই তথ্যটি উপেক্ষিত হয়েছিল। এমনকি মোর্য রাজগণও হিন্দু ছিলেন না–সর্বশ্রেষ্ঠ মোর্য শাসক অশোক ছিলেন বৌদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয়গণ কখনোই নিজেদের 'হিন্দু' বলে বর্ণনা করেননি। হিন্দু শব্দটি প্রথমে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ব্যবহার করেন পারস্যের হখামনীয় রাজগণ। পরবর্তীকালে শব্দটি নৃতাত্ত্বিক-ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহার করেন আরব ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী। ... প্রথম দিকের ভারতীয় সাহিত্যে এ শব্দটি পাওয়া যায় না। অনেক পরে শব্দটি ভারতীয় নামকরণে স্থান পায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় এবং হিন্দু শব্দটিতে স্পষ্টত একটি ধর্মীয় রং দেওয়া হয় (ডি এন ঝা, ২০০৮ : ২১)।

মিলের এই যুগবিভাজন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা 'ভারত সংস্কৃতির প্রকৃত সমন্বয়ী' চরিত্রটি উপেক্ষা করেন (ডি এন ঝা, ২০০৮ : ২২)। মূলত ব্রিটিশ লেখকেরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখেছিলেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য টিকিয়ে রেখে ভারত উপমহাদেশকে শোষণ করার জন্য যুক্তি দাঁড় করাতে। এবং এ কারণে তাঁরা ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন (ডি এন ঝা, ২০০৮ : ১৮)। যেমন ম্যাক্সমুলারের ধারণাকে ব্রিটিশরা বিকৃত করে প্রচার করে যে, ভারতীয়রা আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকে, এ কারণে নিজেদের প্রশাসন পরিচালিত করার যোগ্যতা তাদের নেই (ডি এন ঝা, ২০০৮ : ১৬)। এই ধরনের চিত্রায়ণকে বা উপস্থাপনকে মনে করা হয় প্রাচ্যতত্ত্বের অংশ (ডি এন ঝা, ২০০৮ : ১৮)। এখানে প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাইদের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে :

> প্রাচ্য একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে ইউরোপীয়-পশ্চিমা অভিজ্ঞতায়। সে অভিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত হয়েছে যে প্রাচ্য সেই প্রাচ্যের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের কৌশলকে আমি বলছি *অরিন্টোলিজম* বা *প্রাচ্যতত্ত্ব*। ...প্রাচ্য ইউরোপের সংলগ্নই নয় কেবল, তার সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে সম্পদময় বড় বড় উপনিবেশের অঞ্চলও বটে। প্রাচ্য ইউরোপের সভ্যতা ও ভাষাসমূহের উৎসস্থল, তার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং অন্য (আদার)-এর সবচেয়ে গভীর ও পৌনঃপুনিক চিত্রকল্পও। ...মোটামুটি হিসেবে আঠারো শতকের শেষাংশকে প্রারম্ভকাল ধরে প্রাচ্যতত্ত্বকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা যায় প্রাচ্য সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান, প্রাচ্যের মতামত অনুমোদন, প্রাচ্যকে বর্ণনা করা ও শিক্ষা প্রদান, প্রাচ্যকে শান্ত রাখা ও শাসন করার জন্য একীভূত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে; সংক্ষেপে প্রাচ্যের ওপর আধিপত্য করা, প্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করা এবং প্রাচ্যের ওপর কর্তৃত্বকরণের পশ্চিমা পদ্ধতিরূপে (এডওয়ার্ড, ২০১৫ : ২৫-২৭)।[১]

এডওয়ার্ড সাইদের বক্তব্যে এটি পরিষ্কার যে প্রাচ্যতত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের বা ঔপনিবেশিক স্বার্থের সাথে জড়িত এবং কোনো সরল ব্যাপার ছিল না। সংস্কারপন্থীদের হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে প্রাচ্যতত্ত্বের সম্পর্ক ছিল এবং এখানে এ প্রসঙ্গগুলোর অবতারণা কিছুটা বিস্তৃত পরিসরে এ কারণে করা হলো যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আত্মপরিচয় নির্মাণের সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে এই হিন্দুত্ববাদ এবং প্রাচ্যতত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলায় (যার শুরু ১৮৬৭ সালে এবং ১৮৭০ সালে নামকরণ হয় হিন্দুমেলা) যে গানগুলো পাওয়া হয়, সেসব গানের মাধ্যমে 'হিন্দু-আর্য ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ' করিয়ে দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় (স্বপন, ২০১১ : ৩৮৮-৩৮৯)। শিল্পকলা তথা চিত্রকলার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এর অন্যতম উদাহরণ হলো আর্ট স্কুল থেকে পাস করা শ্যামাচরণ শ্রীমানীর বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পকলার ওপর লেখা বইয়ের বক্তব্য। 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরী' নামের বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। বইটিতে শিল্পশিক্ষার প্রতি শ্যামাচরণের অঙ্গীকার ছিল স্পষ্টত জাতীয়তাবাদী (Tapati, 1992 : 123)। বইটিতে শ্যামাচরণ তাঁর অনুসন্ধিৎসা থেকে শিল্প সম্পর্কে যে ধারণা বিকশিত করেন, তা সে সময়কার অনুকরণের গতানুগতিকতা এবং একাডেমিক রিয়েলিজমের বিরুদ্ধে

একধরনের প্রতিক্রিয়া (Tapati, 1992 : 123)। তিনি ইংরেজি 'ফাইন আর্টে'র আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন 'সূক্ষ্ম শিল্প' হিসেবে (শোভন এবং অনিল, ১৯৮৬ : ১৩-১৪)। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতকে 'Decorative Art' নয়, 'Fine Art'-এর ভূমি হিসেবে তুলে ধরা (Partha, 1994 : 224)। তিনি চিত্রশিল্পীদের দেশ-কাল-ভাব-পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে 'অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের ভাব চিত্রে পরিস্ফুট' করার আহ্বান জানান। এবং এ জন্য তিনি প্রাচীন হিন্দুজাতির শিল্পকলাকে দেশ বা মাতার অলংকার হিসেবে বিবেচনা করে তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণিকে তার মর্ম উপলব্ধি করতে আহ্বান জানান (শ্যামাচরণ, ১৯৮৬ : ৫৫-৫৬)। শ্যামাচরণ তাঁর বইতে হিন্দু জাতি বলতে আর্য জাতিই বুঝিয়েছেন। তাঁর লেখায় জাতীয়তাবাদ ও প্রাচ্যতত্ত্ব মিলেমিশে গিয়েছে। শ্যামাচরণের দৃষ্টিভঙ্গি আর্ট স্কুলের স্বভাববাদী রীতিতে আঁকা ছবির বিষয়বস্তু নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। একাডেমিক স্বভাববাদী রীতির সঙ্গে অতীত ভারতের ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টার উদাহরণ পাওয়া যায়। আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অন্নদা প্রসাদ বাগচী, ফণীন্দ্রভূষণ সেন, নবকুমার বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র পাল স্থাপিত 'কলকাতা আর্ট স্টুডিও'তে (১৮৭৮) ছাপানো স্বভাববাদী রীতিতে আর্ট স্কুলের শরীর সংস্থান জ্ঞানের প্রয়োগে হিন্দু দেবদেবীর, বিশেষত মাতৃদেবীর ছবি জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে মূর্ত করেছিল, যে ভাবধারা বিদ্যমান ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (Partha, 2003 : 17)। উনিশ শতাব্দীর শেষ দশকে, দক্ষিণ ভারতের চিত্রশিল্পী রাজা রবি বর্মার (১৮৪৮-১৯০৬) তেলরঙে স্বভাববাদী রীতিতে আঁকা হিন্দু মহাকাব্যনির্ভর ছবিগুলোর ওলিওগ্রাফ কলকাতায় এলে, এগুলো নতুন রুচির অগ্রগতির নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে (Tapati, 1992 : 104-106)। নব-উদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্ত এই ছবিগুলোতে জাতীয়তাবাদের উপাদান খুঁজে পান (Tapati, 1992 : 110)। বাংলায় রবি বর্মার সমান্তরাল ছিল বামাপদ ব্যানার্জি। তেলরঙে আঁকা তাঁর হিন্দুধর্মীয় ও মহাকাব্যনির্ভর চিত্রগুলো ওলিওগ্রাফের মাধ্যমে ব্যাপকতা পায় (Tapati, 1992 : 111) (চিত্র : ১) । এভাবে চিত্রে জাতীয় আত্মপরিচয় নির্মাণের উপাদান হয়ে ওঠে 'প্রাচ্যতত্ত্ব-প্রসূত আদর্শায়িত অতীত' (তপোধীর, ২০০৪ : ২৮)।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের শুরুতে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক চিত্রচর্চা নতুন মোড় নেয়। এ নুতনত্ব আনার ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের দুজন সদস্যের নাম অগ্রগণ্য : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পশিক্ষার হাতেখড়ি পাশ্চাত্য একাডেমিক রীতিতে হলেও তিনি এই আঙ্গিক নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন না। এবং যেখানে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে দেশীয় সংস্কৃতির সংঘাতকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল পথে প্রবাহিত করা (হিরণ্ময়, ২০১২ : ২১৪), সেখানে এ ধরনের ভাবনা মনে উদয় হওয়াটা স্বাভাবিক। তিনি চেয়েছিলেন একটি দেশীয় আঙ্গিক নির্মাণ করতে এবং তাঁর এই ভাবনাতে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ জোগান। অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য একাডেমিক শিক্ষা, মোগল, রাজস্থানি ও জাপানি চিত্রকলার রীতিপদ্ধতির সমন্বয়ে উদ্ভাবন করেন ধোয়া পদ্ধতি বা ওয়াশ টেকনিক। ১৮৯৫ সালে

'কৃষ্ণলীলা' চিত্রমালা আঁকা শুরু করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে তিনি এই নতুন রীতির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটান। অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক চিত্রকর বলা যায় এ কারণে যে তিনি গতানুগতিক স্বভাববাদী রীতি পরিত্যাগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন আঙ্গিক নির্মাণে সচেষ্ট হন। এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যে নিহিত ছিল তার দেশজ চেতনা এবং জাতীয়তাবোধ। তাঁর চিত্রচর্চার আদর্শে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারণে ই বি হ্যাভেল, কাকুজো ওকাকুরা তেনশিন এবং ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। হ্যাভেল ১৮৯৬ সালে কলকাতায় সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে সুপারিনটেনড্যান্ট হিসেবে যোগ দেন। তাঁর মতে, ভারতীয় ছাত্রদের অবশ্যই ঐতিহ্যবাহী বিষয় পছন্দ করতে হবে এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতীকের মাধ্যমে ভাবাবেগ প্রকাশ করতে হবে এবং ঐতিহ্যবাহী রীতি প্রয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া ভারতীয় ছাত্রদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয় এবং শিল্পের নৈতিক উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। হ্যাভেল প্রাচ্য শিল্পকে শিল্পশিক্ষার ভিত্তি করেন, কারণ স্বাভাবিকতা আশ্রিত রীতিতে শুধু অনুকরণমূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় প্রকাশ সম্ভব নয় বলে তাঁর মনে হয়েছে (Neelima, 2010 : 28)। হ্যাভেলের এই আধ্যাত্মিকতার ওপর জোর দেওয়ার উৎস সম্পর্কে পার্থ মিত্রের ব্যাখ্যা হলো :

> The Influence of the Platonic doctrine is seen in Havell's argument that the lack of concern in Indian art with objective representation reflected its interest in interpreting the ideal world. He claimed to find a confirmation of this view of art in Indian Philosophy. According to him Indian artists were engaged in representing the spirit and the spiritual world which were the only realities in Indian philosophy while the rest was illusion. ...Significantly, Havell had chosen the *vedanta* school which considered the world of perception as illusion or *maya* (Partha, 1977 : 273).

শিল্প হিসেবে ভারত শিল্পের ঐহিত্য পুনরাবিষ্কার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতার উপস্থাপনে অবনীন্দ্রনাথের সক্রিয়তার পশ্চাতে হ্যাভেলের বড় ভূমিকা ছিল। এভাবে হ্যাভেলের প্রচেষ্টায় চিত্রচর্চার মাধ্যমে জাতীয় আত্মপরিচয় নির্মাণে আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। শিল্পকলা সম্পর্কে হ্যাভেলের লেখায়ও এর প্রতিফলন ঘটে। যেমন তাঁর মতে, 'Indian art is essentially idealistic, mystic, symbolic, and transcendental. ...Indian art appeals more to the imagination and strives to realise the spirituality and abstraction of supra-terrestrial sphere' (Havell, 1980 : 10)। অন্য পক্ষে 'The Greeks and the artists of the Renaissance who followed in their footsteps attempted to arrive at a scientific standard of beauty by a selection of what appeared to them most admirable in various types of humanity and in natural forms and appearances' (Havell, 1980 : 9)। শিল্পকলা সম্পর্কে হ্যাভেলের এই মনোভাব প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মতাদর্শের প্রতিফলন যেখানে ভারতকে বা প্রাচ্যকে দেখা

হয়েছে রহস্যময়, আধ্যাত্মিক রূপক হিসেবে এবং পাশ্চাত্যকে পার্থিব বাস্তবের সাথে তুলনা করে। এ সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাঈদের বক্তব্য হলো :

> প্রাচ্যতত্ত্ব তার ডিসকোর্সে ধরে রাখে একটি অবিচ্যুত স্রোত, একটি পুনর্গঠিত ধর্মীয় তাড়না, প্রাকৃতায়িত অতিপ্রাকৃত আবহ। ...প্রাচ্যকে এমনকি সচরাচর প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরা যে ধ্রুপদ প্রাচ্যকে অধ্যয়ন করেন, তাকেও আধুনিকায়িত করে বর্তমান সময়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়, প্রথাগত বিষয়গুলোকে নিয়ে আসা হয় সমকালীন সংস্কৃতিতে। উভয়ই বহন করে ক্ষমতার অনিবার্য ছাপ, প্রাচ্যকে পুনর্জন্ম প্রদানের এমনকি সৃষ্টির ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক কৌশলসমূহে মিশে থাকা সাধারণীকরণের অপার ক্ষমতা' (এডওয়ার্ড, ২০১৫ : ১৫১)।

তাই অবনীন্দ্রনাথ নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার সূচনা করলেও প্রাচ্যবাদকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনের শিল্পীদের অতীতের ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এ কথাই প্রমাণ করে।

কাকুজো ওকাকুরা ভারতে আসেন ১৯০২ সালে। ভারতে অবস্থানকালে লেখা তাঁর *Ideals of the East* বইতে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের কথা লেখেন। এ ছাড়া এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল এবং ঐক্যের কথাও তিনি লেখেন। তাঁর ভাবনা শিক্ষিত ভারতবাসীকে প্রভাবিত করে। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে ইয়োকোইয়ামা তাইকান ও হিশিদা শুনসো নামে দুজন জাপানি শিল্পীকে ভারতে পাঠান। অবনীন্দ্রনাথ এঁদের কাছ থেকেই জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন (Nileema, 2010 : 29)।

ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট নোবেল) জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিলেন (শঙ্করীপ্রসাদ, ১৪১৭)। তিনি বাংলার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (সুপ্রকাশ, ২০০৯ : ৬৩)। 'ভারতীয় জীবনে পাশ্চাত্য চিন্তা ও আদর্শের অনুপ্রবেশ রুখতে চরমপন্থী নেতারা প্রাচীন ভারতের শাশ্বত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন' (সুবোধ, ২০০৯ : ৩৪৩)। নিবেদিতা তরুণ শিল্পীদের সব সময় 'ভারতের পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক' বিষয় অবলম্বন করে ছবি আঁকাতে নির্দেশনা দিতেন ও প্রেরণা জুগিয়েছেন (শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার, ১৯৬৯ : ১৬৯)। স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে আঁকা অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' ছবিটি সম্পর্কে নিবেদিতা 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় (আগস্ট, ১৯০৬ সংখ্যা) লেখেন, 'নতুন স্টাইলের এই হলো প্রথম মাস্টারপিস, যার মধ্যে একজন ভারতীয় শিল্পী মাতৃভূমির ভাবনাচেতনাকে যেন সত্যই মোচন করতে সমর্থ হয়েছেন' (শঙ্করীপ্রসাদ, ১৪১৭ : ১০৫) (চিত্র : ২)। নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদের একটি পৌনঃপুনিক বিষয় ছিল পৌরাণিক বা ধর্মীয় চারিত্র অঙ্কন। পৌরাণিক চরিত্রকে গৌরবান্বিত করার পশ্চাতে কিছু ব্যাখ্যা থেকে যায়। প্রাচ্যবাদী ইউরোপীয় লেখকদের একটি অংশ ভারতীয় জনসাধারণকে 'অক্ষম, অপুরুষালি, অলস ও ধীরগতিসম্পন্ন' প্রভৃতি দুর্বলতায় অভিযুক্ত করার কারণে জাতীয়তাবাদীরা এর বিপরীতে ভারতীয়দের দাঁড় করানোর জন্য 'আগের যুগ থেকে বীরদের তুলে ধরলেন'

এবং এই বীরদের মাধ্যমে গঠন করলেন 'বিকল্প হিন্দু পুরুষ চরিত্র' (উমা, ২০১৭ : ১৯)। জাতীয়তাবাদী লেখকেরা এই 'বিকল্প হিন্দু পুরুষ চরিত্র' গঠন করল প্রাচীন সমাজের ক্ষত্রিয় যোদ্ধা চরিত্রের আলোকে। ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের সাথে আর্যদের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা হচ্ছিল। 'তাই পুনরুজ্জীবিত হিন্দুর প্রকৃত ভারতীয় হয়ে ওঠা নির্ভর করেছিল ক্ষত্রিয়ত্বের ওপর, যার মধ্যে রয়ে গিয়েছে প্রাচীনকালের যোদ্ধা, হিন্দু ও আর্য উপাদানগুলো' (উমা, ২০১৭ : ২১)। এই পটভূমিতে নারীদেরও একটি নতুন রূপ গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অতীতের সূত্র ধরে নারীদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আরোপ করা হয় সেই অনুযায়ী তারা একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে পারদর্শী, সহধর্মিণী এবং বিদেশি শাসকদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম ও নিজের সম্মান বাঁচাতে মৃত্যুকে বরণ করতে দ্বিধা করে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীদের একটি 'জাতীয়' পরিচয় সুসংহতভাবে তাঁর সাহিত্যে সৃষ্টি করেছিলেন। বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'শান্তি' নামে এমন একজন নারী চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন, কোনো জাতির সংকটকালে যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বৈদিক রমণীরা যেমন 'স্বামীর সাথে এক সাথে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করতেন স্বামীর সমান অংশভাগী হিসাবে', 'আনন্দমঠের' শান্তিও সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 'এমন এক চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে যে চরিত্র মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য স্বামীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে'। এভাবে 'শান্তি এমন এক নারীত্বের আদর্শ হয়ে উঠেছিল যা ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীতে 'জাতীয়' নারীর আদর্শের খুব কাছাকাছি' (উমা, ২০১৫ : ২৪-২৬)। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' সম্পর্কে নিবেদিতার বক্তব্যে এই ভাবাদর্শের প্রতিফলন ছিল।

এভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাব, বিষয় ও আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তি ও গতানুগতিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলনকে একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। এবং এই রীতির অনুসারীদের দুর্বল মানসম্পন্ন কাজের ফলে এই আন্দোলন ব্যর্থতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় (মৃণাল, ২০০৫ : ১৫২)। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে অবনীন্দ্রনাথের কাজের মধ্যে পৌরাণিক চরিত্রের প্রাধান্য থাকলেও তার সমগ্র জীবনের শিল্পকর্ম আলাদা মূল্যায়নের দাবি রাখে। তাঁর সমগ্র জীবনের বিভিন্ন পর্বের শিল্পকর্মের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং রচনাকৌশলে রয়েছে ভিন্নতা। তিনি হিন্দু, মুসলমান, ধ্রুপদি, লৌকিক–সংস্কৃতির সব উপাদানকেই তাঁর চিত্ররচনায় অঙ্গীভূত করেছেন নানা পর্বে (মৃণাল, ২০০৫)। এর সঙ্গে মিশেছিল তাঁর ব্যক্তিমানস বা শিল্পী সত্তা। নব্যবঙ্গীয় শিল্পকলাকে স্বদেশ ভাবনা-সংবলিত আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সাধারণত গণ্য করা হয়। তবে নব্যবঙ্গীয় শিল্পচর্চার পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা তিনজন শিল্পীর শিল্পকর্মে নতুন নিরীক্ষার প্রকাশ ঘটে, যা এ অঞ্চলের আধুনিক শিল্পভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। এ তিন শিল্পী হলেন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনয়নী দেবী এবং যামিনী রায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নব্যবঙ্গীয় রীতির চর্চার প্রথম দিকে অবনীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। হ্যাভেলের ভাবনা ও কর্মকে সমর্থন দিয়েছেন। তবে পরবর্তীকালে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন এই রীতির চর্চার সীমাবদ্ধতাগুলো (মৃণাল, ২০০৫ : ২১৬)। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কারণে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের 'সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ' উপলব্ধি করতে পারেন, যা তাঁর কাছে মনে হয় 'বৃহত্তর মানবকল্যাণ্যের বিরোধী'। ক্রমে 'হিন্দু ভাবধারার প্রভাব থেকে' তিনি বের হয়ে আসেন (স্বাতী এবং অশোক, ২০১৫ : ৩৭)। স্বদেশি আন্দোলনের শেষের দিকে তিনি '...প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন ও সমন্বয় তত্ত্বের প্রচার শুরু করেন' (নেপাল, ১৪০২ : ৮২)। ১৯০৮ সালে কলকাতায় এক ভাষণে (পূর্ব ও পশ্চিম) তিনি বলেন :

> ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে–ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই । এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৬৩-৬৪)।

তিনি আরো বলেন, '...আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ৬৭)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নতুন চেতনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্যোগ নেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লেখা একটি চিঠি থেকে। ১৯১৬ সালে তিনি জাপান থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে–ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলনের যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন এই বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলতে হবে–এই আমার মনে আছে–সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশের বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ (স্বাতী এবং অশোক, ২০১৫ : ৮৪-৮৫)।

এ লক্ষ্যেই ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতীর কলাভবনের যাত্রার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবিষয়ক নতুন ভাবনার বাস্তব কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। উন্মোচন ঘটে চিত্রকলার আধুনিকতার আর এক পর্বের। রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের শিল্পশিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন নন্দলাল বসুকে। কলাভবনে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নন্দলাল বসু যদিও কোনো সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম

অনুসরণ করেননি, তবে তিনি জাপানি মনীষী কাকুজো ওকাকুরার কাছ থেকে তিনটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষাদানের জন্য। এ নীতি তিনটি হলো : (১) স্বভাব (Nature) (২) পরম্পরা (Tradition) ও (৩) স্বকীয়তা (Originality) (শোভন, ১৯৯৮ : ৩৭৮)। রবীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল ঐতিহ্যের অর্থ সংকীর্ণ দেশজ ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তারা ঐতিহ্য বলতে 'মানবসভ্যতার সমগ্র অর্জন'কে বুঝিয়েছেন। তাদের এই ভাবনার প্রমাণ মেলে কলাভবনে দেশি ও বিদেশি শিল্পীদের আগমন, বিভিন্ন ঐতিহ্যের সম্মিলন এবং এসবের আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে (শোভন, ১৯৯৮ : ৩৭৯)।

কলাভবনে অন্যান্য আর্ট স্কুলের মতো স্টুডিওর মধ্যে রাখা জড়বস্তু বা স্থির মডেল দেখে অনুশীলন করানো হতো না। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে স্কেচ করা ছিল বাধ্যতামূলক। গ্রাম ও প্রকৃতির মাঝে কর্মরত মানুষের শরীর অনুশীলন করতে হতো। কারণ, এর মধ্য দিয়ে 'জীবনের প্রাণছন্দ'কে অনেক নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। কলাভবনের শিল্পচর্চার মূল উদ্দেশ্যে ছিল প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়তা বা একাত্মতার বিকাশ ঘটানো (মৃণাল, ২০০৫ : ২২৮)। শিল্প ইতিহাস যে শিল্পশিক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ, এ ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথ শিল্প ইতিহাসের অধ্যাপক স্টেলা ক্রামরিশকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান। পৃথিবীর নানা দেশের শিল্প ইতিহাস-সম্পর্কিত বইয়ে গড়ে তোলেন একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। ১৯২২ সালে ফরাসি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী আঁদ্রে কারপেলে শান্তিনিকেতনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ যখনই এশিয়া বা ইউরোপের কোনো দেশে ভ্রমণ করতেন, সাথে করে নিয়ে যেতেন কোনো না কোনো শিল্পীকে। এভাবে এশিয়া ও ইউরোপের আধুনিক শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে কলাভবন। শুধু তা-ই নয়, শিল্পীরা যাতে গ্রামের রূপ ও সৌন্দর্য ছবিতে তুলে আনতে পারেন এই জন্য শিল্পীদের তিনি নিয়ে যেতেন শিলাইদহে (মৃণাল, ২০০৫ : ২২৯-২৩০)। শিল্পকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই ভাবনার মধ্য দিয়ে যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন, সেই আধুনিকতাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজ। তাঁদের চিত্র ও ভাস্কর্যে আন্তর্জাতিকতা, প্রকৃতি, ঐতিহ্য আর সমসাময়িক জীবন মিলেমিশে গিয়েছে।

এভাবে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে স্বভাববাদী রীতির বিকাশের মধ্য দিয়ে যে পশ্চিমাকরণ শুরু হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় নব্যবঙ্গীয় চিত্রচর্চা ও পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের চিত্রচর্চা এ অঞ্চলে আধুনিকতার গোড়াপত্তন করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ চিত্রচর্চা শুধু (দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া) হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান সম্প্রদায় মূলত সব ক্ষেত্রেই হিন্দুদের চেয়ে কয়েক দশক পিছিয়ে ছিল। এর কারণ আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতায় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ মূলত হিন্দুদের দ্বারাই হয়েছিল। মুসলমানরা আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বিশ শতকের শুরু থেকে। এ কারণে তার আগপর্যন্ত আধুনিক চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়কে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার পথিকৃতরা বিশ শতকের তিরিশের দশকে কলকাতায় শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) চলে আসেন এবং এখানে আধুনিক চিত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁরা অবশ্যই কিছু উত্তরাধিকার বহন করে এনেছিলেন। এবং কিছু নতুনত্বও সৃষ্টি করেন, যা বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতাকেন্দ্রিক বা পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক চিত্রকলার বিশ্লেষণ এ কারণে জরুরি যে আমাদের অগ্রপথিকেরা কী বৈশিষ্ট্য বহন করে আনলেন এবং কী নতুনত্ব সৃষ্টি করলেন, তা বিশ্লেষণের জন্য কলকাতাকেন্দ্রিক চিত্রের সাথে কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন আছে। এ কারণে কলকাতা বা শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক চিত্রকলাচর্চার প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

টীকা

[১] '*Orientalism* শিরোনামে পেঙ্গুইন বুক, ইংল্যান্ড কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৫ সালের ইংরেজি সংস্করণ থেকে অনূদিত' (ফয়েজ, ২০০৫)।

চিত্র-১ : অর্জুন ও উর্বশী, ৩৭২.৫×৬৮.৫ সেমি, ওলিওগ্রাফ, ১৯০০, রামাপদ ব্যানার্জী

চিত্র-২ : ভারতমাতা, জলরং, ১৯০৫, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় অধ্যায়

চল্লিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ ও এস. এম. সুলতানের চিত্রকর্ম

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক চিত্রকলাচর্চার যে ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, সেই পটভূমিতেই বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার পথিকৃৎরা '৩০-এর দশকে কলকাতায় সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যেসব শিল্পী ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় চলে আসেন, তাঁরা হলেন হবিবর রহমান (১৯১২-১৯৭৩), জয়নুল আবেদিন, শফিকুল আমিন (১৯১২-২০১১), আনোয়ারুল হক (১৯১৮-১৯৮১), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯২২-২০১২), এস. এম. সুলতান (১৯২৩-১৯৯৪), খাজা শফিক আহমেদ (১৯২৫-১৯৭২)। এ শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বে কলকাতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এবং চিত্রভাষা নির্মাণে যাঁদের অবদার সর্বাধিক তাঁরা হলেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ এবং এস. এম. সুলতান। এ চারজন শিল্পীর চিত্রকর্ম '৬০-এর দশক পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে '৪০, '৫০ ও '৬০-এর দশকে তাঁদের দ্বারা চিত্রভাষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান, এস. এম. সুলতান–চারজন শিল্পীই তাঁদের শিল্পশিক্ষা শুরু করেছেন কলকাতা সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ে। চারজন শিল্পীর শিল্পভাষা গড়ে উঠেছে চারটি স্বতন্ত্র ধারায়। এটাই স্বাভাবিক আধুনিক শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে। তবে এই চারজন শিল্পীর চিত্রকর্মে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল, যে বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছে ঔপনিবেশিক পর্বে চিত্রকলাচর্চার ক্ষেত্রে এবং যার জন্য তাদের চিহ্নিত করা যায় বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রচর্চার গোড়াপত্তনকারী শিল্পী হিসেবে। তাঁদের এ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো তাঁরা কেউই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আত্মপরিচয় নির্মাণের চিত্রভাষা গ্রহণ করেননি। তাঁরা আঞ্চলিক বিষয়াবলিকে প্রাধান্য দিলেন। এই আঞ্চলিক বিষয়াবলি, যার মধ্যে ছিল স্থানীয় প্রকৃতি আর মানুষ, এগুলো তাদের চিত্রের পৌনঃপুনিক বিষয়ে পরিণত হলো।

তাঁরা চারজনই এমন একটি পরিবেশ পেয়েছেন চিত্রচর্চার সাথে পরিচিত হওয়ার যেখানে ব্রিটিশ একাডেমিক রিয়েলিজম ছিল, প্রাচ্যবাদী ভাবনা-আশ্রিত নব্যবঙ্গীয় ঘরানার চিত্র ছিল, আরও ছিল শান্তিনিকেতনের চিত্রচর্চা–যেখানে প্রাচ্যের সঙ্গে বিশ্বকে মেলানোর ভাবনা থেকে শিল্পচর্চা শুরু হয়েছিল। কলকাতা আর্ট স্কুলের অনেক শিক্ষক (যাঁরা শান্তিনিকেতন থেকে চিত্রকলা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন) এই ভাবনা বহন করছিলেন। এই ত্রিবিধ চিত্রকলাচর্চা ও তৎসংলগ্ন ভাবনার সঙ্গে বাংলাদেশের অগ্রপথিকেরা পরিচিত হয়েছিলেন এবং অনেক

ক্ষেত্রে পত্রিকার মাধ্যমে এই চর্চাগুলোর ছাপানো ছবি তাদের মধ্যে শিল্পী হওয়ার বাসনা তৈরি করেছিল। কিন্তু তাঁরা এই চর্চার মধ্য থেকেও নিজস্বতা তৈরি করলেন। এখন প্রশ্ন আসে তাঁরা কী নিজস্বতা তৈরি করলেন, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রের পরিচয়বাহী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল? তাঁরা প্রত্যেকেই একাডেমিক রিয়েলিজমে সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাকে আঁকড়ে থাকলেন না, তাদের চিত্রের ভাষা ও ভাবনা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের পথে তাঁরা বের হয়ে আসেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বের আধুনিকতার আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া থেকে। এই আত্মপরিচয় নির্মাণের উপাদান ছিল ভারতীয় অতীতের পুনর্নির্মাণ প্রচেষ্টা। এই পুনর্নির্মাণের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল প্রাচ্যবাদী ভাবনা, যে ভাবনা বহু সংস্কৃতির অধিকারী ভারতকে একটি একক সংস্কৃতির রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং এই একক সংস্কৃতি তৈরি করতে গিয়ে হিন্দুত্ববাদকে নির্মাণ করেছিল, যেখানে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রকৃতপক্ষে ছিল নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির স্থান (Partha, 1994 : 239-241)। তাঁরা চারজনই আঞ্চলিক বিষয়াবলি নিয়ে চিত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে আর্ট স্কুলের বাঁধাধরা রীতিকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তান পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আত্মপরিচয় নির্মাণকালে এই আঞ্চলিক বিষয়াবলি জাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রকাশের বিষয় হয়ে উঠল। এ চার শিল্পীর ছবির ভাষায় ব্যবহৃত বাঙালি সাংস্কৃতিক উপাদান (অর্থাৎ আবহমান বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ) আত্মপরিচয় নির্মাণের উপাদান হয়ে উঠল। এভাবে এই শিল্পীদের চিত্র ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আত্মচেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রের ভাষা হয়ে উঠল। এই আত্মপরিচয়নির্ভর আধুনিক চিত্রের ভাষার মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিমানসকে খুঁজে পাওয়া যায়।

এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা প্রাসঙ্গিক হবে তা হলো, মুসলমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে আধুনিক চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের আগমন ঘটে অনেক পরে। পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীদের উপস্থিতি। প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্যায়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার এবং মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের শাসনের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন এবং প্রথম দিকে তা সীমিত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশদের গৃহীত আরো কিছু নীতির কারণে এই শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। যেমন ১৮৫৪ সালে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সে সময়কার সভাপতি স্যার চার্লস উড প্রণীত শিক্ষা ডেসপ্যাচের কারণে বাংলার প্রধান জেলা শহরগুলোতে সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে (জাহেদা, ২০০৭ : ৭৪)। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা সংস্কার ও পুনর্গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয় (জাহেদা, ২০০৭ : ৭৮)। মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন (জাহেদা, ২০০৭ : ৭৯)।

এ ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব সময়ে পাটের বাজারে যে তেজিভাব দেখা দিয়েছিল তার কারণে পূর্ব বাংলার স্বল্প আয়সম্পন্ন পাটচাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছিল এবং তাঁরা তাদের পুত্রসন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল (জাহেদা, ২০০৭ : ৭৬)। এভাবে বাংলার বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটছিল এবং এর ফলে কিছুটা হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসচেতনায় পরিবর্তন আসছিল। এভাবে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার তাদের সনাতন অনেক ধারণার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছিল এবং সংস্কারের বাইরে চিন্তা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। এ কারণে হয়তো বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় থেকে ছবি আঁকা শেখার জন্য কলকাতা সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি হতে শুরু করে। এ ছাড়া প্রথম অধ্যায়ে আরও কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো 'বাংলায় ইসলাম মিথস্ক্রিয়া উপাদান বহন করছিল', (পৃষ্ঠা : ১২) এবং 'শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ এর আমলে (১৩৪২-১৩৫৯) এ অঞ্চলের লোকেরা প্রথমবারের মতো বাঙালি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে' (পৃষ্ঠা : ১৫) প্রভৃতি। এ বিষয়গুলো এ অঞ্চলের মুসলমানদের বাঙালি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাক্ষ্য বহন করে। এ কারণে ধর্মীয় বিধিনিষেধ সত্ত্বেও এ অঞ্চলের মুসলমানদের শিল্পচর্চায় বা চিত্রকলাচর্চায় অংশগ্রহণ আকস্মিক কোনো বিষয় ছিল না।

জয়নুল আবেদিন ১৯৩২ সালে কলকাতা সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে শফিকুল আমীন ছিলেন মুসলমান। এ ছাড়া তাঁদের আগে এই স্কুলে মুসলমান ছাত্র ছিলেন আবদুল মঈন (১৯১০-১৯৩৯) ও হবিবর রহমান (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ২৩-২৪)।

জয়নুল আবেদিন প্রথম বর্ষ থেকে মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ২৮)। ছাত্র থাকার সময়ে প্রতিদিন কলকাতা ও তার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে স্কেচ করতেন। ছুটির সময়ে সাঁওতাল পরগনার দুমকায় গিয়ে সেখানকার প্রকৃতি ও আদিবাসীদের নিয়ে অনুশীলন করেছেন। এ ছাড়া ময়মনসিংহ গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরবর্তী অঞ্চল এবং ত্রিশাল থানার ধানীখোলায় বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে সেখানকার কৃষিকাজ, ধানমাড়াই, মাছ ধরা, গরুর গাড়ির চলাচল প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনের নানা বিষয়ের ওপর চিত্র নির্মাণ করেছেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০০৪ : ১৪)। ছাত্রজীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'নৌকা, নদী ও মাঠ' (জলরং, ১৯৩২)', 'হাঁস' (জলরং, ১৯৩৩), 'কুমোর বাড়ী-১' (জলরং, ১৯৩২)', 'কুমোর বাড়ী-২' (জলরং, ১৯৩৩), 'নদীতে নৌকা ও মাছ ধরা' (জলরং, ১৯৩৫), 'শম্ভুগঞ্জ ঘাট' (কলম, ১৯৩৩) (চিত্র : ৩), 'শম্ভুগঞ্জ ব্রীজ' (কালিকলম, ১৯৩৩), 'গ্রামের পথ' (জলরং, ১৯৩৪), 'মাছধরা' (জলরং, ১৯৩৫), 'বনানী দুমকা' (জলরং, ১৯৩৪), 'চিড়িয়াখানা অনুশীলন' (জলরং, ১৯৩৫), 'ঘাটে বাঁধা নৌকা' (জলরং, ১৯৩৬) (চিত্র : ৪), 'টালির ঘর' (জলরং, ১৯৩৪) প্রভৃতি। ১৯৩৮ সালে জয়নুল আবেদিন একাডেমিক অব ফাইন আর্টের উদ্যোগে আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে 'On and over

the Brahamputra' শীর্ষক ছয়টি জলরং চিত্রমালার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। এসব ছবির বিষয় ছিল–'জেলেদের মাছ ধরা', 'জাল শুকানো', 'শম্ভুগঞ্জের পাট ব্যবসায়ী গ্যাস্পার সাহেবের কুঠি,' 'শম্ভুগঞ্জ ব্রীজ হাসপাতাল ও খেয়া পারাপার', 'নদীর অপর পাড়ের কাশবন,' 'পানিতে প্রতিফলিত নদী–তীরবর্তী গাছের ছবি' প্রভৃতি। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বসে এসব ছবি তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এঁকেছিলেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ২৯-৩০)।

জয়নুল আবেদিন যখন চিত্রকলার ভুবনে নিজেকে বিকশিত করছিলেন, তখন কলকাতায় চিত্রকলার দুটি উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল–একাডেমিক ও ভারতীয় বা নব্যবঙ্গীয় রীতি (শোভন, ১৪০২ : ৯২)। জয়নুল আবেদিন আর্ট স্কুলে একাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতিতে ছবি আঁকা শুরু করেন। ময়মনসিংহের গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ এবং সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতি ও আদিবাসীদের পৌনঃপুনিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি আঞ্চলিক (local) বিষয়াবলিকে তুলে আনেন। তবে তিনি হঠাৎ করেই আঞ্চলিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া শুরু করেননি। তাঁর ছবিতে আঞ্চলিক বিষয় কেন প্রাধান্য গেল, তার কারণ জানতে কিছুটা পেছন ফিরে তাকাতে হবে।

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদ থেকে ই বি হ্যাভেল পদত্যাগ করলে সেই পদে ১৯০৯ সালে পার্সি ব্রাউন (১৮৭১-১৯৫৫) যোগ দেন (Shri Jogesh, 1966 : 35)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাধ্যক্ষ পদ থেকে ১৯১৫ সালে পদত্যাগ করলে সেই পদে ১৯১৬ সালে পার্সি ব্রাউন একাডেমিক পদ্ধতির চিত্র অঙ্কনে দক্ষ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে (১৮৭৬-১৯৫৩) নিযুক্ত করেন এবং চারুকলা বিভাগকে দ্বিখণ্ডিত করে চারুকলা (Fine Art) এবং ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা (Indian Style of painting) নামে দুটি বিভাগ করেন। চারুকলা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয যামিনীপ্রকাশকে। এ প্রক্রিয়ায় একাডেমিক পদ্ধতির চিত্রচর্চা পুনঃপ্রবর্তিত হয় এবং এই বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে (Shri Jogesh, 1966 : 39-40)। এভাবে কলকাতায় ১৯২০-এর দশকে স্বাভাবিকতার রীতি পুনরায় জেগে ওঠে অংশত পার্সি ব্রাউনের উৎসাহে এবং অংশত দুজন সহজাত গুণসম্পন্ন (gifted) এবং ভাবাদর্শের দিক হতে সক্রিয় (ideologically active) শিল্পীর উত্থানে। তাঁরা হলেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯৮-১৯৪৮) এবং অতুল বসু (১৮৯৪-১৯৭৭)। তাঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন বিমলা চরণ লাহা, যোগেশ চন্দ্র শীল, সতীশ সিনহা, প্রহ্লাদ কর্মকার ও প্রমথনাথ মল্লিক (Partha, 2007 : 125-127)। ১৯২০ সালে হেমেন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং সুকুমার রায়ের সহযোগিতায় একাডেমিক গোষ্ঠী প্রাচ্য শিল্পীগোষ্ঠীর 'রূপম' পত্রিকার আধিপত্য ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় 'ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমি' নামে পত্রিকা বের করে। এ ছাড়া 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'সোসাইটি অব ফাইন আর্ট'-এর প্রতিষ্ঠা করে (Partha, 2007 : 130)। তবে এই নতুন প্রজন্মের স্বভাববাদীরা ইতিহাসনির্ভর বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাননি, তাঁরা ছবিতে আঞ্চলিক (local) বা স্থানীয় এবং দৈনন্দিন বিষয়াবলি অঙ্কনে আগ্রহী হন (Partha, 2007 : 123-124)। এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় জয়নুলের আঞ্চলিক বিষয়ের উপস্থাপনা যুক্ত।

তবে জয়নুলের গ্রামজনপদকে বিষয় হিসেবে নিয়ে করা চিত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। তিনি হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'পল্লীপ্রাণ' (চিত্র : ৫)-এর মতো রোমান্টিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সিক্তবসনা গ্রাম্য বধূ ধরনের বিষয়ে আগ্রহী হননি, আবার তিনি যামিনীপ্রকাশের মতো তেলরঙে রোমান্টিক আবেগে ভরা প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেমন 'পদ্মা নদীতে সূর্যাস্ত' (চিত্র : ৬)-এর মতো দৃশ্য চিত্রায়ণ করেননি। এ ছাড়া তিনি অতুল বসুর মতো প্রতিকৃতি (চিত্র : ৭) চিত্রায়ণের মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। তিনি স্বাভাবিকতার রীতিতেই কাজ করেছেন। কিন্তু বিষয়কে তিনি পুঙ্খানুপঙ্খভাবে বর্ণনা করেননি বা বিষয়ের অপরিবর্তিত অনুলিপি তৈরি করেননি। তিনি বিষয়ের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যপটে রং বা রেখায় ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে চিত্র সম্পাদন করেছেন। তাঁর চিত্রে রঙের প্রয়োগ ইঙ্গিতপূর্ণ (suggestive)। ইঙ্গিতপূর্ণ রঙের সঙ্গে দর্শকমন মিলে দৃশ্যটি সম্পূর্ণতা পায়। তাঁর রং ব্যবহারের সহজ, স্বচ্ছন্দ ভাব, সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস (composition) এবং বলিষ্ঠ ড্রইং ছবিকে প্রাণবন্ত করেছে। এ ছাড়া জয়নুলের চিত্রে বিষয় হিসেবে ময়মনসিংহ ও সাঁওতাল পরগনার গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষের যে পৌনঃপুনিক উপস্থাপন দেখা যায়, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন (চিত্র : ৮ ও ৯)। তাঁর এই ভাবনাকে শোভন সোম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে 'জীবনকে যেমন তিনি (জয়নুল) পুঁথির পাতায় খোঁজেন নি তেমনি রাজনৈতিক মতবাদের চশমা পরে দেখেননি...ঘরের পরিচয়, মাটির সংরাগ ছেড়ে তিনি ভৌগোলিক দূরত্বে অতীতের ধূসরতায় তাঁর আত্মাকে খোঁজেননি। তাঁর ছবিতে যা প্রকাশিত তা হলো আবহমান বাঙলা' (শোভন, ১৪০২ : ১১৮-১১৯)। এটা ঠিক যে জয়নুল কোনো মতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিষয় নির্বাচন করেননি। চারপাশের বাস্তব জগৎ, যা তিনি সরাসরি অনুভব করেছেন তাকেই তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর চিত্রপটে। তবে এই বাস্তব জগতের রূপায়ণেও তিনি ভিন্নতা দেখিয়েছেন, সে সময়ে একাডেমিক চিত্রচর্চায় প্রচলিত রোমান্টিকতায় আপ্লুত বিষয়াবলি চিত্রায়ণ না করে। এ ধরনের চিত্রের বেশ চাহিদা ছিল ক্রেতাদের মধ্যে (শোভন, ১৪০২ : ৯৩)। অথচ জয়নুলের মেধা ও দক্ষতা সহজেই তাঁকে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার বা যামিনী প্রকাশের মতো একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করে দিতে পারত। কিন্তু তিনি এ প্রক্রিয়া থেকে দূরে থেকেছেন। এর কারণ হতে পারে তাঁর রুচি, পছন্দ এবং প্রকৃতি ও গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব বা দেশপ্রেম এবং তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর প্রভাব। এ কারণে অর্থ উপার্জনের সহজ পথকে তিনি উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন।

জয়নুল আবেদিনের শিক্ষকেরা কেউ শান্তিনিকেতন, কেউবা ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন বা ভ্রমণ করেছেন। এই ভ্রমণ ও শিক্ষা তাঁদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। তাঁদের এই অভিজ্ঞতা ছাত্রদের আর্ট স্কুলের গণ্ডির বাইরে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জয়নুলের শিক্ষক মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৫-১৯৫৮) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন (শোভন, ১৯৯৮ : ২৬৩)। রণদাপ্রসাদ ও যামিনী প্রকাশের কাছে আঁকা শেখেন তাঁর আরেক শিক্ষক বসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৬৮)। এরপর অবনীন্দ্রনাথের

কাছে টেম্পেরা ও ওয়াশ পদ্ধতি শেখেন। এরপর তিনি ফ্রান্সের একাডেমি জুলিয়ঁতে শিক্ষালাভ করেন, যেখানে সৃজনশীল চিত্রচর্চার ওপর জোর দেওয়া হতো (শোভন, ১৯৯৮ : ২৬২-২৬৩)। কামরুল হাসান তাঁর এক লেখায় উল্লেখ করেন, 'আবেদিন সাহেবের ব্যাপারে আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে বলতে পারি যে তাঁর স্কেচ, কম্পোজিশন ও জলরঙের গুরু ছিলেন বসন্তকুমার গাঙ্গুলী' (কামরুল, ২০১০ : ৭১)। এ ছাড়া জয়নুল আবেদিনের সময়ে স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯২২) শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছিলেন। মুকুলচন্দ্র ১৯২৮ সালে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে আর্ট স্কুলে নিয়োগ পান। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে জাপান যান এবং সেখানকার চিত্রচর্চা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় যান ও শিকাগোতে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। তিনি লন্ডনের স্লেড স্কুল ও রয়েল স্কুল অব আর্টে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন (শোভন, ১৯৯৮ : ২৪৮-২৪৯)। ছাত্রদের নিজস্ব বিচারবোধ ও চিন্তা জাগ্রত করার লক্ষ্যে তিনি শিল্পকলা বিষয়ে বক্তৃতা, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করতেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯২৯ সালে আর্ট স্কুলে যামিনী রায়ের লোকশিল্প নিয়ে নতুন রীতির প্রথম প্রদর্শনী এবং ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের ছবির এ দেশে প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় (শোভন, ১৯৯৮ : ২৬৫-২৬৬)। ১৯১৫ সালে নন্দলাল বসু, সুরেন কর ও মুকুল দেকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়েছিলেন নদীমাতৃক বাংলার রূপকে রঙে ও রেখায় প্রতিভাত করতে (স্বাতী এবং অশোক, ২০১৫ : ১১৯)। জয়নুল আবেদিন ছাত্র থাকার সময় মুকুলচন্দ্র দে ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৫৫) পদ্মা নদী ও বাংলার গ্রামজনপদকে নিয়ে আর্ট স্কুলে নিয়মিত এচিং করেন (চিত্র : ১০)। জয়নুলের মধ্যে যে গ্রামের প্রতি দুর্বলতা ছিল, তা হয়তো আরও বেড়ে গিয়েছিল তাঁর শিক্ষকদের করা কাজ দেখে (শোভন, ১৪০২ : ৯৪-৯৫)। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা তৈরি, এই ছিল কলাভবনের শিক্ষার উদ্দেশ্য। নন্দলালের একটি বড় অবদান ছিল রবীন্দ্রনাথের উপনিবেশবিরোধী পরিবেশবাদকে (Environmentalism) কলাভবনের চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা। নন্দলাল নিজেও শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন সাঁওতাপল্লির উৎসব, নাচ ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে চিত্রে উপস্থাপন করেছেন (চিত্র : ১১)। বিনোদবিহারী সাঁওতাল জীবন নিয়ে ১৬টি ভিত্তিচিত্র করেছেন (Partha, 2007 : 94)। আর রামকিঙ্কর সাঁওতালদের বিরোচিত অবয়ব অমসৃণ, গতানুগতিকতার বাইরের উপাদান যেমন খোয়া, সিমেন্ট, কংক্রিট প্রভৃতি দিয়ে তৈরি করেন, যা সাঁওতালজীবনের রূঢ়তার সঙ্গে এক হয়ে যায় (Partha, 2007 : 96) (চিত্র : ১২)। শান্তিনিকেতনের বিশ্বকে মিলিয়ে এই পরিবেশবাদ সেখানকার ছাত্রদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। জয়নুল আবেদিন এই প্রভাববলয় থেকে দূরে থাকতে পারেননি। তাঁর ছবিতে আবহমান বাংলাকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো অবশ্যই ভূমিকা রেখেছে, নিজের গ্রামজনপদের উপস্থাপন সম্পর্কে তাঁকে আরও আস্থাবান করেছে।

জয়নুল গ্রামজনপদের পৌনঃপুনিক উপস্থাপন সম্পর্কে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন,

> ...তাঁর (জয়নুল) কাজ হচ্ছে...ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিপরীত এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সংঘাত থেকে উত্থিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিরোধী, তাঁর কাজ বাঙালি গ্রামীণ কৃষক সমাজে সন্দেহাতীতভাবে প্রবেশ করার একটি মুহূর্ত। জাতীয়তাবাদী শৈল্পিক মুহূর্ত কৃষক সমাজের সঙ্গে শিল্পের বিযুক্ততা তৈরি করেছে, সেই সঙ্গে তৈরি করেছে বাস্তবিক জটিল এবং বিভিন্ন সম্পর্কের বদলে মতাদর্শের বিকল্প। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্টেলা ক্রমরিশ ঐ মতাদর্শগত বিকল্পকে সমগ্র ইতিহাস করে তুলেছেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদী শৈল্পিক মতাদর্শগত বিকল্প একপক্ষে ভারত শিল্পের ভাববাদী মুহূর্ত তৈরি করেছে, অন্যপক্ষে ভাববাদী মুহূর্তের মধ্যে সাম্প্রদায়িক টেনসন তৈরি করেছে। তার দরুন বিভিন্ন সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে সমাজ সমগ্রতার বোধে অংশগ্রহণ এবং মতাদর্শগত বিকল্পের মধ্যে বিযুক্ততার সূত্রপাত ঘটেছে। কাজ, শিল্প যে সামাজিক ভাষা এই বোধটি ছিন্ন হয়েছে। আবেদিনের কাজের মধ্যে দিয়ে সমাজ সমগ্রতার বোধ ফিরে এসেছে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার বিপরীতে সৃষ্টিশীল এবং মুক্তির প্রাক্সিসের প্রবলতা নিয়ে।...বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বুদ্ধিবাদী বিকল্পের বদলে জনসাধারণের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করে রেখেছেন আমৃত্যু। এই যুক্ততাই তাঁর চেতনাকে সেক্যুলার করেছে একপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ অন্যপক্ষে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীতে (বোরহানউদ্দিন, ১৯৯০ : ৪৩)।

অর্থাৎ জয়নুল আবেদিন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনাপ্রসূত চিত্রকলাচর্চাকে অনুসরণ করেননি, যে জাতীয়তাবাদী ভাবনায় আত্মপরিচয় নির্মাণের সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের আড়ালে ধর্মীয় পরিচয় এবং প্রাচ্যতত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে অস্বীকারের দরুন এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাঁর মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল কি না, সেটা অবশ্যই ছিল, যার দরুন তিনি গ্রামবাংলাকে শেষ পর্যন্ত ছবির বিষয় করেছেন। তাঁর দেশাত্মবোধের উৎস তাঁর গ্রামীণ সমাজের সমগ্রতার মধ্যে। এই সমগ্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ছবি আঞ্চলিক বিষয়াবলিকেই প্রাধান্য দেয় এবং তা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। তাই তাঁর কাজ সহজেই আলাদা করা যায় ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী শিল্পীদের আত্মপরিচয় অন্বেষা থেকে।

জয়নুল আবেদিনের ছবির ভাষায় একটি বড় পরিবর্তন আসে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে আঁকা ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা তৈরি এ দুর্ভিক্ষে বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে কলকাতা শহরে ভিড় জমায়। এসব ক্ষুধার্ত মৃত্যুপথযাত্রী, কঙ্কালসার মানুষগুলোকে চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে জয়নুল ঔপনিবেশিক শোষণের ভয়াল রূপকে সার্থকভাবে চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। অস্থিসর্বস্ব মানুষগুলোকে আঁকার ক্ষেত্রে জয়নুলের তুলির রেখা হয়ে ওঠে কর্কশ, কঠিন। মানুষের করুণ অবস্থা তুলে ধরার জন্য পটভূমি ফাঁকা রেখে, চিত্রপটের পুরো অংশে শুধু মানুষই আঁকলেন (চিত্র : ১৩ ও ১৪)। অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে আঁকা জয়নুলের রেখানির্ভর এ ছবিগুলো দক্ষতা ও নান্দনিক গুণের জন্য

অন্য শিল্পীদের দুর্ভিক্ষ নিয়ে আঁকা চিত্রকে ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা চিত্রমালা নিয়ে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামের পাশে একটি ঘরে প্রদর্শনীর আয়োজন করে (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৩৩)। কলকাতার সে সময়ের নামকরা শিল্পীসহ প্রায় সবারই ছবি ছিল এই প্রদর্শনীতে (কামরুল, ২০১০ : ৭৮)। প্রদর্শনীতে জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো কীভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে প্রসঙ্গে কামরুল হাসান লিখেছেন :

> আমার মাস্টার সাহেবের সহজ-সরল রেখাগুলো যে এত প্রচণ্ড আঘাত হানবে, আমি নিজে তাঁর পাশে পাশে থেকেও বুঝতে পারিনি। অতি সাধারণ হলুদ রঙের কার্ট্রিজ কাগজে অয়েল কালারের তুলি দিয়ে স্রেফ কালো রঙের আঁচড়গুলো সদম্ভে চলমান নগরের আদম সন্তানদের মুখে যেন কালি লেপে দিল। এবং একটি নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, সে নাম জয়নুল আবেদিন।
>
> ...কলেজ স্ট্রিটের ওই দুর্ভিক্ষের প্রদর্শনীতে আরও অনেকেই বিভিন্ন মাধ্যমে আঁকা তাদের দুর্ভিক্ষের ছবি প্রদর্শনের জন্য দিয়েছিলেন...কিন্তু বেশ দামি ক্যানভাসে, মূল্যবান ফ্রেমে আবৃত সেসব পেইন্টিং জয়নুল আবেদিনের অতি সাধারণ কাগজে আঁকা চিত্রমালার কাছে যেন ম্লান হয়ে গেল (কামরুল, ২০১০ : ৭৮)।

সমসাময়িক শিল্পসমালোচক ও সি গাঙ্গুলী ১৯৪৪ সালে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি সম্পর্কে লেখেন, 'তাঁর এসব নির্মম তুলির টানের দুঃসাহসিকতার মধ্যে একাধারে ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা ও সততা এবং তার সাথে আবার যুক্ত হয়েছিল আপসহীন বাস্তবতা, যা কিনা বাংলার আধুনিক শিল্পীদের কাজে একেবারেই বিরল এক বৈশিষ্ট্য' (নজরুল, ২০০২ : ১৩)। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর এই প্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছিল। দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা জয়নুলকে অধিক সমাজসচেতন করে তোলে। এর প্রমাণ শুধু তাঁর আঁকা ছবি নয়, ১৯৪৩-৪৫ সালের মধ্যে বামপন্থী সাহিত্যিক, শিল্পী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সংযোগও এটা প্রমাণ করে। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সভা-সমাবেশ এবং গণনাট্য সংঘের প্রতিটি সভা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি ও কামরুল হাসান আমন্ত্রিত হন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৩৫)। যদিও তিনি বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে মানবতাবোধের আধিক্য ছিল বলেই তিনি এ সময়ে সাধারণ জনগণের পক্ষে বামপন্থীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এড়িয়ে যেতে পারেননি।

জয়নুলের পরবর্তীকালের আঁকা অনেক ছবিতে দুর্ভিক্ষের ছবির গুণাগুণ উপস্থিত। পরিমিতবোধ, গতিময় ও ক্ষিপ্র তুলির টান, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জমিন উভয়ের গুরুত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে অনেক ছবিতে বিদ্যমান। ১৯৪০-এর শেষ দিকে তাঁর কয়েকটি ছবিতে যেমন মাছধরা (জলরং, ১৯৪৬) (চিত্র : ১৫), 'ফসলতোলা' (জলরং, ১৯৪৮) (চিত্র : ১৬), 'পলাশবনে সাঁওতাল নারী' (তেলরং, ১৯৪৮) (চিত্র : ১৭) প্রভৃতি ছবিতে মানুষের অবয়ব অনেক বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা জয়নুলকে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের অনেক কাছে নিয়ে আসে, মানুষকে কাছ থেকে দেখতে অনুপ্রাণিত করে।

দেশবিভাগের পর জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট' নামে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কলকাতা আর্ট স্কুলের বাঙালি মুসলমান শিক্ষকবৃন্দ (শফিকুল আমিন, আনোয়ারুল হক, হবিবর রহমান, সফিউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ আলী আহসান), কামরুল হাসান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় জয়নুল আবেদিন এই বৃহৎ কাজটি করেন। যদিও তিনি অনেকের কাছ থেকে ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার কারণে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৫১-৫৫)।

আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘটনাটি তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে অবকাঠামোগত উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি ছিল না, সেই পরিবেশে আধুনিক শিল্পের মতো সংস্কৃতিচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সাধারণ মানুষের ভাবনার ঊর্ধ্বে। আধুনিক শিল্প নির্মাণের মতো জটিল বিষয়কে সেই সময়ের রক্ষণশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে জয়নুল আবেদিন সমাজ অগ্রগতির সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, '...ছবি আঁকার সাফল্যের চেয়ে আমি তৃপ্তি পাই আরও অনেকে ছবি আঁকতে পারবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার প্রচেষ্টায়' (নজরুল, ২০০২ : ৩১)। এ লক্ষ্য ছিল বলেই জয়নুল আবেদিন কলকাতায় জীবিকার নিশ্চয়তা এবং প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি ছেড়ে সামান্য স্কুলের চাকরি নিয়ে স্বল্প পরিচিত ঢাকায় চলে আসতে পেরেছেন। আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মতো শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে সমাজ অগ্রগতির নানা বিষয়ে তিনি সব সময় আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন। এ জন্য তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ছবি আঁকায় মনোযোগ দিতে পারেননি।

'৫০-এর দশকে জয়নুল আবেদিন উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু চিত্রকর্ম করেন। এ চিত্রগুলোতে তিনি আবহমান বাংলার সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে উপস্থাপন করেন। তাঁর এসব চিত্রে বিষয় হিসেবে বাংলার গ্রামীণ মানুষের উপস্থিতি '৫০-এর দশকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। '৫০-এর দশকের শুরুতে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনা বিকাশ লাভ করে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বিকশিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ। ১৯৪৮-৫২ সময়ে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ধারায় পূর্ব বাংলায় বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও চর্চা শুরু হয় ইতিহাস লেখায়, গবেষণায়, সাহিত্যচর্চায় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে (হাসান, ১৯৯২ : ৩০)। পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে বাঙালি তার আবহমান ঐতিহ্যের মধ্যে আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান শুরু করে। জয়নুল আবেদিনের '৫০-এর দশকের ছবিগুলোতে আবহমান বাংলার গ্রামীণ মানুষের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রচেষ্টা লক্ষণীয়। জয়নুল আবেদিনের নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ছবির মধ্য দিয়ে বাঙালির অস্তিত্বচেতনাকে প্রবাহিত করার কারণ হিসেবে যে ঘটনাটি প্রথমে উল্লেখ করতে হয়, তা হলো তাঁর বিদেশভ্রমণ। ১৯৫১ সালে সরকারি বৃত্তির অধীনে

তিনি স্লেড স্কুল অব ফাইন আর্টে ছাপচিত্র ও পেইন্টিংয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ব্রিটেনে যান। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন আর্ট সেন্টারে পটারি ও টেক্সটাইল ডিজাইনিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নেন এবং শিল্পসংক্রান্ত নানা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও তুরস্কের বিভিন্ন মিউজিয়াম ও অনেক শিল্প প্রদর্শনী দেখেন এবং এসব দেশের অনেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে শিল্প সম্পর্কে মতবিনিময় করেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৭৪)। এই বিদেশভ্রমণ ও উচ্চশিক্ষা তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত ও ঐতিহ্যচেতনাকে বৃদ্ধি করে। তিনি '...আমাদের শিল্পের গতিমুখ লোক-ঐতিহ্যের দিকে ফেরানোর এবং এই সমৃদ্ধ ভান্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার সঙ্গে আধুনিক শিল্পের সমন্বয় সাধনের কথা' বলেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৯৫)। কামরুল হাসানের লেখা থেকে এ বিষয়ে জানা যায়। কামরুল হাসান লিখেছেন :

> শিল্পী জয়নুল আবেদিন যখন বিদেশ থেকে ফিরে বাংলার পটুয়া শিল্পীদের চিত্রকলার বিদেশে কী মর্যাদা এবং এটাই আমাদের চিত্রকলার আসল পরিচয় বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার ব্রতচারী-শিবিরে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আবার নতুন আঁকড়ে ধরেছি। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৫২ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫৩ সালের বেশ কিছুদিন একটি সংমিশ্রিত পদ্ধতিতে অনেক ছবির খসড়া এঁকেছিলেন শিল্পী আবেদিন (কামরুল, ২০১০ : ৩৬)।

এ ছাড়া বিদেশে গিয়ে জয়নুল আবেদিনের বাংলার ঐতিহ্য সম্পর্কে যে নতুন আলোকপ্রাপ্তি, সে সম্পর্কে কামরুল হাসান আরো লিখেছেন :

> বড় দুঃখ করে বলতেন (জয়নুল), 'বিদেশে গিয়ে আমার দেশকে চিনতে হলো, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বাংলাদেশের মূল লোকশিল্পের প্রায় প্রতিনিধিত্বমূলক সব নিদর্শনই সংরক্ষিত আছে। ওগুলো না দেখলে নিজের দেশকে বুঝতেই পারতাম না, দেশকে আগে না বুঝে বিদেশে যাওয়া ঠিক নয়, তাহলে আমার মতো ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসতে হয়' (কামরুল, ২০১০ : ১০০)।

কামরুল হাসানের এই বক্তব্যগুলো থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, ঐতিহ্যের তাৎপর্যের গভীরতা জয়নুল বিদেশে গিয়ে বেশি করে উপলব্ধি করেন। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে জয়নুলের উদ্যোগে আর্ট ইনস্টিটিউটে এ দেশের প্রথম লোকশিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই ছিল এ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

'৫০-এর দশকে জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'মা ও শিশু' (টেম্পেরা, ১৯৫১) (চিত্র : ১৮), 'কলসি কাঁখে নারী' (জলরং, ১৯৫১) (চিত্র : ১৯), 'গুণটানা' (গোয়াশ, ১৯৫৫) (চিত্র : ২০), 'দুই বোন' (গোয়াশ, ১৯৫৩) (চিত্র : ২১), 'নারীমুখ' (বোর্ডে গোয়াশ, '৫০-এর দশক) (চিত্র : ২২), 'পাইন্যার মা' (গোয়াশ, ১৯৫৩) (চিত্র : ২৩), 'বাঙালি রমণী' (কাগজে রঙিন কালি, ১৯৫৩) (চিত্র : ২৪), 'কৃষক' (জলরং, ১৯৫৩) (চিত্র : ২৫), 'মহিলার মুখ' (কাগজে গোয়াশ, ১৯৫৩) (চিত্র : ২৬), 'মা ও শিশু' (রঙিন কালি, ১৯৫৩) (চিত্র : ২৭),

'চিন্তা' (টেম্পেরা, ১৯৫৩) (চিত্র : ২৮), 'মা ও শিশু' (১৯৫৩) (চিত্র : ২৯) প্রভৃতি ছবি সম্পাদনের ক্ষেত্রে রূপ বা গড়নের সরলীকরণ, সমতলীয় রঙের প্রয়োগ, বহিঃরেখার ব্যবহার, অলংকারধর্মিতা, মাটির পুতুলের মতো দেহের গড়ন প্রভৃতি লোকশিল্পের রীতিবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির (যেমন কিউবিস্ট বা এক্সপ্রেসশনিস্ট) সংশ্লেষ ঘটেছে। এভাবে জয়নুল ঐহিত্যবাহী লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকের ছবি করেন, যা আত্মপরিচয় নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের ভাষায় পরিণত হয়। তবে জয়নুলের ছবিতে আত্মপরিচয় নির্মাণের আরও কিছু ব্যাখ্যা থেকে যায়।

ভাষা আন্দোলন ছাড়াও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করে (ড. হারুণ, ২০০৩ : ৪৬)। পাকিস্তান রাষ্ট্র বৈষম্য সৃষ্টি করেছে মূলত আঞ্চলিক পরিচয়ের সূত্র ধরে, বাঙালি-অবাঙালির ভিত্তিতে (সিরাজুল, ২০০৭ : ২১১)। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে, বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের জীবনে শোষণের মাধ্যমে দুর্দাশা নেমে আসে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এসব নির্যাতন ও শোষণের কারণে '...পুঞ্জীভূত প্রক্রিয়া জনগণের রাজনৈতিক জীবনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে' (বদরুদ্দীন, ২০০৭ : ৩৫৩)। যেমন যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় সাধারণ জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ '...পূর্ববঙ্গের জনগণ বাঙালি হিসাবে আপন অস্তিত্বের প্রবল স্বাক্ষর উপস্থিত করে' (ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম et al. ২০১৩ : ৪৫৭-৪৫৮)। 'মুসলিম লীগ ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি' (কামাল, ২০০৭ : ৩৭৩)।' কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষেরা ছিল অপরিহার্য উপাদান। ইতিহাস ও সমাজ বিশ্লেষকের মতে, 'জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করেছে, অধস্তন গ্রুপসমূহের আন্দোলন তৈরির সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে...' (বোরহানউদ্দিন, ২০০৫ : ২৮)। গ্রামীণ মানুষ একদিকে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতির ধারক, অন্যদিকে জাতীয় পরিচয় নির্মাণে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কাজেই বাঙালি আত্মপরিচয়ের আর এক প্রকাশ সাধারণ গ্রামীণ মানুষ। জয়নুলের মধ্যে এই বোধটি ক্রিয়াশীল ছিল '৫০-এর দশকে গ্রামীণ মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে চিত্রপট জুড়ে আঁকার মধ্য দিয়ে। যেমন, 'নারীমুখ' (চিত্র : ২২), 'মা ও শিশু' (টেম্পেরা, ১৯৫১) (চিত্র : ৩০), 'কলসি কাঁখে নারী' (চিত্র : ১৯) , 'দুই বোন' (চিত্র : ২১), 'পরিবার' (জলরং, ১৯৫৩) (চিত্র : ৩১), 'কৃষক' (চিত্র : ২৫), 'বাঙালি রমণী' (চিত্র : ২৪), 'চিন্তা' (চিত্র : ২৮), 'বিশ্রামরত তিন রমণী' (টেম্পেরা, ১৯৫৩) (চিত্র : ৩২), 'পাইন্যার মা' (চিত্র : ২৩), 'চার মুখ' (তেলরং, ১৯৫২) (চিত্র : ৩৩), 'মা ও শিশু' (১৯৫৩) (চিত্র : ৩৪), 'আয়নাসহ বধূ' (তেলরং, ১৯৫৩) (চিত্র : ৩৫) প্রভৃতি। আরও কিছু বৈশিষ্ট্য

এ ছবিগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে, যার মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। জয়নুল এ ছবিগুলোতে মানুষকে eye level বা চোখের উচ্চতা বরাবর দৃষ্টিকোণ নিয়ে দেখেছেন। এ ছাড়া ছবিতে মানুষগুলো front angle বা সম্মুখভঙ্গির অধিকারী বা সামনের দিকে মুখ করে বসা বা দাঁড়ানো। এ দুটো অবস্থানের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে John Suler-এর *Photographic Psychology : Image and Psyche* থেকে কিছু বক্তব্যের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। তিনি eye level-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

> For a level camera angle with humans and animals, we're shooting at the eye level of the subject. With people, it's the natural way to view the person. It shows people the way we would expect to see them in real life. Psychologically, we're seeing eye-to-eye with the person. We feel equal status and power with them, like a peer (2013).

Front angle নিয়ে Suler-এর ব্যাখ্যা হলো :

> ...when you shoot from the front of a subject, you're assuming a straight-on, matter-of-fact, no-nonsense approach. It might even seem like an honest, non-deceptive point of view. If the subject is looking into the camera, you and the subject are head-on and face-to-face. You're aware of the subject and the subject is aware of you... When subject is not looking into the camera, the front angle might still convey that no-nonsense feeling that "I'm right here before you, looking at you." The photographer and viewer of the photo are making their presence known (2013).

জয়নুলের এই ছবিগুলো আই লেভেল থেকে আঁকা হয়েছে। বসে থাকা মানুষগুলোও আই লেভেল থেকে বা চোখ বরাবর উচ্চতা থেকে আঁকা, মনে হয় শিল্পী যেন নিজেও সামনাসামনি বসে মানুষটিকে দেখছেন। এ কারণে দর্শক বা শিল্পী ছবির মানুষগুলোর সাথে নিজেকে একই অবস্থানে দেখে। বাঙালি ঐতিহ্যের ধারক এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অংশ এই গ্রামীণ মানুষগুলোকে শিল্পী তাঁর এবং দর্শকের মানসচেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সম্মুখ অবস্থানে থাকার কারণে ফিগারগুলো নিজের অবস্থান সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী ও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। বাঙালি হিসেবে অস্তিত্বচেতনা ছবিগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। দৃঢ়তাসূচক ভঙ্গিকে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে ধরা যেতে পারে। এভাবে ছবিগুলো জাতীয়তাবাদের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রতীক হয়েছে। তবে উল্লিখিত অধিকাংশ চিত্রে নারী অবয়বের প্রাধান্য থাকার কারণে আরেকটু ব্যাখ্যা থেকে যায়। নারী অবয়বের উপস্থাপনের ধরন কেমন ছিল? এর উত্তরে শিল্পসমালোচক ও গবেষক নিসার হোসেনের লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় :

> ...ছবিগুলোতে নারীদেহদকে লৌকিক মূল্যবোধ-জাত উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবে যেমন তুলে ধরা হয়নি, তেমনি নারীদেহের ভঙ্গি ও মাধুর্যকে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও তাতে শরীরী-কামনার উত্তাপ প্রশ্রয় পায়নি। বরং আবেদিনের অন্যান্য ছবির মত এখানেও নারীরা গ্রামবাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি...এদের সরল চেহারায় সম্ভ্রম

রক্ষার সহজাত প্রবণতা আর গৃহিণীর সুখ-স্বপ্নের আভাস যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি এদের পরিশ্রমী কর্মক্ষম ভাবটিও যেন অটুট রয়েছে (নিসার, ২০০৭ : ২৮০-২৮১)।

গ্রামীণ মানুষকে তৎকালীন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে প্রাসঙ্গিক করার ক্ষেত্রে আরও কিছু ছবি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। 'বিদ্রোহী গরু' (জলরং, ১৯৫১) (চিত্র : ৩৬), 'মই দেয়া' (জলরং, ১৯৫১) (চিত্র : ৩৭), 'কালবৈশাখী' (জলরং, ১৯৫১) (চিত্র : ৩৮), 'গুণ টানা' (চিত্র : ২০), 'সংগ্রাম' (টেম্পেরা, ১৯৫৪) (চিত্র : ৩৯) প্রভৃতি ছবিতে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অভিযান বা বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যক্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতীকী ব্যঞ্জনা এ ছবিগুলোতে হয়তো প্রকাশ পেয়েছে।

'৫০-এর দশকে জয়নুলের ছবিগুলো আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং নতুনত্বের সূচনা করে। এই স্বাতন্ত্র্য বিচার করা যেতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্রচর্চার সাথে তুলনা করে। জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ শিল্পীর সমসাময়িক পশ্চিম পাকিস্তানের জুবেইদা আগা (১৯২২-১৯৯৭) (চিত্র : ৪০), শাকির আলী (১৯১৬-৭৫) (চিত্র : ৪১), শেখ সফদর (১৯২৪-৮৩) (চিত্র : ৪২), অজ্জির জুবি (১৯২২) প্রমুখ শিল্পী ১৯৪৭ সালের দিকে বিমূর্ত রীতির চর্চা শুরু করেন এবং এর মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী রীতির (আবদুর রহমান চুঘতাই, ফাইজী রাহামিন, আল্লাহ বক্স প্রমুখের চিত্র) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানান। জুবেইদা আগা ছিলেন অগ্রপথিক। তাঁর কাজে বিমূর্ত রীতির শুরু ১৯৪৬-এর দিকে (Jalal, 1962 :102-103)। তাঁদের বিমূর্ত রীতির বিপরীতে জয়নুলের ছবি বাস্তবধর্মী গুণ অর্জন করেছে। এই বাস্তবধর্মিতা বাস্তব জগতের হুবহু নকল নয়। এই বাস্তবধর্মিতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এভাবে,

> Reality is here seen not as static *appearance* but as the movement of psychological or social or physical forces; realism is then a conscious commitment to understanding and describing these. It then may or may not include realistic description or *representation* of particular features (Raymond, 1988 : 261).

জয়নুলের অনেক ছবিও আঙ্গিকের নিরীক্ষাধর্মিতার (যেমন লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির সংশ্লেষ) কারণে বাস্তবের সরাসরি উপস্থাপন হয়নি কিন্তু তাঁর ছবি সামগ্রিকভাবে সেই সময়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছিল। এ কারণে তাঁর ছবিতে বাস্তবতার বোধ প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে স্বতন্ত্র ভাষা নির্মাণের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জয়নুল বলেন :

> বাঙালির ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতির জন্য সবার যে আন্দোলন, সম্ভবত তারই প্রভাব পড়লো অবচেতনভাবে আমারও মনে, বাঙালির লোকজ শিল্পরীতিকে তুলে ধরতে হবে, পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের

প্রাধান্যকে অস্বীকার করার একটা বিদ্রোহ হিসাবেই রচিত হলো আমার একটি চিত্রপর্যায় এবং সম্ভবত নিজেরই অজ্ঞাতে এইসব শক্তি কাজ করেছে (নজরুল, ২০০২ : ২৯-৩০)।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে জয়নুল আবেদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ছবি আঁকেননি বা আঁকতে পারেননি। কারণ তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন দেশের শিল্পকলার উন্নতির জন্য নানাবিধ কাজে। যেমন ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৫৬ সালের অক্টোবরের আগপর্যন্ত তিনি শাহবাগে চারুকলা ইনস্টিটিউটের নতুন ভবন নির্মাণ কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচুর মেধা, সময় ও মনোযোগ ব্যয় করেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৮৫)। ১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি পেশোয়ার ইউনিভার্সিটির ফাইন আর্ট বিভাগ চালু করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ১২৭)। তিনি ঢাকার '...চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে, তা মনে করেননি। এই প্রতিষ্ঠানকে উত্তরোত্তর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার সংগ্রাম তিনি অব্যাহত রাখেন' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ১২১-১২২)। এসব বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে তাঁর ছবি আঁকা ব্যাহত হয়। তদুপরি তিনি নানা বাধা অতিক্রম করে যে অক্লান্ত শ্রম এবং মেধা এসব কাজের পেছনে ব্যয় করেন, সব সময় তার যথার্থ মূল্যায়ন না হওয়াতে তাঁর মনে দ্বিধার উদয় হয়। তাঁর এই আশাহতের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ হাসান দানিকে লেখা চিঠি থেকে (আজিজুল, ২০১৫ : ১২৫)। কাজেই এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, '৬০-এর দশক জয়নুলের অনেক কর্মসম্পাদনের পর একটি উপলব্ধির সময়কাল। তবে জয়নুল এসবের মাঝে বা এ সময়ে যে ছবি আঁকেননি তা নয়, '৬০-এর দশকেও তাঁর আঁকা অনেক ছবি রয়েছে। এর মধ্যে কিছু ছবি তাৎপর্যপূর্ণ, বিশ্লেষণের দাবি রাখে। '৬০-এর দশকে করা তাঁর 'Faces' (চিত্র : ৪৩) 'মাছ ধরা' (কাগজে তেলরং) (চিত্র : ৪৪), 'আত্মপ্রতিকৃতি' (কাগজে কালি ও তুলি) (চিত্র : ৪৫), 'প্রসাধন' (ক্যানভাসে তেলরং, ১৯৬৭) (চিত্র : ৪৬), 'প্রসাধন' (কাগজে কালি ও তুলি, ষাটের দশক) (চিত্র : ৪৭), 'কলসি কাঁখে রমণীরা' (মিশ্র মাধ্যম, ১৯৬৫) (চিত্র : ৪৮) প্রভৃতি চিত্রে মানুষের অবয়ব স্পষ্ট রেখায় প্রতিভাত না। রেখা ও রঙের এলোমেলো ব্যবহার, বহিঃরেখার অস্পষ্টতা, পটভূমির সাথে কোথাও কোথাও ফর্মের মিশে যাওয়া–প্রভৃতি গুণাগুণ ছবিগুলোকে অধিক বিমূর্ত গুণ আরোপ করেছে। আবার এই প্রশ্নও মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, জয়নুলের দ্বিধান্বিত মনের কোনো কোনো প্রভাব কি চিত্রে পড়েছে? যে দ্বিধা চিত্রে অবয়বকে স্পষ্ট হতে বিরত রেখেছে? পরিচিত জগৎ অপরিচিত রূপে আবির্ভূত হচ্ছে? এটি একটি অনুমানমাত্র। তা ছাড়া '৬০-এর দশকে আইয়ুবের দমনমূলক রাজনীতি, বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত প্রভৃতি কারণে হয়তো জয়নুলের '৫০-দশকের মতো আশাবাদী মনোভঙ্গি শিল্প নির্মাণে প্রভাব ফেলেনি। আইয়ুবের দমনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ধর্ম, পেশানির্বিশেষে দেশের মানুষের এই জাগরণই জয়নুলকে উৎসাহিত করেছিল ৬৫ ফুট দীর্ঘ ও ৬ ফুট প্রস্থের 'নবান্ন' স্ক্রল চিত্রটি অঙ্কন

করতে (নবান্ন, কাগজে জলরং ও মোম, ১৯৭০) (চিত্র : ৪৯)। যদিও এ চিত্রটি তিনি '৭০ সালে আঁকেন তথাপি এর অনুপ্রেরণা '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান থেকে শুরু। এ কারণে এই চিত্রটি এখানে আলোচনায় আনা হয়েছে। 'নবান্ন' স্ক্রল চিত্রটিতে তিনি আবহমান বাংলার রূপকে তুলে ধরেছেন। কৃষকের সংগ্রাম, আনন্দ, উৎসব এবং দুর্যোগ–সবই ধারাবাহিকভাবে চিত্রটিতে উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে দেশে যখন নানা আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে, তখনই দেশের মানুষকে বাঙালি ঐতিহ্যের মাধ্যমে জাগ্রত করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন জয়নুল তাঁর ছবির মধ্য দিয়ে।

কামরুল হাসান কলকাতা সরকারি শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি হন ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৯ সালে তিনি ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দেন। ব্রতচারী আন্দোলনে যোগদান কামরুল হাসানের মানসপটে পরিবর্তন আনে এবং আমৃত্যু তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রভাবিত করে। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের সরকারি কর্মকর্তা। তাঁর জন্মভূমি ছিল সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার বীরশ্রী গ্রামে। মনেপ্রাণে তিনি বাঙালি ছিলেন এবং ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল বাঙালিকে উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই তিনি ১৯৩১ সালে ব্রতচারী আন্দোলন গড়ে তোলেন (সৈয়দ আজিজুল, ১৯৯৮ : ৩৫)। ব্রতচারী আন্দোলন সম্পর্কে কামরুল হাসান লেখেন 'বাঙালি সংস্কৃতি ও শুদ্ধ জাতীয়তাবাদ প্রত্যেকটি বাঙালির জীবন গঠনে একটা স্বকীয়তা রক্ষা করবে–সেটাই ছিল ব্রতচারী আন্দোলনের মূলনীতি। এ ছাড়া আরেকটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে, সম্প্রীতি গড়ে তোলা। গুরুসদয় ছিলেন ব্রাহ্মসমাজে বিশ্বাসী' (কামরুল, ২০১০ : ১৩৮)।

ব্রতচারী শিবিরে অংশগ্রহণ করে কামরুল হাসান বাংলার লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '...নাচ শিখতে গিয়ে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি ও শক্তির পরিচয় পাব, তা ছিল আমার কল্পনাতীত ব্যাপার' (কামরুল, ২০১০ : ১৫৫)। বিশেষ করে মটরু পটুয়ার ছবি আঁকার ধরন তাঁকে মুগ্ধ করে (কামরুল, ২০১০ : ১৫৬)। ছবি আঁকার বিষয়ে গুরুসদয়ের উপদেশের কথা বলতে গিয়ে কামরুল হাসান লিখেছেন :

> মটরুর কাজ দেখিয়েই গুরুজি একদিন আমাকে বলেছিলেন, '...মনে রেখো, চিত্রকলার ব্যাপারে আমরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। শান্তিনিকেতনে নন্দলালেরা এই ঋণ শোধ করার প্রচেষ্টায় লেগেছেন। তোমাদের একদিন এই ঋণ শোধ করতে হবে। তার পুঁজি জোগাবে এই মটরুদের মতো পটুয়ারা।' ...গুরুজি এটাও বলেছিলেন 'তবে যুগধর্মকে অস্বীকার করবে না কোনো দিন, কারণ আমাদের আপন পরিচয় বহন করেই যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। সে জন্যই বাগদি, চাঁড়াল, বাউরি, সাঁওতালদের সঙ্গে তোমাদের একত্র করেছি...' (কামরুল, ২০১০ : ১৫৬)।

ব্রতচারী আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে কামরুল হাসান দেশ ও দেশের সাধারণ মানুষ এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। এই ভালোবাসার উপলব্ধি তাঁর চিত্রচর্চাতে প্রভাব ফেলেছে দৃঢ়ভাবে (আবুল

মনসুর, ২০০৭ : ২৮)। তবে কামরুল হাসানের আগে সুনয়নী দেবী, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের চিত্রকর্মে লোকশিল্পের আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন। ব্রতচারী ছাড়া কামরুল হাসান তাঁর কাজে যামিনী রায়ের প্রভাব উল্লেখ করেছেন একটি সাক্ষাৎকারে (উর্মি, ১৯৯০ : ১১৯-১২০)। আর একটি বিষয় কামরুল হাসানকে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে প্রেরণা জুগিয়েছে, সেটি হলো জয়নুল আবেদিনের লোকশিল্প নিয়ে ভাবনা।

জয়নুল আবেদিন বিদেশে ভ্রমণ শেষে ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে দেশে ফেরার পর কামরুল হাসান জয়নুলকে দেখে লিখেছেন :

> তিনি (জয়নুল) যেন নতুন আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রভাব ও পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একটি মানুষ তিনি তখন।
>
> ১৯৩৯ সালে আমি ব্রতচারী আন্দোলনে প্রবেশ করেই এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের কাছ থেকে বাংলার শিল্প-ঐতিহ্য সম্পর্কে যে কথা শুনেছিলাম, শিল্পাচার্যের মুখে শুনলাম তারই পুনরাবৃত্তি। ...ব্রতচারী অনুশীলন শিবিরে মটরু পটুয়ার কাছে বসে আমি যে পদ্ধতির তালিম নিয়েছিলাম, মাস্টার সাহেবেরও সেই একই পদ্ধতি। সেই ঐতিহ্যেরই যেন নতুন প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। আর কেউ না হোক, আমি ব্যক্তিগতভাবে অবর্ণনীয় এক শিহরণে শিহরিত হলাম (কামরুল, ২০১০ : ৯৯-১০০)।

অর্থাৎ জয়নুলের উপলব্ধি কামরুল হাসানকে আরো আস্থাবান করেছে। লোকশিল্প নিয়ে কামরুলের চিন্তার ভিত্তিকে দৃঢ় করেছে। মাহমুদ আল জামান এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আচার্য জয়নুল আবেদিনের এই নব-অর্জিত উপলব্ধি কামরুল হাসানের একক কর্মপ্রচেষ্টাকে আরো উদ্বেলিত করে দিয়েছিল' (মাহমুদ, ১৯৯০ : ১১২)।

ব্রতচারী আন্দোলনে যোগদানের ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতা, জয়নুল আবেদিনের লোকশিল্প নিয়ে ভাবনা এবং পঞ্চাশের দশকে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা (যাকে কেন্দ্র করে বাঙালি ঐতিহ্যের মাঝে আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান শুরু হয়)–এই বিষয়গুলো কামরুল হাসানের '৫০ ও '৬০-এর দশকের ছবির চরিত্র নির্ধারণ করেছে।

কামরুল হাসানের ছবির বিষয় ছিল বাংলার সাধারণ গ্রামীণ মানুষ, তাদের কর্মমুখর জীবন ও পরিবেশ। '৫০ ও '৬০-এর দশকে করা কামরুল হাসানের উল্লেখযোগ্য চিত্রসমষ্টি হলো–'মাছ ধরা' (তেলরং, ১৯৫০) (চিত্র : ৫০), 'মা ও শিশু' (জলরং, পঞ্চাশের দশক) (চিত্র : ৫১), 'মোরগ-১' (জলরং, পঞ্চাশের দশক) (চিত্র : ৫২), 'তিন কন্যা-১' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৫৫) (চিত্র : ৫৩), একাকিত্ব (জলরং, ১৯৬২) (চিত্র : ৫৪), 'জলকেলি' (পেন্সিল ১৯৬২) (চিত্র : ৫৫), 'স্নান' (তেলরং, ১৯৫৬) (চিত্র : ৫৬), 'জেলে' (জলরং ১৯৬৭) (চিত্র : ৫৭), 'তিন রমণী' (জলরং ১৯৬৭) (চিত্র : ৫৮), 'গরুর স্নান' (জলরং ১৯৬৭) (চিত্র : ৫৯), 'বাউল' (জলরং ১৯৬৭) (চিত্র : ৬০), 'কন্যার মালা গাঁথা' (জলরং, ১৯৬৮) (চিত্র : ৬১), 'বাউল' (পোস্টার রং,

১৯৬৮) (চিত্র : ৬২), 'জলকেলি-১' (জলরং ১৯৬৮) (চিত্র : ৬৩), 'সুসজ্জিতা' (পোস্টার রং ১৯৬৮) (চিত্র : ৬৪), 'বংশীবাদক' (পোস্টার রং ১৯৬৯) (চিত্র : ৬৫), 'Birds' (ষাটের দশক) (চিত্র : ৬৬), 'মা ও শিশু' (জলরং, ষাটের দশক), 'The Bride'(জলরং, ষাটের দশক) (চিত্র : ৬৭), 'Village Maid' (টেম্পেরা, ষাটের দশক) (চিত্র : ৬৮) প্রভৃতি। এই ছবিগুলোর বিষয়বস্তু অতিসাধারণ গ্রামীণ মানুষ, তাদের গৃহপালিত পশুপাখি এবং প্রকৃতি। অধিকাংশ চিত্রে কামরুল হাসান সরাচিত্র, পটচিত্র, শখের হাঁড়ির অলংকরণ, মৌলিক রং, দ্বিমাত্রিক ফর্ম, সমতলীয় বর্ণলেপন, তুলিচালনা কৌশল, অলংকারধর্মিতা এবং লোকপুতুলের মতো শরীরের গড়ন–প্রভৃতি রীতিকৌশল ব্যবহার করেছেন। অনেক চিত্রে কিউবিস্ট বা এক্সপ্রেশনিস্ট রীতির সঙ্গে লোকশিল্পের রীতির সংশ্লেষ ঘটেছে। যেমন 'গরুর স্নান' (চিত্র : ৫৯) এবং 'বাউল' (চিত্র : ৬০)। এ ছাড়া ফোবিস্ট রীতির রঙের প্রভাবও তাঁর কাজে ছিল। কামরুল হাসানের 'গল্পগুজব' (তেলরং, পঞ্চাশের দশক) (চিত্র : ৬৯), 'Vision' (চিত্র : ৭০), (জলরং, ষাটের দশক) প্রভৃতি চিত্রে '...নারীদেহ পুতুলের মতো ভরাট, গ্রীবা দীর্ঘ, চোখ-নাক লৌকিক আদলে রীতিবদ্ধ...' (আবুল মনসুর, ২০০৭ : ২৯)। আবার তাঁর 'তিন কন্যা-১' (মেসোনাইট, তেলরং, ১৯৫৫) (চিত্র : ৫৩) ছবিটি লাল, হলুদ ও নীল–এই তিনটি মৌলিক রং ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

শোভন সোম কামরুল হাসানের 'তিনকন্যা' ছবি সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা হলো :

> কামরুলের এই তিন কন্যার অঙ্গভঙ্গিতে, সলজ্জ অথচ অপার বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে, তাদের শাড়ি পরার, কলসি ধরার মধ্যে আদ্যন্ত বাঙালিয়ানা প্রতিফলিত। তাদের বাংলার সঙ্গে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করা যায়। যে-ভাবে সারা গা ঢেকে ওরা শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে, মুখে আঁচল চাপা দিয়েছে, ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা ঘেঁষে, তা একমাত্র বাংলাদেশেই দেখা যায় (শোভন, ১৪১২ : ১০৭)।

অর্থাৎ বাঙালিয়ানা, যে বাঙালিয়ানা খুঁজে পাওয়া যায় গ্রামীণ বাঙালি নারীর নিত্যদিনের কর্মময় জীবনের সহজাত ভঙ্গিতে, সেই ভঙ্গিকেই কামরুল হাসান পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর 'উঁকি' (গোয়াশ, ১৯৬৭) (চিত্র : ৭১) ছবিটিতে নারীর ভঙ্গিও এটি প্রমাণ করে। তবে সামগ্রিকভাবে কামরুল হাসানের ছবিগুলোর একটি বড় বৈশিষ্ট্য–ছবিতে পারিপার্শ্বিক মিলে মানুষগুলোর মধ্যে একধরনের সুখী, প্রফুল্ল, সতেজ ভাব। গাছগাছড়া, লতা, গুল্ম পরিবেষ্টিত স্বাস্থ্যবতী নারীদেহের উপস্থাপনাও এই সুখ-সমৃদ্ধির ইঙ্গিতবাহী। এর কারণ কী হতে পারে? এর একটি কারণ শোভন সোম-অঙ্কন রীতিকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে দিয়েছেন– '...কামরুলের ছবির দিকে তাকালে তাতে বাংলাপটের রংরেখার সাবলীল খেলার ভাবটাই চোখে পড়ে। কামরুলের তুলি চালনায় সচেতন সতর্কতা নেই, আছে স্ফুর্তি, আছে বাঁধনহারা আনন্দ, আছে খেলা, বেহিসাবি খেলার স্ফুর্তি' (শোভন, ১৪১২ : ১০৯)। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকে পর্যাপ্ত মনে হয় না। বিষয়ের দিক

বিবেচনা করলে মনে হয় কামরুল হাসান সামগ্রিকভাবে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর যাকে বলেছেন 'সোনার বাংলার মিথ'। তাঁর ভাষায় :

> ...কামরুল হাসানের কাজে সোনার বাংলার নস্টালজিয়া সংক্রমিত হয়েছে, বাংলার অতীতের একটি নির্বাচিত পর্ব চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে ঃ ঐ নির্বাচিত পর্ব সমকালের গ্রামীণ ঘরবাড়ি, প্যাস্টারল সমাজের মধ্যে নিহিত, বাংলা সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মধ্যে ক্রিয়াশীল, এভাবে তৈরি হয়েছে সোনার বাংলার কিংবদন্তি, পাকিস্তানের সাম্রাজ্যিক-ঔপনিবেশিক বর্তমান ছাড়িয়ে, দারিদ্র্য-জর্জরিত বাংলার আদিমতার দিকে। এভাবেই ইতিহাসের একটি পর্ব, গ্রামীণ প্যাস্টোরাল ব্যবস্থা, আদিমতার নস্টালজিয়া মিলে তৈরি হয়েছে সোনার বাংলার মিথ (বোরহানউদ্দিন, ১৯৯১ : ১৮)।

এখন প্রশ্ন আসে অবাঙালি শাসকদের দ্বারা শোষিত বাঙালি গ্রামীণ সমাজকে কামরুল হাসান কেন 'সোনার বাংলার মিথ' হিসেবে উপস্থাপন করলেন? একটি শোষিত শ্রেণিকে সুখী ভাব নিয়ে উপস্থাপনের কারণ কী ছিল? এর উত্তরে বোরহানউদ্দিন বলেছেন :

> এই প্যাস্টারাল ঐতিহ্যের মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য, একটা বৈপরীত্যের বোধ স্পষ্ট। বৈসাদৃশ্য, বৈপরীত্য হচ্ছে শহর এবং গ্রাম, সভ্যতা এবং আদিমতা, বাঙ্গালি এবং অ-বাঙ্গালি, ভবিষ্যৎ এবং অতীত। তিনি (কামরুল হাসান) তাঁর কাজে এই বৈসাদৃশ্য, বৈপরীত্যের বোধ যেমন দেখিয়েছেন, তেম্নি বিশ্লেষণ করেছেন সামাজিক স্থানচ্যুতি এবং পরিবর্তনের মুখে জটিল, সৃষ্টিশীল সাড়ার এক নক্সা। তার অর্থ কি তিনি আমাদের একটি সুখী স্থানের দিকে নজর ফেরাতে বলছেন, একটি হারানো মুহূর্তের দিকে? এই সুখী, হারানো মুহূর্ত কোন-এক-সময় ছিল এ যেমন সত্য, তেম্নি এখান থেকে যথার্থ সামাজিক, স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি করাও সম্ভব। ...তিনি দেখেছেন প্যাস্টারাল প্রায়শই সমালোচনাত্মক নস্টালজীয়া ঃ আধিপত্যবাদী, দূষিত বর্তমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার উপায় এবং র‍্যাডিক্যাল বিকল্প বাস্তবতা সোচ্চার করার পথ (বোরহানউদ্দিন, ১৯৯১ : ৪৫)।

অর্থাৎ কামরুল হাসানের প্যাস্টোরাল এখানে একধরনের 'প্যারাডক্স' হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। প্যারাডক্স হিসেবে প্যাস্টোরালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Zahra Jannessari Ladani লিখেছেন :

> Gifford (Terry Gifford) believes that pastoral in any epoch and any form contains a central paradox which makes it a suitable means for social criticism.... In "An Essay on Pastoral," Pope (Alexander Pope) claims that the pastoral is an image of the Golden Age and that poets must try to use "some illusion" to make a pastoral pleasant and delightful. Thus, the poet should expose the "best side" of a shepherd's life and conceal "its miseries"... Another important issue in Gifford's view is that the pastoral also looks forward to a future full of hope. ... Gifford argues, since pastoral represents an idealization, "It must also imply a better future conceived in the language of the present". Otherwise, pastoral would lose its paradoxical potential, and would no longer be able to "imaginatively construct an alternative vision" : "behind the negative critique within pastoral" lies an "implicit future" (Ladani, 2014 : 37-38).

প্যারাডক্স হলো আপাতবিরোধী বিবৃতি (Abrams, 1993 : 140)। সেই অনুযায়ী প্যারাডক্স হিসেবে প্যাস্টোরাল এখানে আপাতবিরোধী অর্থ প্রকাশ করেছে। প্যাস্টোরাল গ্রামীণ কৃষক বা রাখালের সুখী ভাবকে তুলে ধরে যা অতীতের সোনালি দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় এবং যা একই সাথে বর্তমানের দুর্দশাকে আড়াল করে ও একটি অপেক্ষমাণ সুদিনের ইঙ্গিত দেয়। এভাবে আপাতবিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান সময়কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখে। কামরুল হাসানের কাজে এই প্যারাডক্স বিদ্যমান। তাঁর চিত্রের সুখী গ্রামীণ সমাজ একই সঙ্গে 'সোনার বাংলার মিথ' বা অতীতের সুখী সোনার বাংলা এবং ভবিষ্যতের শোষণহীন সোনার বাংলার ইঙ্গিতবাহী। এভাবে কামরুল হাসানের ছবি প্যাস্টোরালের প্যারাডক্সের মাধ্যমে পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিক্রিয়ার রূপকল্প। এই রূপকল্পে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি পরিচয়টিই বড় হয়েছে এবং এখানেও সমাজ সমগ্রতার বোধ ক্রিয়াশীল।

বাঙালিয়ানা, বাঙালি ঐতিহ্য এবং '৫০-এর দশকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনায় জারিত হয়ে কামরুল হাসান যেমন আধুনিক চিত্রের ভাষা নির্মাণ করেছেন '৫০ ও '৬০-এর দশকে, তেমনি তাঁর অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও এই বাঙালিয়ানা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চালিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে এ দেশে প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন কামরুল হাসান (সৈয়দ আজিজুল, ১৯৯৮ : ৭০)। তিনি প্রত্যেক প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সচেতনভাবে জড়িত ছিলেন (কাইয়ুম, ১৯৯০ : ৯৫)। ১৯৬৯ সালের ফ্রেব্রুয়ারিতে তিনি বাংলা একাডেমির বটবৃক্ষে অক্ষরবৃক্ষ (চিত্র : ৭২) নির্মাণ করেন (সৈয়দ আজিজুল, ১৯৯৮ : ৯৫)। ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার এক অভিনব কৌশল ছিল এটি। এ ছাড়া তিনি শাড়ির নকশায় বাংলা হরফ, নকশিকাঁথার নকশা, আলপনা এবং লোকজ নকশাকে জনপ্রিয় করে তোলেন উনসত্তরের প্রেক্ষিতে (কাইয়ুম, ১৯৯০ : ৯৬)। তিনি ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলার আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন (কাইয়ুম, ১৯৯০ : ৯৩)। এভাবে তিনি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে নাগরিক জীবনের রুচি তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন।

সফিউদ্দীন আহমেদ কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯৩৬ সালে। ছাত্র থাকাকালে তিনি নেচার স্টাডি, ল্যান্ডস্কেপ, মানুষজন প্রভৃতি আঁকতে গঙ্গার তীর, চিড়িয়াখানা ও শিয়ালদহ স্টেশনে যেতেন। ন্যুড স্টাডি করতে যেতেন শিক্ষক প্রহ্লাদ কর্মকারের গৃহের স্টুডিওতে, কাঁকুরগাছি এলাকায়। এ ছাড়া বাংলার পশ্চিম সীমান্তের রাঢ় অঞ্চল বীরভূম ও সন্নিহিত ঝাড়খন্ডের দুমকা অঞ্চলে নিয়মিত যেতেন। এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও লোকজীবন তাঁর ছবির বিষয় হয়েছে প্রতিনিয়ত (শোভন, ২০০৭ : ৩০০)। ছাত্র থাকাকালীন ছবি আঁকায় তিনি একাডেমিক দক্ষতার পরিচয় দেন (চিত্র : ৭৩) ।

কলকাতা পর্বে যে ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে সফিউদ্দীন একাডেমিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করেন সেগুলো হলো ১৯৪৪-৪৫ সালে আঁকা বেশ কিছু তেলরং চিত্র। এই চিত্রগুলো আঁকেন দুমকা ভ্রমণকালে, তাৎক্ষণিকভাবে। সবগুলো ছবিই আঁকেন ছোট হার্ডবোর্ডে। ১৯৪৪ সালে আঁকা চিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ময়ূরাক্ষী' (চিত্র : ৭৪), 'সূর্যালোকে কুটি' (চিত্র : ৭৫), 'দুমকার কর্মচঞ্চল জীবন' (চিত্র : ৭৬) ও 'দুমকার পথ-১', (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩ : ৬৫)। ১৯৪৫ সালে আঁকা চিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'দুমকার পথ-২' (চিত্র : ৭৭), 'দুমকার পথ-৩' (চিত্র : ৭৮), 'শালবন দুমকা', 'দুমকা-১', 'দুমকা-২' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩ : ৬৬)। 'ছোট আকারের বোর্ডে আঁকা হলেও এসব চিত্রে রয়েছে প্রকৃতির বিশালত্বের ব্যঞ্জনা' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩ : ৬৫)। তবে সফিউদ্দীন শুধু প্রকৃতির বিশালতাকে আয়ত্তে আনেননি, তিনি প্রকৃতির প্রাণছন্দকেও ধরেছেন। ইম্প্রেসনিস্টিক রীতিতে ছোট ছোট তুলির আঁচড়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে রঙের প্রয়োগ করা হয়েছে–তা প্রকৃতির আলো, ছায়া এবং বিশেষ করে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে টুকরো আকাশ দেখা যায়, তা বায়ুমণ্ডলের অনুভব জাগায়। এই প্রাণচঞ্চল বিশাল প্রকৃতির কোলে ক্ষুদ্র মানব সম্প্রদায়ের উপস্থিতি মানুষের জীবনের সাথে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে তুলে ধরে। এই তেলচিত্রগুলোতে ছোট পরিসরে বৃহৎ প্রকৃতিকে অর্থপূর্ণ করে দেখার মধ্য দিয়ে তিনি একাডেমিক রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। ছবি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি একাডেমিক স্বভাববাদী রীতির পরিবর্তে ইম্প্রেসনিস্টিক রীতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর চিত্রে দুমকার প্রকৃতির রুক্ষতা আনার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

কলকাতা পর্বে জলরং, তেলরং, উডপ্রনগ্রেডিং, ড্রাই পয়েন্ট বা একোয়াটিন্ট, যে মাধ্যমেই হোক না কেন, প্রকৃতি চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের বিষয়টি সফিউদ্দিনের শিল্পরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে '৫০-এর দশকের শেষে এবং '৬০-এর দশকে এই পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েই তিনি নিরীক্ষামূলক পর্বে প্রবেশ করেছেন। যদিও চিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে '৫০ ও '৬০-এর দশকে নিরীক্ষার উদাহরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে তিনি ওই সময়ে নিরীক্ষার অবতারণা করেছেন প্রকৃতি থেকে রূপ বা ফর্ম নিয়েই। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় চলে আসার পর থেকে ১৯৫৬ সালে লন্ডনে যাওয়ার আগে–এ সময়ের মধ্যে তিনি যেসব উল্লেখযোগ্য চিত্র রচনা করেন, সেগুলো হলো–'গোপীবাগ' (১৯৫১) (চিত্র : ৭৯), 'বুড়িগঙ্গা-১' (১৯৫১) (চিত্র : ৮০) ও 'বুড়িগঙ্গা-২' (১৯৫১) (চিত্র : ৮১), 'মুন্সিগঞ্জ' (১৯৫১) (চিত্র : ৮২), 'ধানের হাট' (১৯৫২) (চিত্র : ৮৩), 'বুড়িগঙ্গা-৩' (১৯৫২) (চিত্র : ৮৪) 'ধান মাড়ানো' (১৯৫২) (চিত্র : ৮৫), 'শরবতের দোকান-১, (১৯৫৪) (চিত্র : ৮৬), 'মুরগির খাঁচা' (১৯৫৪) (চিত্র : ৮৭), 'মাছ ধরা-১' (১৯৫৪) (চিত্র : ৮৮), 'কাঠমিস্ত্রি' (১৯৫৬) (চিত্র : ৮৯), 'সূর্যমুখী' (১৯৫৬) প্রভৃতি। এই চিত্রগুলো তিনি তেলরঙে সম্পাদন করেন। কলকাতা শহরে বেড়ে ওঠা সফিউদ্দীন আহমেদ পূর্ব বাংলার সমতল ভূমি, নদী, নৌকা, ফসলের জমি এবং এসবের মধ্যে মানুষের কর্মময় জীবন–এসবকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এবং এই দেখাকে

সার্থকভাবে রঙে রূপায়িত করেছেন। ঢাকায় এসে তিনি আর একটি নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন–সেটি হলো বন্যা। '১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে পরপর দুই বছর বন্যায় প্লাবিত হয় সারা দেশ, এমনকি ঢাকাও। সফিউদ্দীন আহমেদের স্বামীবাগের বাড়িও আক্রান্ত হয় বন্যায়' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩ : ১৭)। তিনি বন্যার পানিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'নৌকা ভাড়া করে অথৈ পানির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসেছেন; দেখেছেন প্লাবিত বাংলার রূপ আর জলের সীমাহীন বিস্তার' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩ : ১৭)। তাঁর এ পর্যবেক্ষণে পানি-সম্পর্কিত পরিবেশ অর্থাৎ মাছ, জাল, নৌকা–বিষয় হিসেবে পরবর্তীকালে গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। পানিকে গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণের একটি উদাহরণ হলো ১৯৫৪ সালে তেলরঙে করা 'মাছ ধরা-১' (চিত্র : ৮৮) চিত্রটি। এই চিত্রটিতে নদীতে নৌকার চারদিকের ঢেউয়ে আউটলাইনের (বহিঃরেখা) ব্যবহার, যার মাধ্যমে পানির ঢেউ বা তরঙ্গ অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে মূল বিষয়ের চেয়ে।

জয়নুল আবেদিন এবং কামরুল হাসানের মতো '৫০-এর দশকে সফিউদ্দীনও লোকরীতির প্রভাব থেকে দূরে থাকতে পারেননি। তাঁর কাঠমিস্ত্রি (চিত্র : ৮৯) ছবিটিতে লোকশিল্পের পুতুলের আদলে মানুষের অবয়ব, সমতল রং এবং মোটা আউটলাইনের ব্যবহার রয়েছে। '৫০-এর দশকে তাঁর করা আরো কয়েকটি চিত্রে এই লোকআঙ্গিকের প্রভাব পড়েছে। ১৯৫০ সালে কালি ও তুলিতে আঁকা 'গুণ টানা-১' (চিত্র : ৯০) 'মাছ ধরা' (চিত্র : ৯১), 'দম্পতি' (চিত্র : ৯২), 'বেহালাবাদকসহ ছাদ পেটানো-১' (চিত্র : ৯৩) এবং ১৯৫১ সালে 'গুণ টানা-৩' (চিত্র : ৯৪) প্রভৃতি রেখানির্ভর ছবিগুলোতে লোকশিল্প রীতির নকশাধর্মিতার পাশাপাশি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন 'গুণ টানা-৩' ড্রইংটিতে মাটির পুতুলের আদলে মানুষের শরীরের কাঠামো আঁকা হয়েছে। কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসার পর তাঁর ছবি আঁকার ধরনে এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি ঐতিহ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া সফিউদ্দীনকেও প্রভাবিত করেছিল ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে। তবে শুধু লোকশিল্পের ঐতিহ্য নয়, দেশবিভাগের পর ঢাকায় এসে সফিউদ্দিনের শিল্পীমন হয়তো প্রকৃতির মাঝে খুঁজে ফিরছিল আবহমান বাংলাকে। তাই নগরবাসী হয়েও তাঁর ছবিতে নদী, নৌকা, সাধারণ শ্রমজীবীর পরিবেশ বিষয় হয়ে ওঠে।

১৯৫৬ সালে সফিউদ্দীন আহমেদ উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে যান। সেখানকার সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস থেকে তিনি ১৯৫৮ সালে এচিং ও এনগ্রেভিংয়ে ডিস্টিংশনসহ ডিপ্লোমা লাভ করেন। এরপর তিনি এখানে আরো এক বছর উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩ : ১৭)। লন্ডনে তিনি বিমূর্ত রীতির উদ্বোধন ঘটান ছাপচিত্রের মধ্য দিয়ে। লন্ডনে অবস্থানকালে করা 'জেলের স্বপ্ন' (কপার এনগ্রেভিং, ১৯৫৭) (চিত্র : ৯৫), 'হলুদ জাল' (কপার এনগ্রেভিং ও সফট গ্রাউন্ড, ১৯৫৭) (চিত্র : ৯৬), 'ঝড়ের পূর্বে' (এচিং ও অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৮) (চিত্র : ৯৭) প্রভৃতি ছাপাই ছবি এবং পরবর্তীকালে 'মাছ ধরার সময়-১' (এচিং ও অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৬২) (চিত্র : ৯৮), 'বিক্ষুব্ধ মাছ' (এচিং ও অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৬৪) (চিত্র : ৯৯),

'জাল ও মাছ-২' (এচিং ও চারকোল, ১৯৬৬) (চিত্র : ১০০) প্রভৃতি ছাপাই ছবিতে উত্তল, অবতল প্রভৃতি বিভিন্ন বাঁকা রেখার মাধ্যমে ছবির দেশ বা স্পেস বিভাজিত হয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ (suggestive) রূপের সৃষ্টি করেছে। এসব বাঁকা রেখা তিনি বাংলার নদী, নদীর বাঁক, নদীর ঢেউ, পানির গতি, মাছ, জাল ইত্যাদি থেকে চয়ন করেছেন। লন্ডনে থাকাকালে সফিউদ্দীন তাঁর শিক্ষক মার্লিন ইভান্সকে নিয়ে স্ট্যানলি উইলিয়াম হেটারের (১৯০১-১৯৮৮) প্রদর্শনী দেখতে যান। এই প্রদর্শনী দেখার পর হেটারের ছাপাই ছবি (চিত্র : ১০১) দ্বারা তিনি ভীষণভাবে প্রভাবিত হন (মাহমুদ, ২০০২ : ৬৬)। হেটারের পরাবাস্তব গুণসংবলিত স্বয়ংক্রিয়ভাবের নমনীয় রেখার মাধ্যমে চিত্রের দেশ বা স্পেস বিভাজনের কৌশল তাঁকে আকৃষ্ট করে (Livasgani, 2004 : 101)। বিমূর্ত হলেও সফিউদ্দিনের ছবি বাংলার রূপকল্প নির্মাণ করেছে। এই রূপকল্প সে সময়ের পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালি পরিচয় নিয়ে প্রতিবাদের সমান্তরাল হয়েছে। যেমন, 'বিক্ষুব্ধ মাছ' (চিত্র : ৯৯) চিত্রটিতে 'জালে আবদ্ধ মাছটির চোখে যে বিক্ষোভের আগুন', তা সেই সময়কার পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত বাঙালির ক্ষোভেরই প্রতীক হয়ে প্রকাশ পেয়েছে (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৩ : ৫৩)। লন্ডনে যাওয়ার আগে তাঁর যে তেলরং বা অন্য মাধ্যমে প্রকৃতির রূপায়ণ তারই নির্যাস এ ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে।

ষাটের দশকে সফিউদ্দীন আহমেদ উল্লেখযোগ্য কিছু রেখাচিত্র করেন চারকোল ও ক্রেয়নে। এগুলো হলো 'বাদাম বিক্রেতা-১' (১৯৬০) (চিত্র : ১০২), 'ড্রইং-১' (১৯৬০) (চিত্র : ১০৩), 'বেহালাবাদকসহ ছাদ পিটানো-২' (১৯৬০) (চিত্র : ১০৪), 'শরবতের দোকান' (১৯৬০) (চিত্র : ১০৫), 'ড্রইং-২' (১৯৬৫), 'নৌকা এবং গাছ' (১৯৬৬) (চিত্র : ১০৬), 'কাপড় ব্যবসায়ী' (১৯৬৭), 'প্রিন্টিং প্রেস' (১৯৬৮), 'বেলুন বিক্রেতা' (১৯৬৮) প্রভৃতি। রেখা ছাড়াও বিভিন্ন শেডের টোন ব্যবহার করে কালোর তারতম্য ঘটিয়েছেন রেখাচিত্রগুলোতে। এ ক্ষেত্রে রেখাচিত্রগুলো ব্যতিক্রমী গুণ অর্জন করেছে। বিষয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে এই কাজগুলো এই অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ যে এখানে তিনি পূর্ব বাংলার খেটে খাওয়া মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমনভাবে তিনি এখানকার প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর ছবির ভাষা গড়ে তুলেছেন তেমনিভাবে শ্রমজীবী মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে নিরীক্ষার মাধ্যমে তুলে এনেছেন, হোক তা রেখাচিত্র। সাধারণ বেলুনওয়ালা বা ফেরিওয়ালাও যে বাঙালি সংস্কৃতির অংশ, বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রভাষায় তিনি এই উপলব্ধিকেই প্রতিভাত করেছেন। সফিউদ্দিনের এই কাজগুলো বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ বাঙালির আত্মপরিচয় তাঁর ছবিতেও প্রকাশ পেয়েছে। তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির পরিচয় ছবিতে আসাটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সচেতনভাবে বাঙালি উপাদান–হোক তা বাংলার প্রকৃতি, লোকশিল্প বা বাংলার সাধারণ মানুষ–এসব বিষয় ছবিতে আসার পেছনে দেশপ্রেম এবং বাঙালিত্ব সাধনাই ক্রিয়াশীল ছিল এবং সফিউদ্দিনের ছবি এর ব্যতিক্রম ছিল না।

জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান এবং সফিউদ্দীন আহমেদের সমসাময়িক হলেও এস. এম. সুলতান বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেন ১৯৭০-এর দশকে। অবিভক্ত ভারতে করা তাঁর কোনো শিল্পকর্ম পাওয়া যায় না। পাকিস্তান পর্বের স্বল্পসংখ্যক ছবির মধ্য দিয়ে তাঁকে মূল্যায়ন করা হয়েছে এখানে। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ১৯৪১ সালে। এস. এম. সুলতান যে চিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার ভাষা সমৃদ্ধ করেছেন, তার সবই আঁকা হয়েছে ১৯৭০-এর দশক থেকে। যেহেতু এই অভিসন্দর্ভের সময়কাল ধরা হয়েছে '৬০-এর দশক পর্যন্ত, সে কারণে এস এম সুলতানের '৫০ ও '৬০-এর দশকের কিছু ছবি এখানে আলোচনা করা হলো।

১৯৫৩ সালে 'পারাপার' (চিত্র : ১০৭) নামে একটি তেলচিত্রতে অনেকটা ভ্যান গঘের মতো করে তুলির আঁচড় প্রয়োগ করে গ্রামীণ দৃশ্য–নদী, নৌকা, মানুষ, ঘরবাড়ি আঁকা হয়েছে। এ রীতির আরো চারটি চিত্র পাওয়া যায় ১৯৬৯ সালের করা–'কলসি কাঁখে রমণী' (চিত্র : ১০৮), 'মা ও শিশু' (চিত্র : ১০৯), 'নায়র' (চিত্র : ১১০) ও 'মাছ ধরা-১' (চিত্র : ১১১)। তেলরঙে আঁকা এ ছবিগুলোর প্রথম তিনটিতে মানুষের শরীর দৃশ্যপটজুড়ে রয়েছে। ছবিগুলোতে আলোছায়ার মাধ্যমে ভলিউম তৈরির প্রচেষ্টা নেই। 'মাছ ধরা-১' ছবিটিতে মানুষগুলো পেশিবহুল করে আঁকা কিন্তু দেহের অনুপাত বাস্তবানুগ নয়। পাকিস্তান পর্বে এই গ্রামীণ মানুষকে উপস্থাপনের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সুলতানের কথার মধ্য দিয়ে। '৯০-এর দশকে শাহাদুজ্জামানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সুলতান বলেন :

> ...'৭৬-এর ছবিগুলোতে হয়তো নতুন অনেক ব্যাপার এসেছে। তবে আমি সব সময় কৃষকদের এঁকেছি, কৃষকরা যুগ যুগ ধরে অমানবিক পরিশ্রম করে চলেছে। ওদের উপজীব্য করেই সমাজটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ওদের চিরকালই Betray করা হয়েছে। বৃটিশরা করেছে, পাকিস্তানীরা করেছে। '৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে তাদের অনেক আশা দেয়া হয়েছিল কিন্তু They were betrayed. এই একটা Exploitation process, আমরা ছবিগুলো তার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ (শাহাদুজ্জামান, ১৯৯০ : ১৮)।

এই বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে পাকিস্তান পর্বে সুলতানের গ্রামীণ মানুষকে উপস্থাপনা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিক্রিয়া থেকে করা হয়েছে। কাজেই সুলতান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভাবনাবলয়ের ভেতরে থেকেই কৃষক বা গ্রামীণ শ্রমজীবী সমাজকে চিত্রায়ণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ এবং এস. এম. সুলতানের নিরীক্ষামূলক চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার শুরু। তাদের চিত্রে নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল আঞ্চলিক বিষয়, দেশজ চেতনা, আত্মপরিচয় নির্মাণ, পাশ্চাত্য রীতির সাথে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যের সংশ্লেষ প্রভৃতি। দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উপস্থাপন প্রতিনিয়ত তাদের দেশজ ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছে নিরীক্ষার মাধ্যমে। মানুষ ও প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে চিত্ররচনার

চর্চা তাঁরা কলকাতা পর্বে শুরু করেন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা শিল্পীদের আত্মপরিচয় নির্মাণে অনুপ্রেরণা জোগায়। বাংলার গ্রাম, শহর, নদী, জনপদ, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, বাংলার লোকশিল্প–সবকিছুর মধ্যেই শিল্পীরা বাঙালি হিসেবে নিজের পরিচয়কে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেন। আর এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয়েছিল আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন চিত্রভাষা নির্মাণ। এভাবে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রচর্চার প্রথম পর্ব গড়ে ওঠে। যদিও এই চারজন শিল্পীর ছবির ভাষায়, নিরীক্ষাধর্মিতায় পার্থক্য ছিল। কিন্তু অভিন্নতা ছিল তাদের শিল্পমানসে। ভাষা আন্দোলনসহ তৎকালীন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঘটনাবলি শিল্পীদের মানসচরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলেছে। অবাঙালি শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী মানসিকতা থেকেই বাংলার নিম্নবর্গের মানুষকে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁরা। তাই তাঁদের ছবির ভাষা তৈরি হয়েছে–আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং নিরীক্ষাধর্মিতা–এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। এভাবে তাঁরা নতুন চিত্রভাষা সৃষ্টি করেন। এই পর্বের চিত্রভাষাকে আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার প্রথম পর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

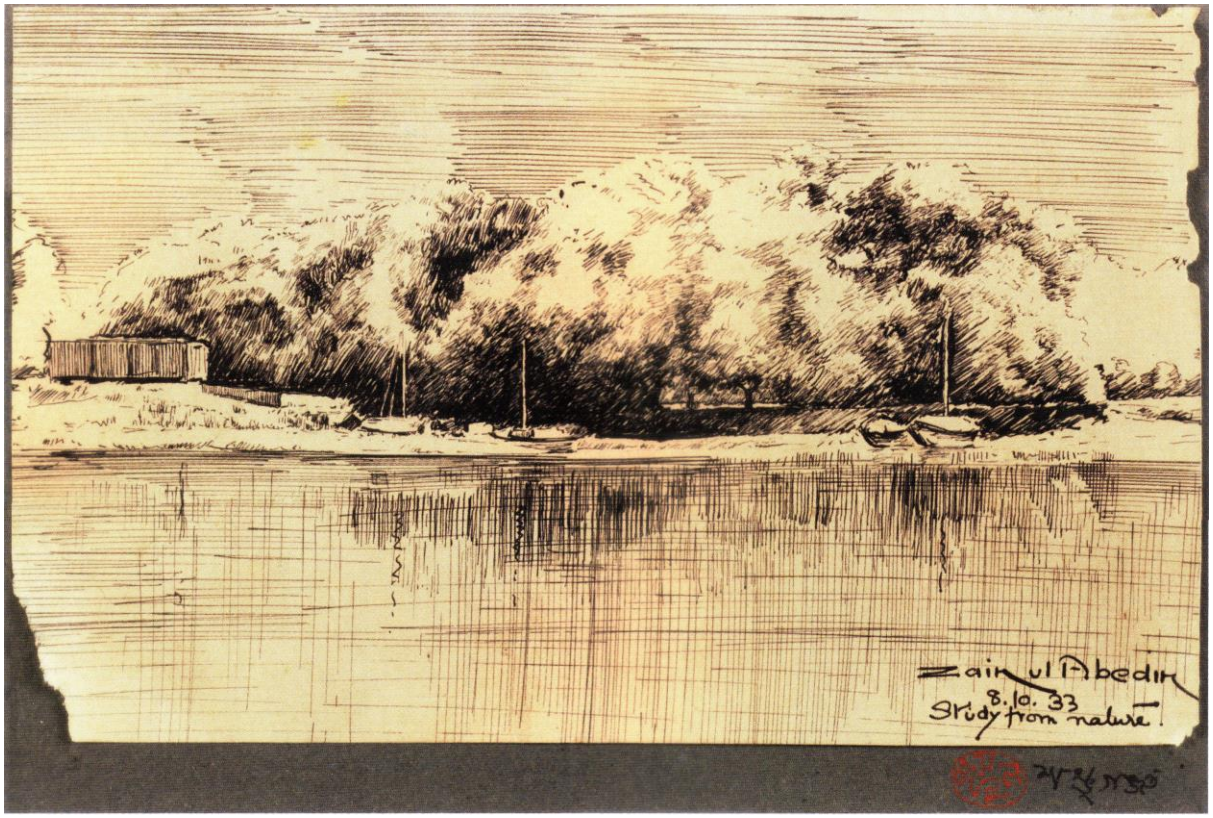

চিত্র-৩ : শম্ভুগঞ্জ ঘাট, কাগজে কলম, ১২.৫×১৮.৫ সেমি. ১৯৩৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪ : ঘাটে বাঁধা নৌকা, ৩৯×২৯ জলরং, ১৯৩৬, জয়নুল আবেদিন

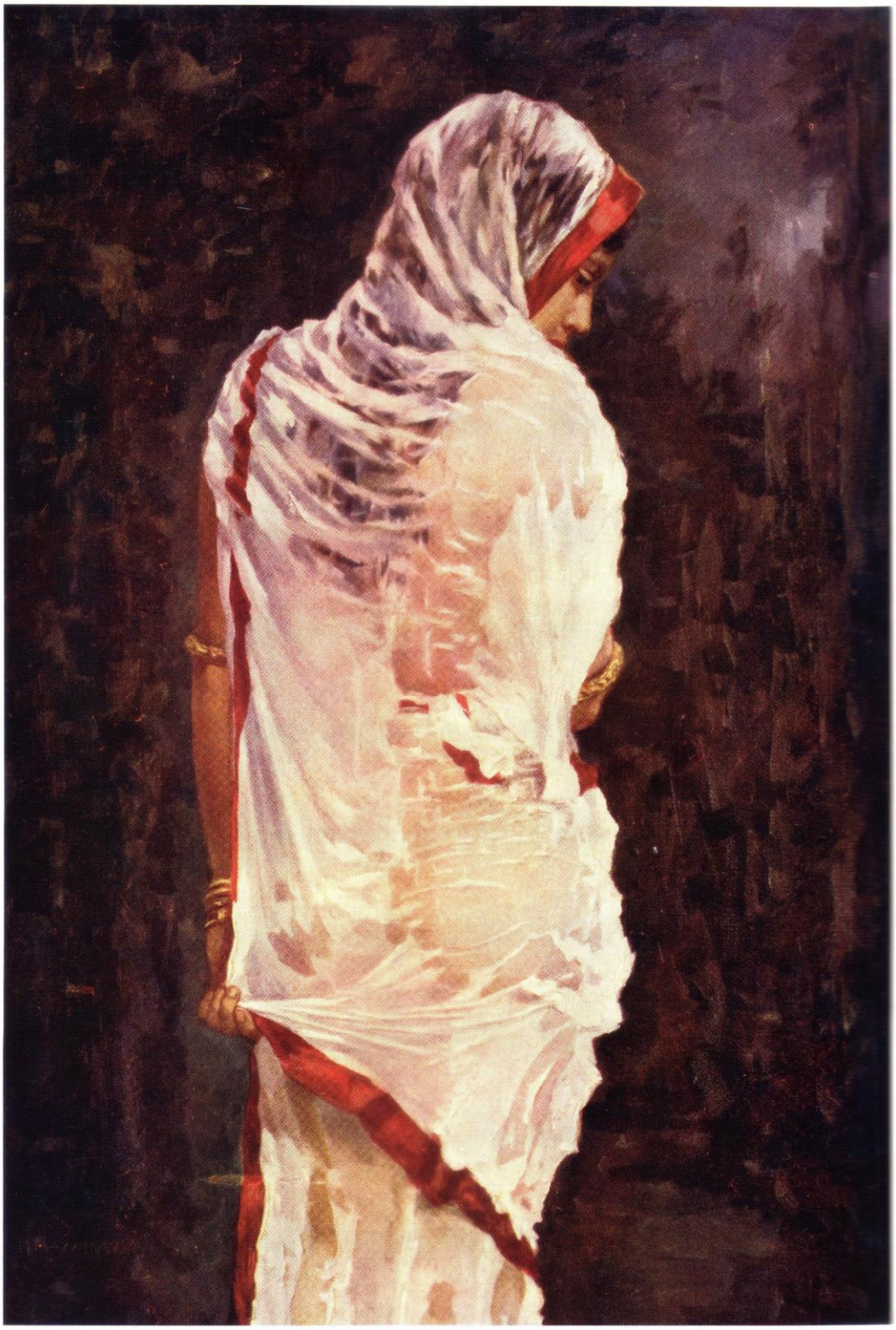

চিত্র-৫ : পল্লী প্রাণ, ক্যানভাসে তেলরং, ১৯২১, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

চিত্র-৬ : পদ্মা নদীতে সূর্যাস্ত, ক্যানভাসে তেলরং, ৩০×৪৭ সেমি, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী

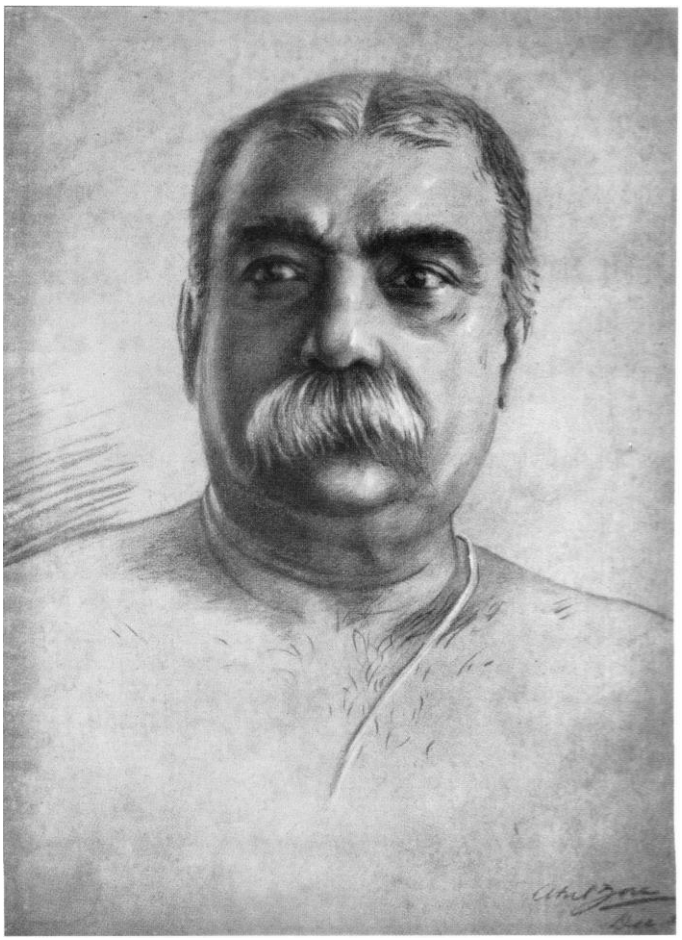

চিত্র-৭ : Bengal Tiger, কাগজে পেনসিল স্কেচ, ১৯২২, অতুল বসু

চিত্র-৮ : ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌকা, জলরং, ৩৯×২৯ সেমি, ১৯৩৯, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৯ : দুমকা, কাগজে জলরং, ২৮.৫×৩৮.৫ সেমি, ১৯৪৫, জয়নুল আবেদিন

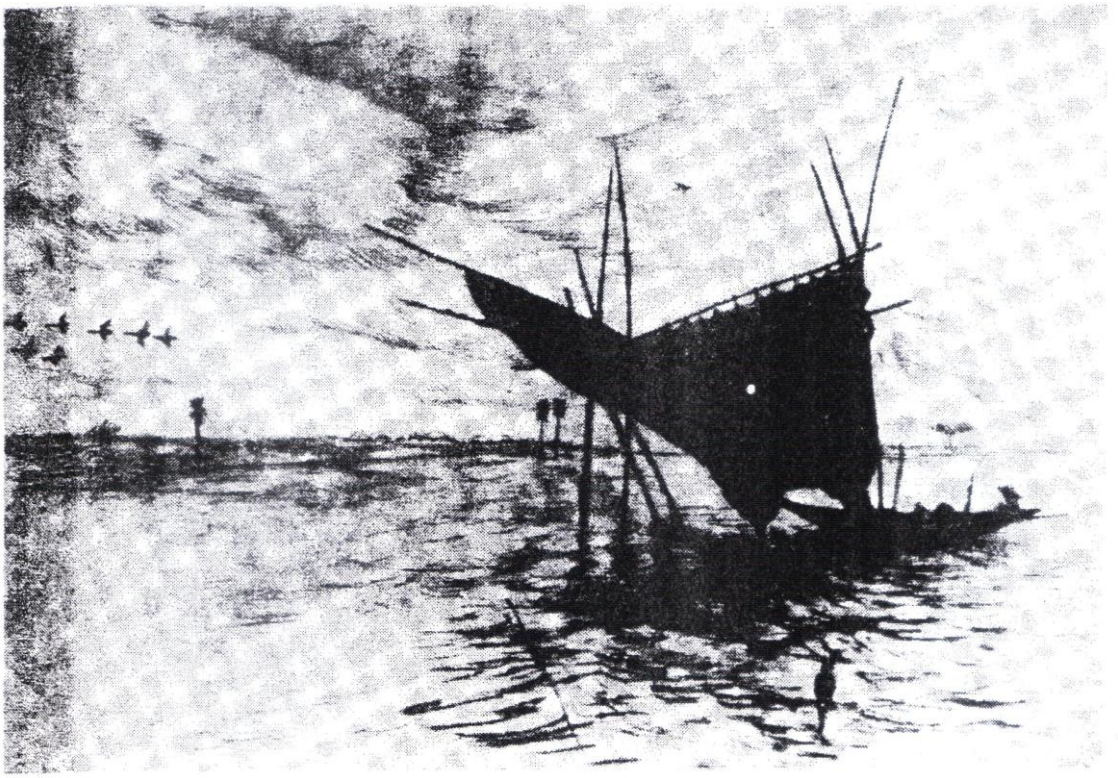

চিত্র-১০ : Drawing the Net, ড্রাইপয়েন্ট এচিং, ১৯৩৮, মুকুল দে

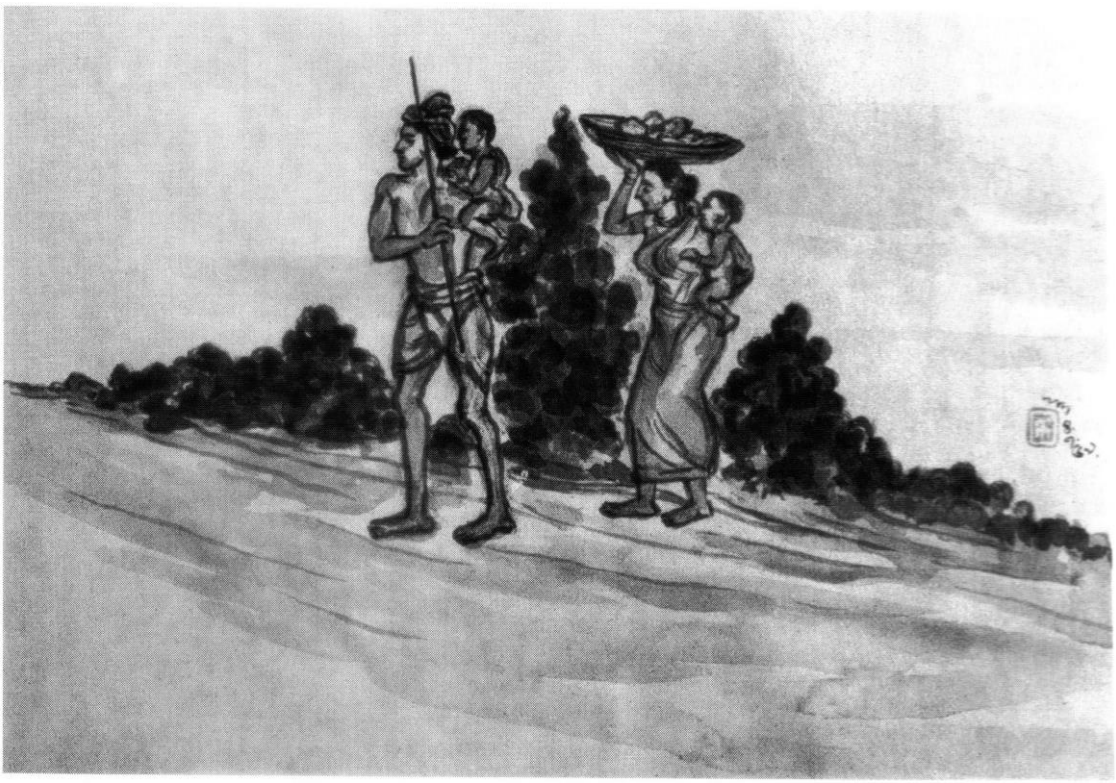

চিত্র-১১ : Santals in Birbhum landscape, line and wash on paper, c.1920s, নন্দলাল বসু

চিত্র-১২ : Santal Family, Cast Cement, ১৯৩৮, রামকিঙ্কর বেইজ

চিত্র-১৩ : দুর্ভিক্ষ চিত্র-১৪, কালি ও তুলি, ১৯৪৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-১৪ : দুর্ভিক্ষ চিত্র-১৩, কালি ও তুলি, ১৯৪৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-১৫ : মাছ ধরা, কাগজে জলরং, ৫৭.৫×৭৭.৫ সেমি, ১৯৪৬, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-১৬ : ফসল তোলা, কাগজে জলরং, ৫৭.৫×৭৭.৫ সেমি, ১৯৪৮, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-১৭ : পলাশবনে সাঁওতাল নারী, তেলরং, ১৯৪৮, জয়নুল আবেদিন

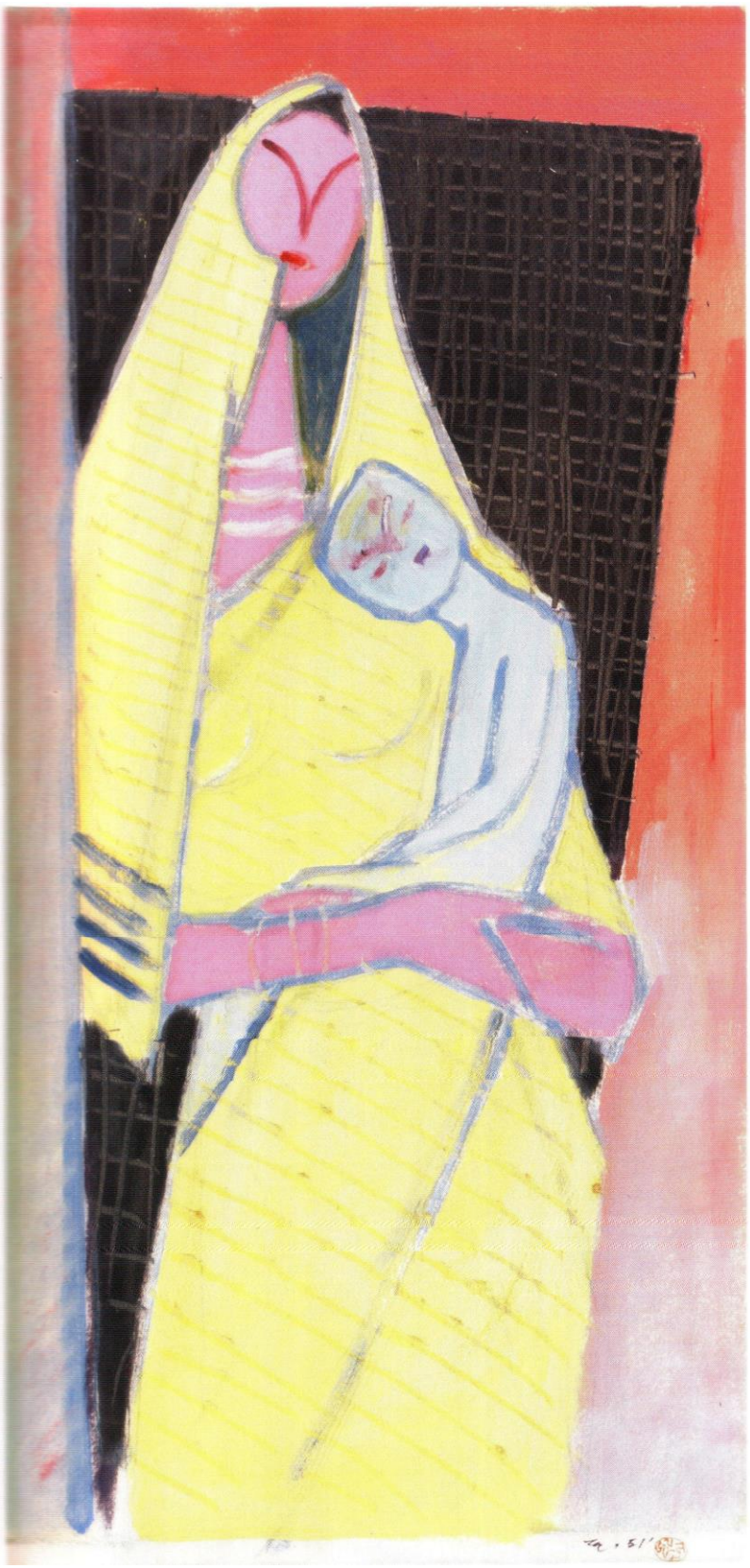

চিত্র-১৮ : মা ও শিশু, কাগজে টেম্পেরা, ৫৪.৫×২৬ সেমি, ১৯৫১ জয়নুল আবেদিন

চিত্র-১৯ : কলসি কাঁখে নারী, কাগজে জলরং, ৫৪×৪১ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-২০: গুণটানা, কাগজে গোয়াশ, ২৫×৩৫ সেমি, ১৯৫৫, জয়নুল আবেদিন

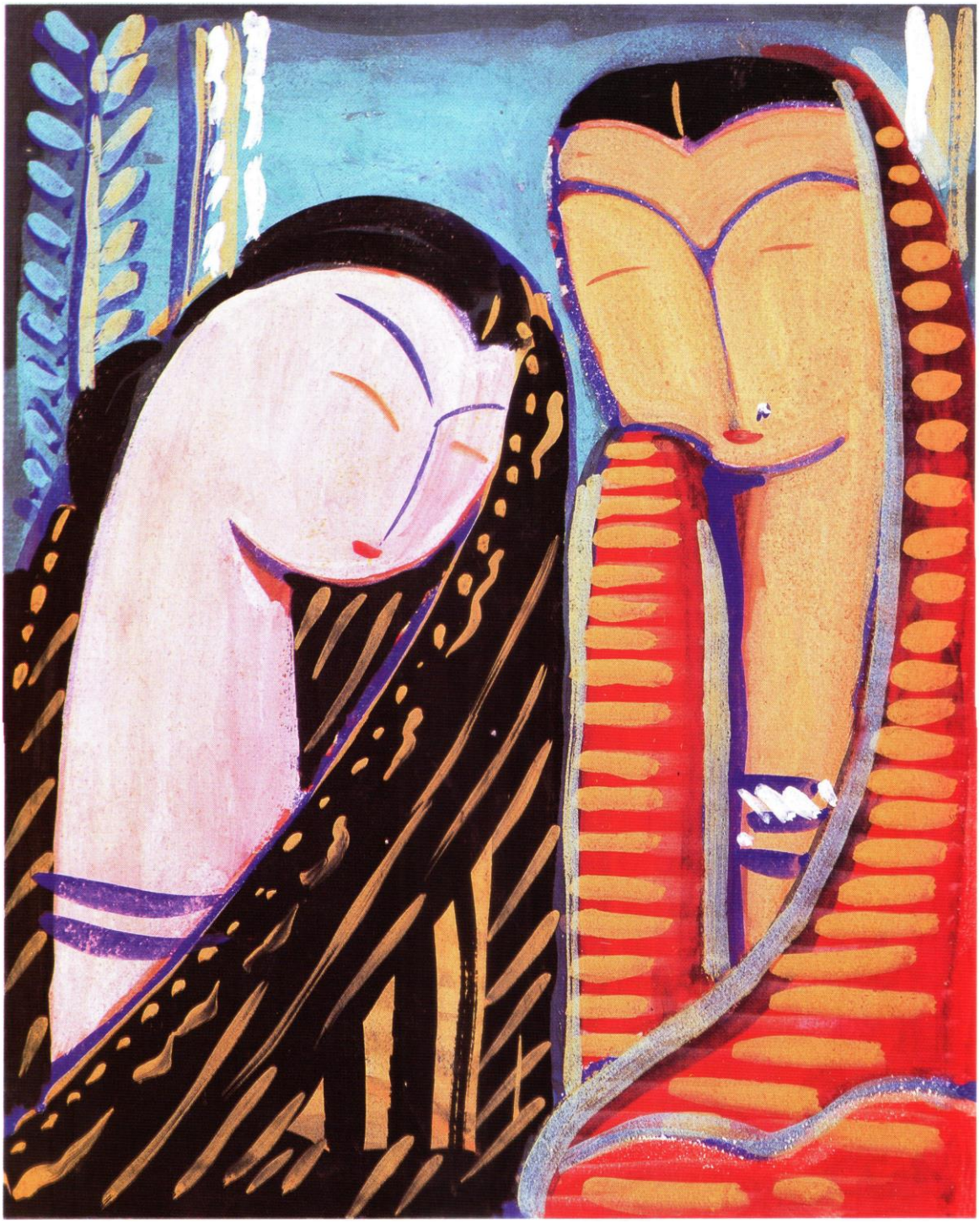

চিত্র-২১ : দুইবোন, কাগজে গোয়াশ, ২৯×২৩ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-২২ : নারীমুখ, বোর্ডে গোয়াশ, ৭০×৫৪ সেমি, ১৯৫০-এর দশক, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-২৩ : পাইন্যার মা, কাগজে গোয়াশ, ৩২×২৩ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

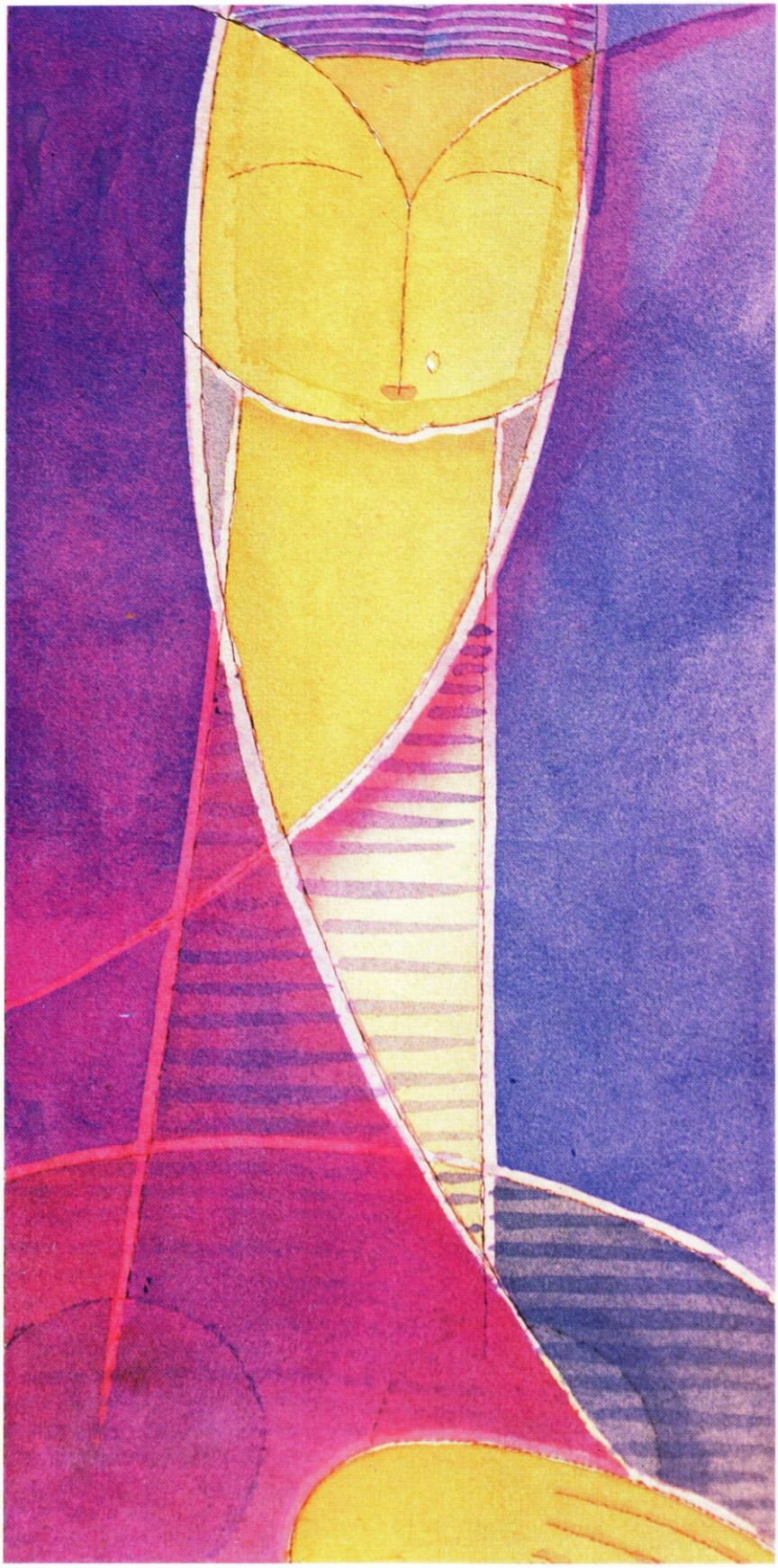

চিত্র-২৪ : বাঙালি রমণী, কাগজে রঙিন কালি, ৩৫×২৬.৫ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-২৫ : কৃষক, কাগজে জলরং, ৩০.৫×১৮ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

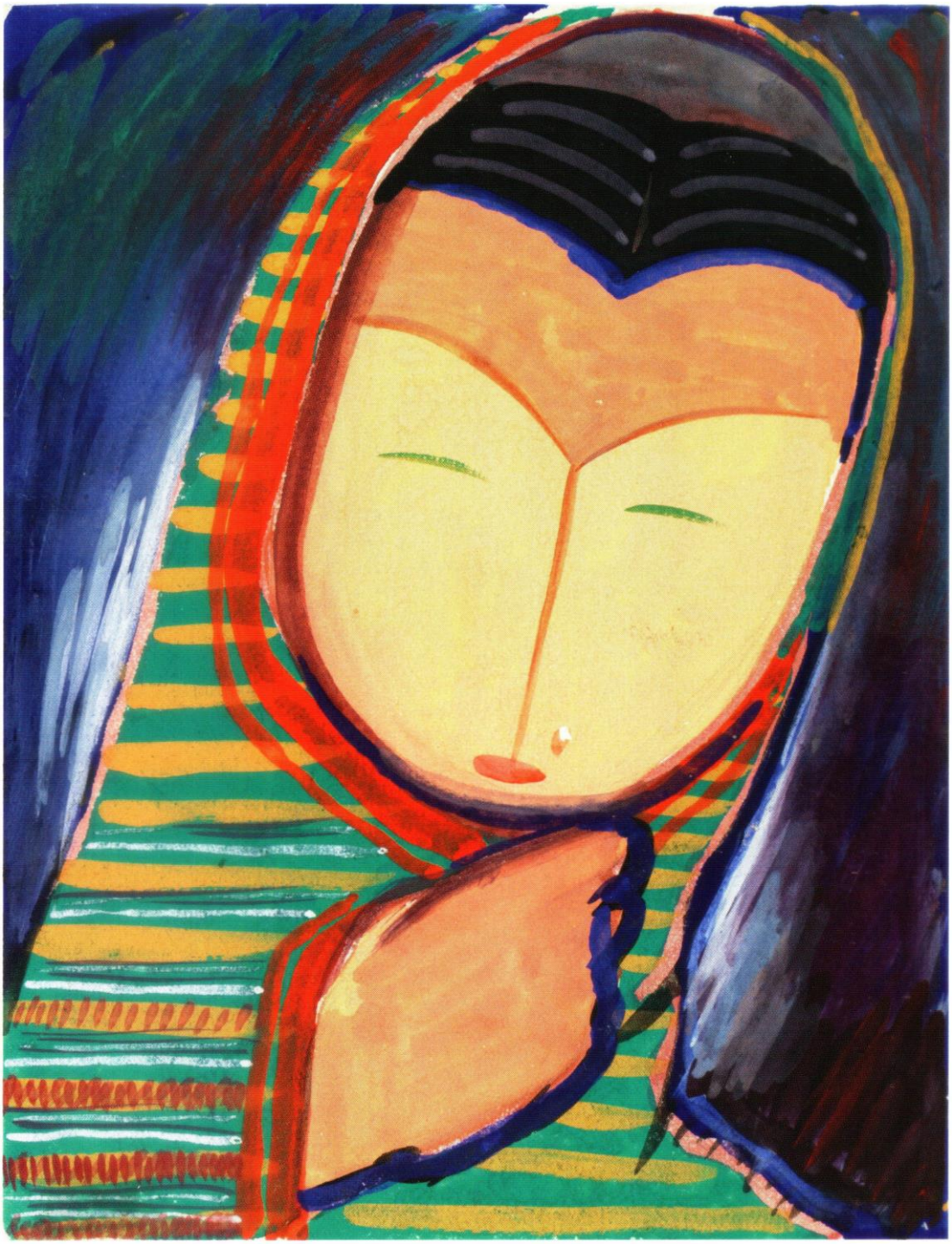

চিত্র-২৬ : মহিলার মুখ, কাগজে গোয়াশ, ২৬.৫×২০ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

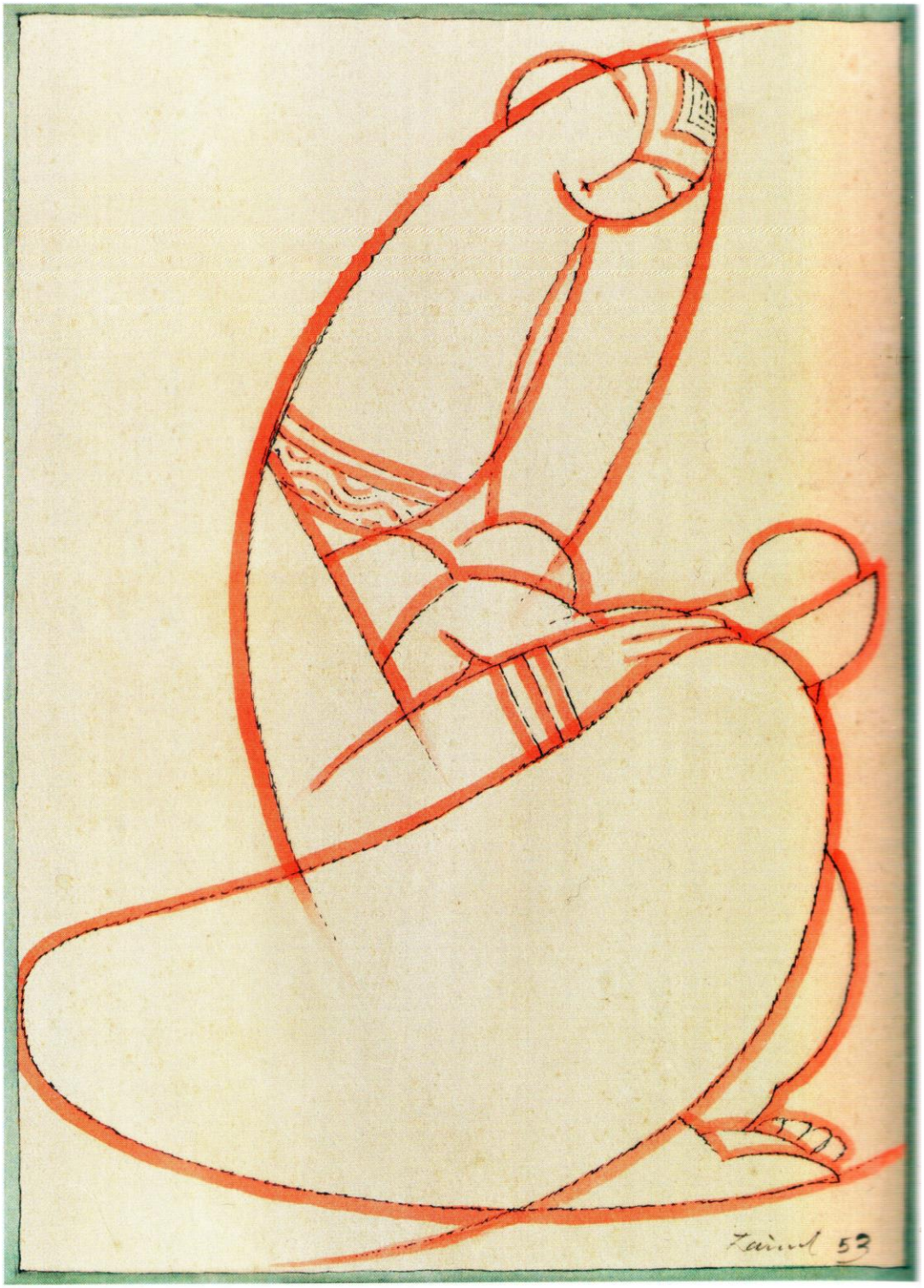

চিত্র-২৭ : মা ও শিশু, কাগজে রঙিন কালি, ৩৩×১৯ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-২৮ : চিন্তা, কাগজে টেম্পেরা, ৩৭.৫×২৭ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-২৯ : মা ও শিশু, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৩০ : মা ও শিশু, কাগজে টেম্পেরা, ৫৩×৩৪.৫ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

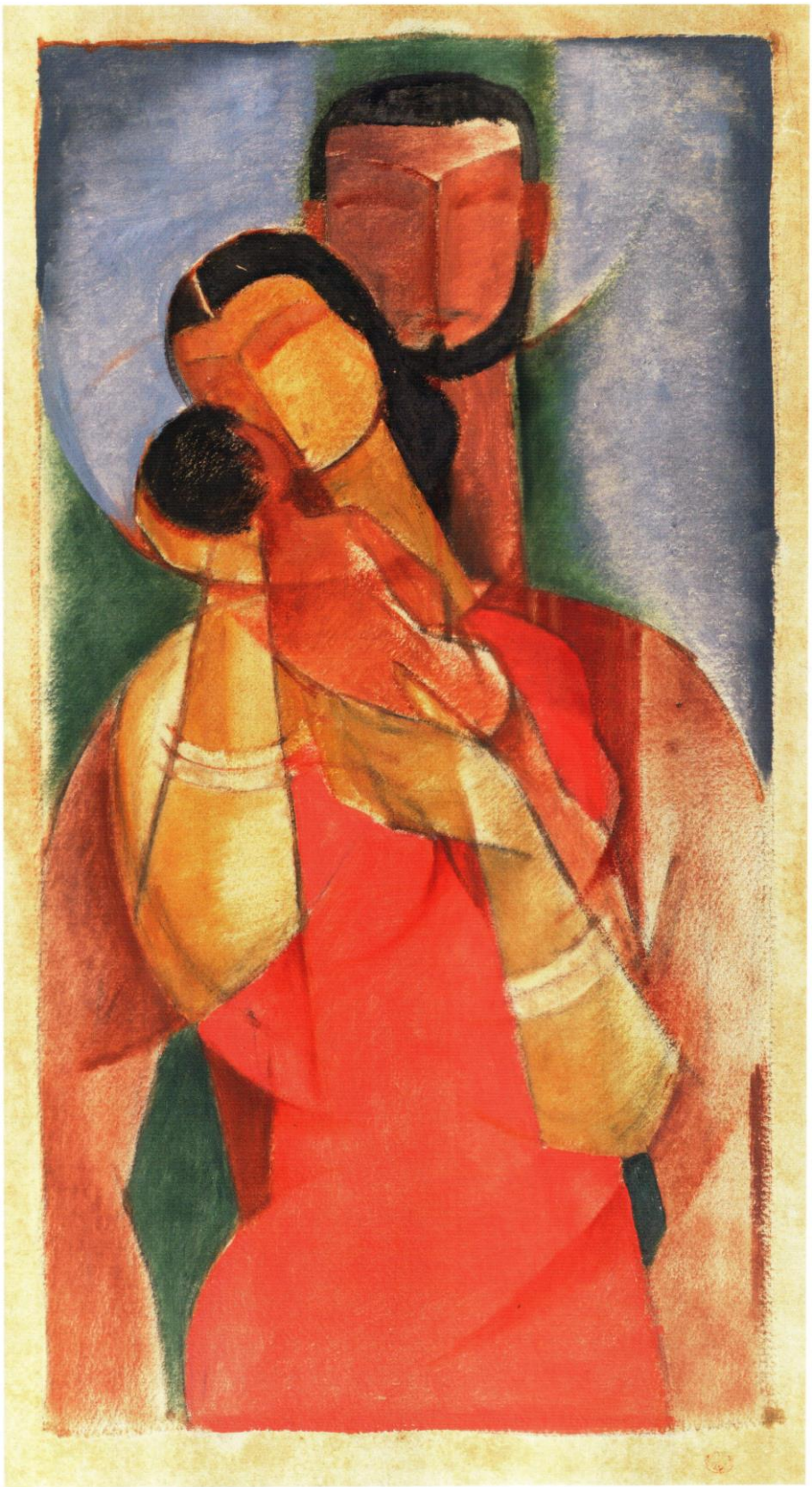

চিত্র-৩১ : পরিবার, কাগজে জলরং, ৭০×৩৮ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

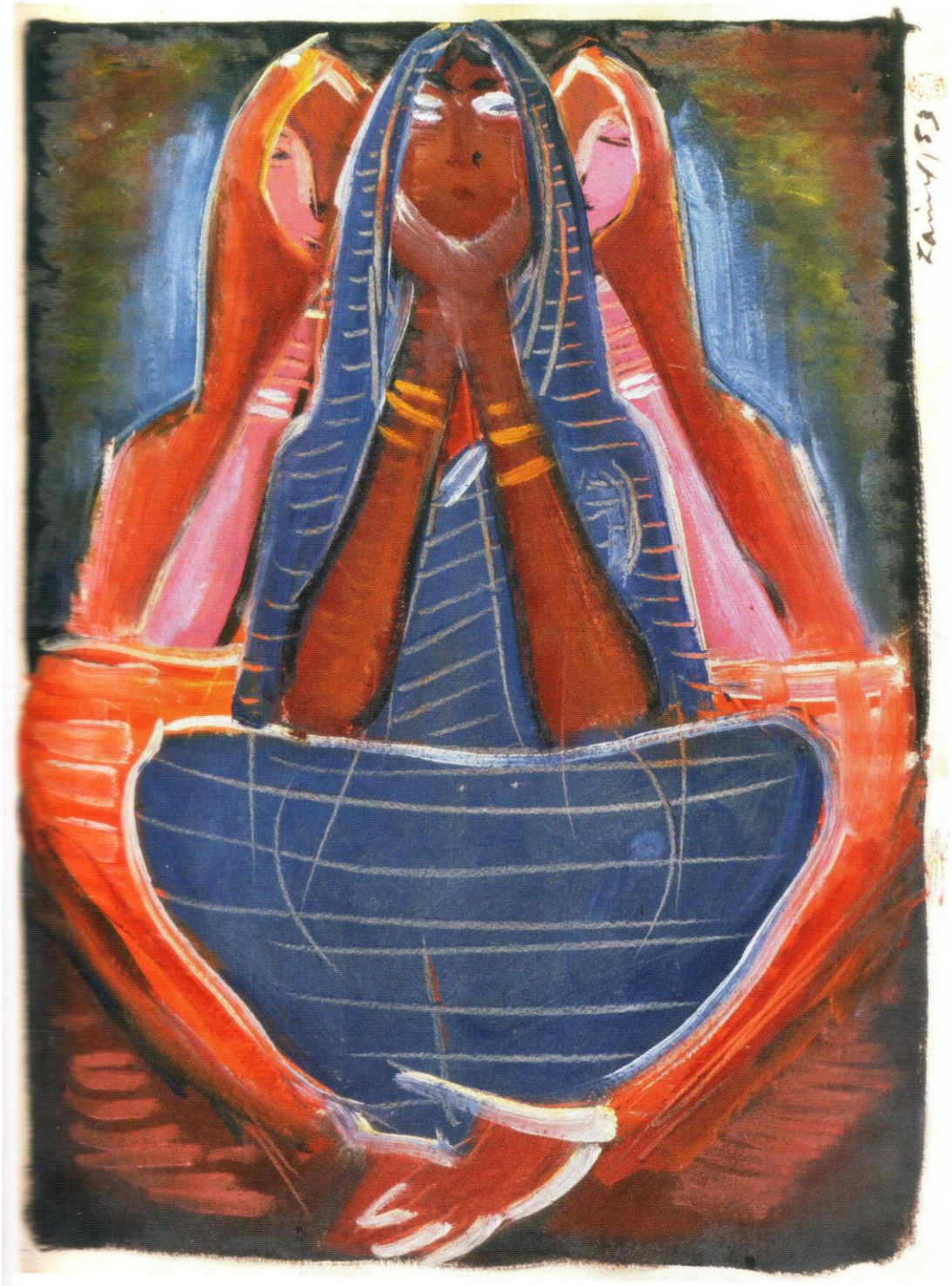

চিত্র-৩২ : বিশ্রামরত তিন রমণী, কাগজে টেম্পেরা, ৩৮×২৮ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

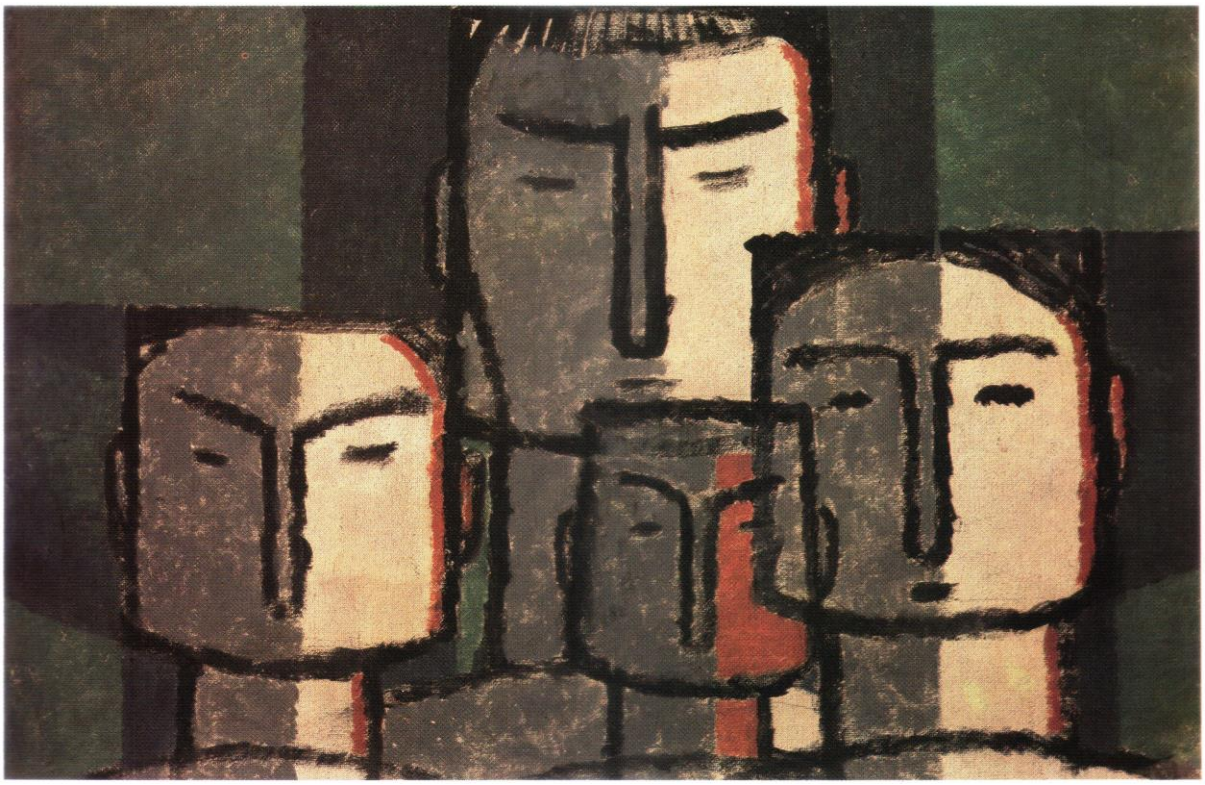

চিত্র-৩৩ : চার মুখ, ক্যানভাসে তেলরং, ৪৩×৬৮ সেমি, ১৯৫৭, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৩৪ : মা ও শিশু, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৩৫ : আয়নাসহ বধূ, তেলরং, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

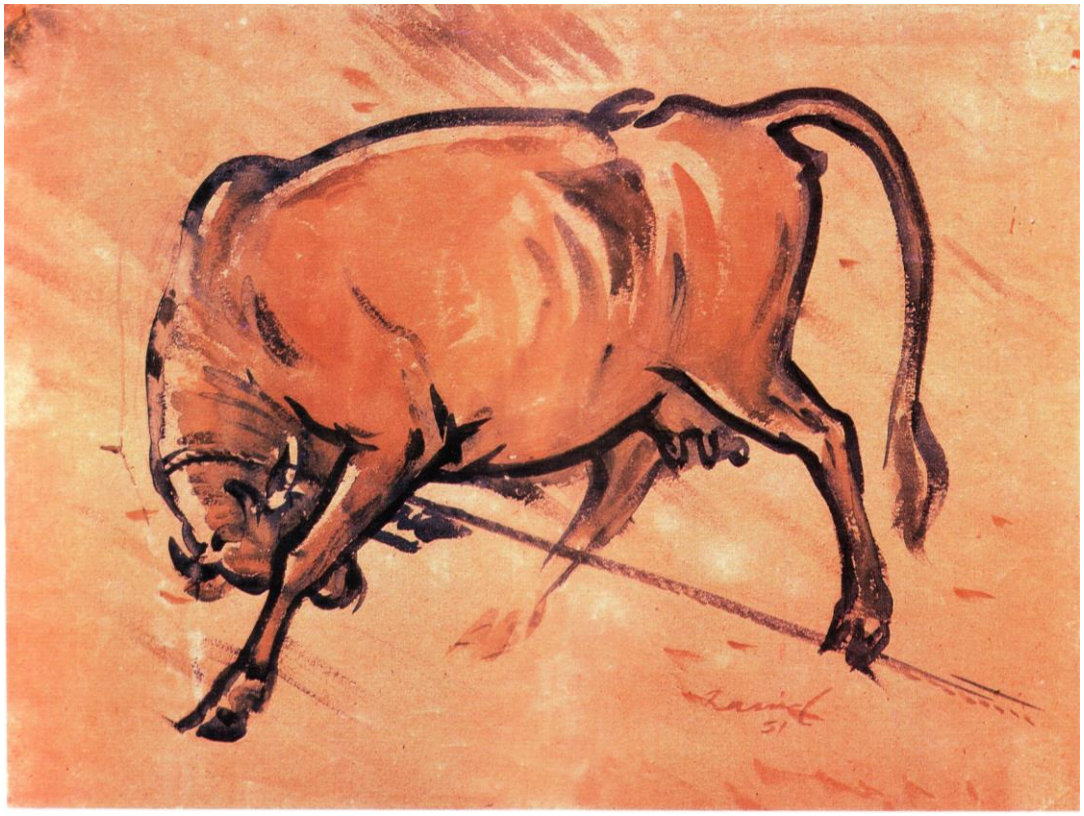

চিত্র-৩৬ : বিদ্রোহী গরু, কাগজে জলরং, ৫৮.৫×৭৬ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৩৭ : মই দেওয়া, কাগজে জলরং, ৫৮×৭৫ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৩৮ : কালবৈশাখী, কাগজে জলরং, ৫৭×৭৫ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

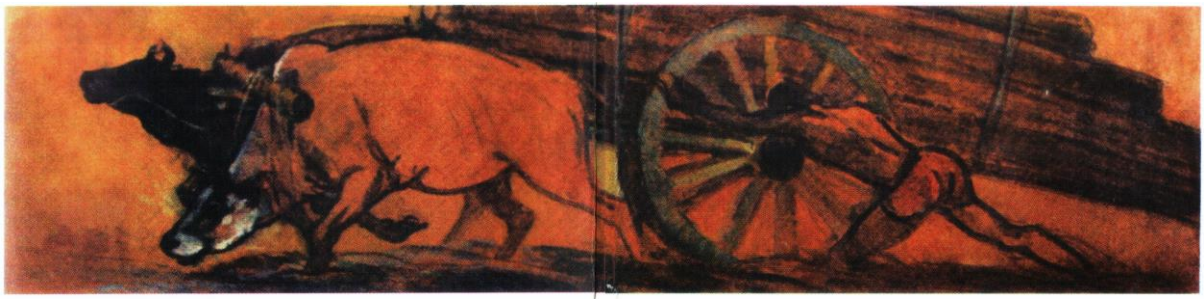

চিত্র-৩৯ : সংগ্রাম, টেম্পেরা, ৬০×২৪৩ সেমি, ১৯৫৪, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪০ : Yellow flowers, তেলরং, জুবেইদা আগা

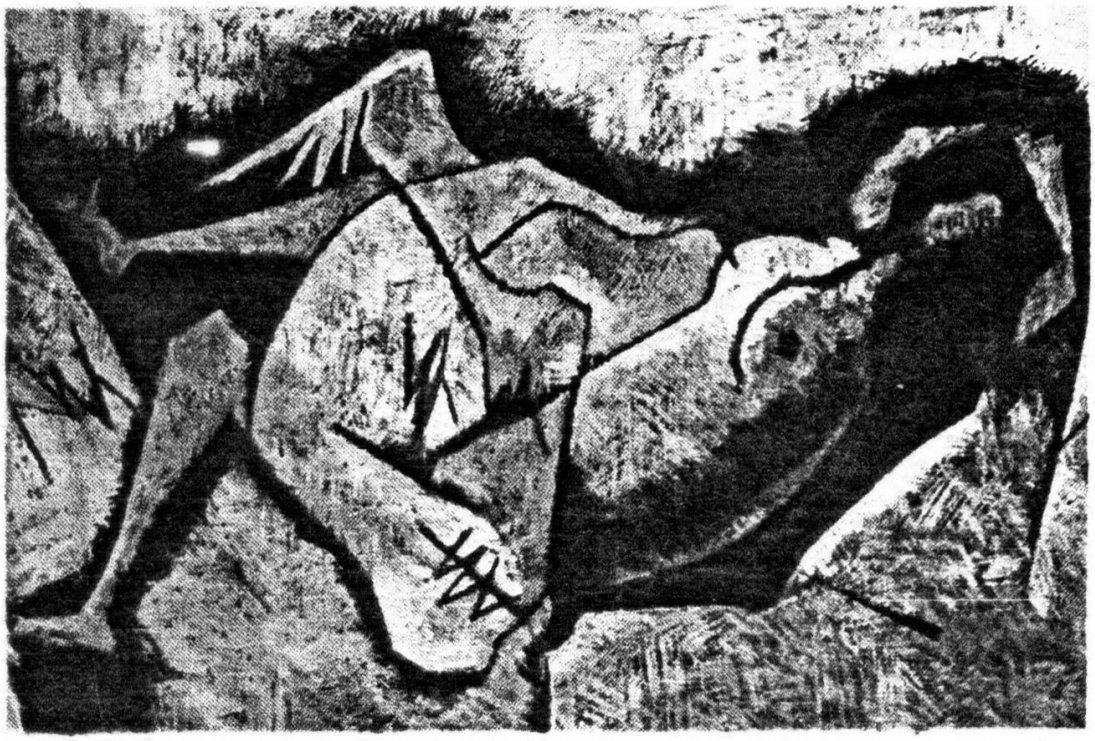

চিত্র-৪১ : Leda and the Swan, Shakir Ai

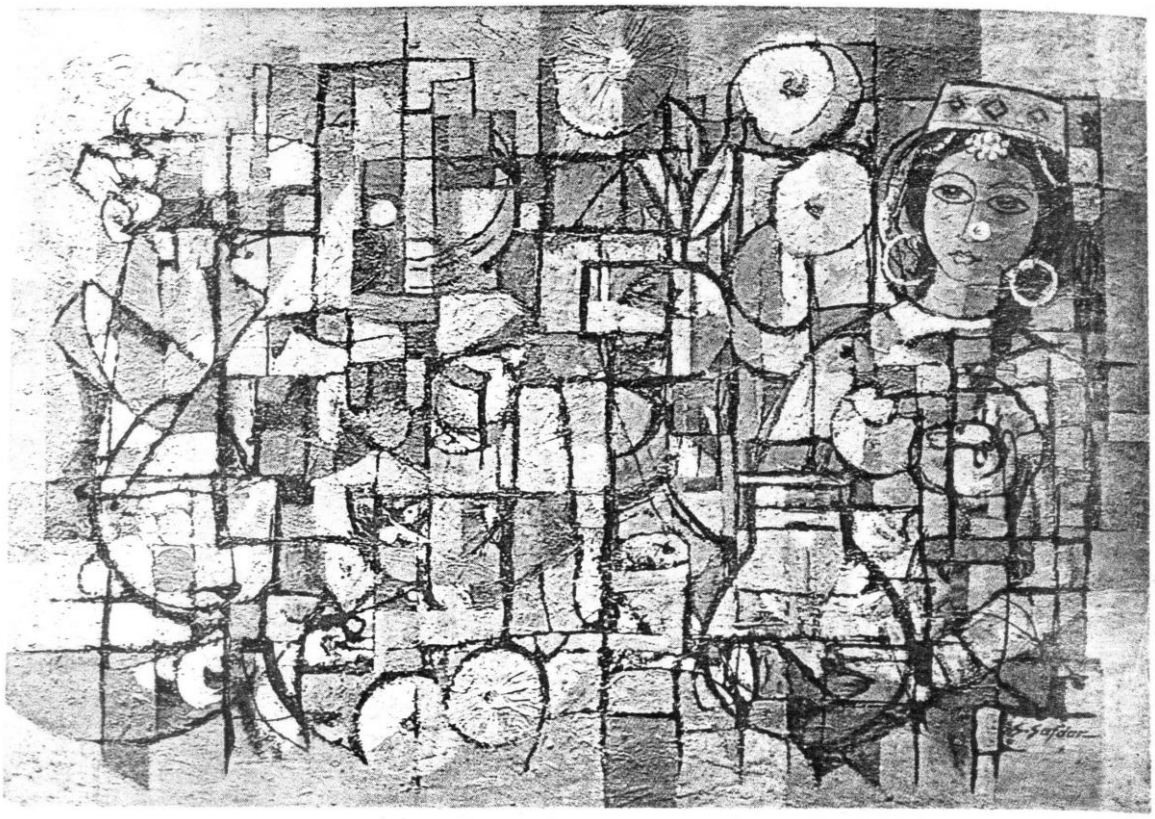

চিত্র-৪২ : Untitled, Sheikh Sufdar

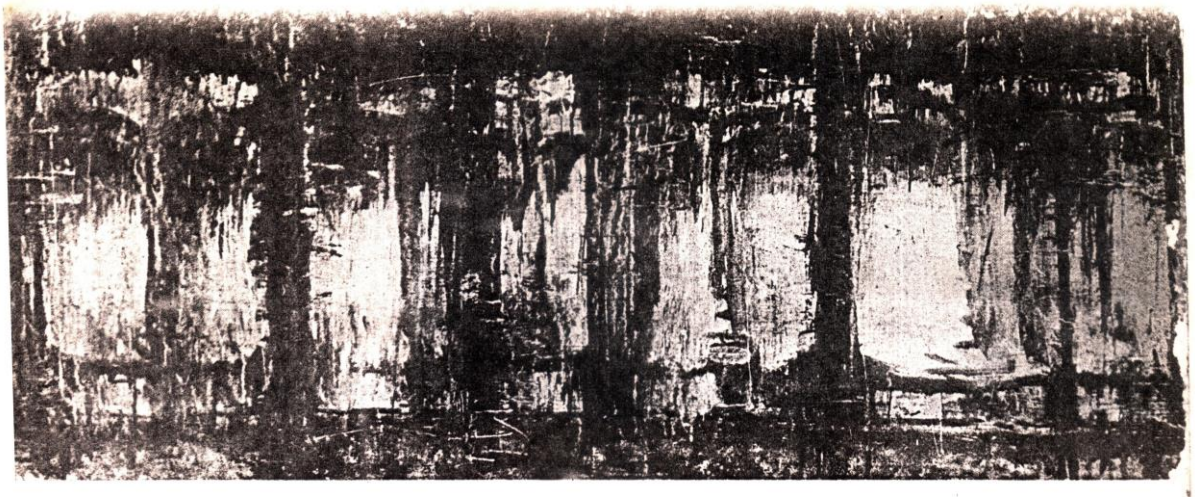

চিত্র-৪৩ : Faces, তেলরং, ষাটের দশক, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪৪ : মাছ ধরা, ৬.৫×৩০ সেমি, কাগজে তেলরং, ১৯৬০-এর দশক, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪৫ : আত্মপ্রতিকৃতি, কাগজে কালি ও তুলি, ২১×১৬.৫ সেমি, ষাটের দশক, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪৬ : প্রসাধন, ক্যানভাসে তেলরং, ৭৬×১০২ সেমি, ১৯৬৭, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪৭ : প্রসাধন, কাগজে কালি ও তুলি, ২১×১৬.৫ সেমি, ষাটের দশক, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪৮ : কলসি কাঁখে রমণীরা, কাগজে মিশ্র মাধ্যম, ১৫.৫×২০.৫ সেমি, ১৯৬৫, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৪৯ : নবান্ন (নবান্ন ছবির অংশ), কাগজে জলরং ও মোম, মূল ছবির মাপ ১০৫×১৯৫০ সেমি, ১৯৭০, জয়নুল আবেদিন

চিত্র-৫০ : মাছ ধরা, তেলরং, ৯১×৬১ সেমি, ১৯৫০, কামরুল হাসান

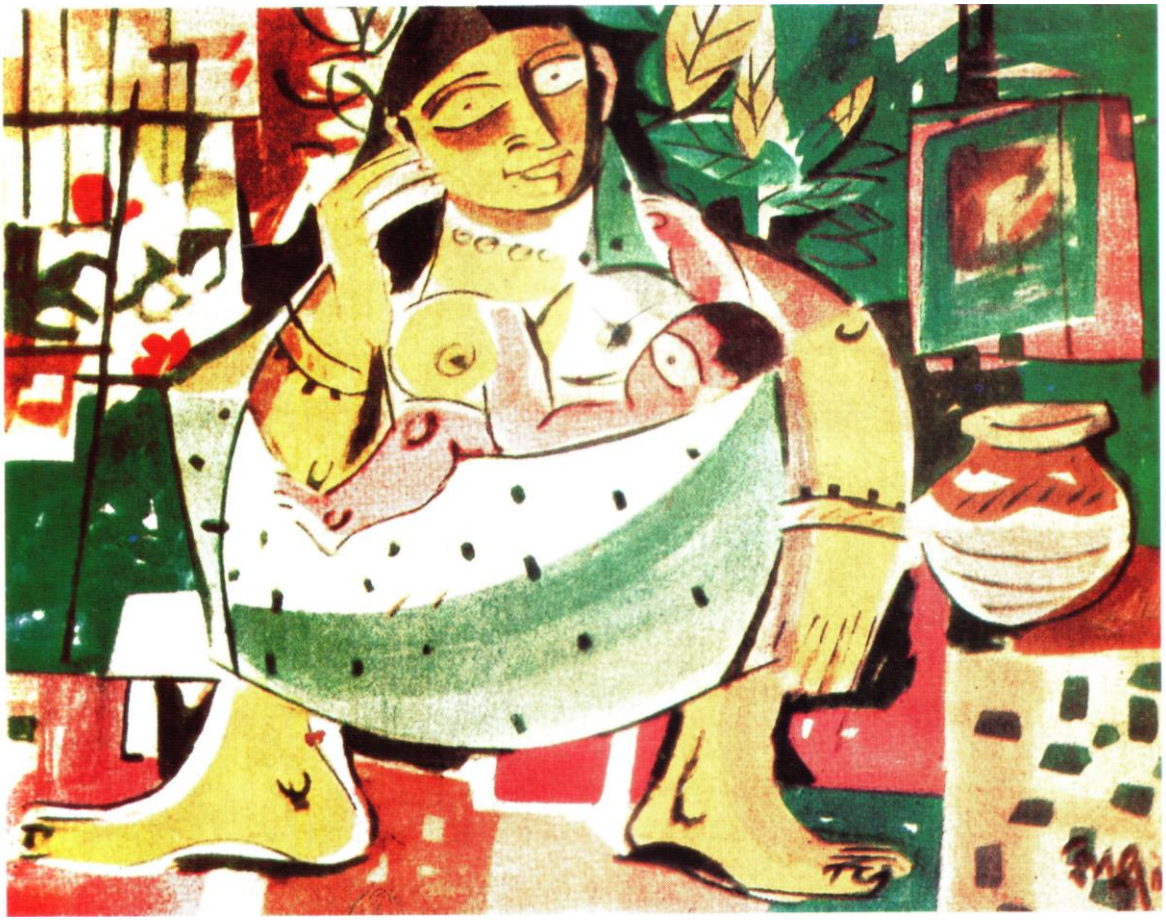

চিত্র-৫১ : মা ও শিশু, জলরং, ৬০×৪৬ সেমি, পঞ্চাশের দশক, কামরুল হাসান

চিত্র-৫২ : মোরগ-১, জলরং, ৭৫×৩৭ সেমি, পঞ্চাশের দশক, কামরুল হাসান

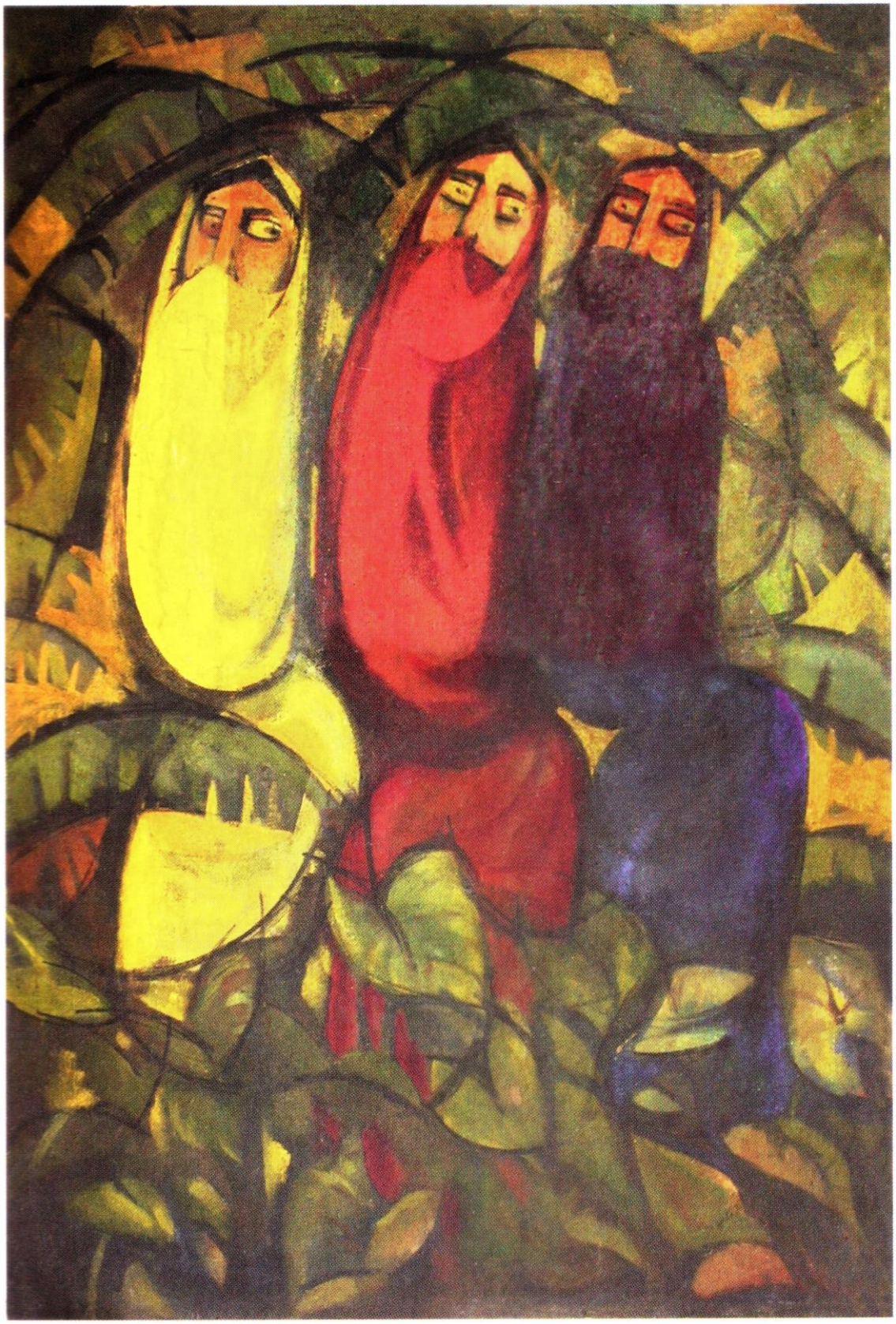

চিত্র-৫৩ : তিন কন্যা-১, মেসোনাইটে তেলরং, ৭০×৯১ সেমি, ১৯৫৫, কামরুল হাসান

চিত্র-৫৪ : একাকিত্ব, জলরং, ১৯৬২, কামরুল হাসান

চিত্র-৫৫ : জলকেলি, পেনসিল, ১৯৬২, কামরুল হাসান

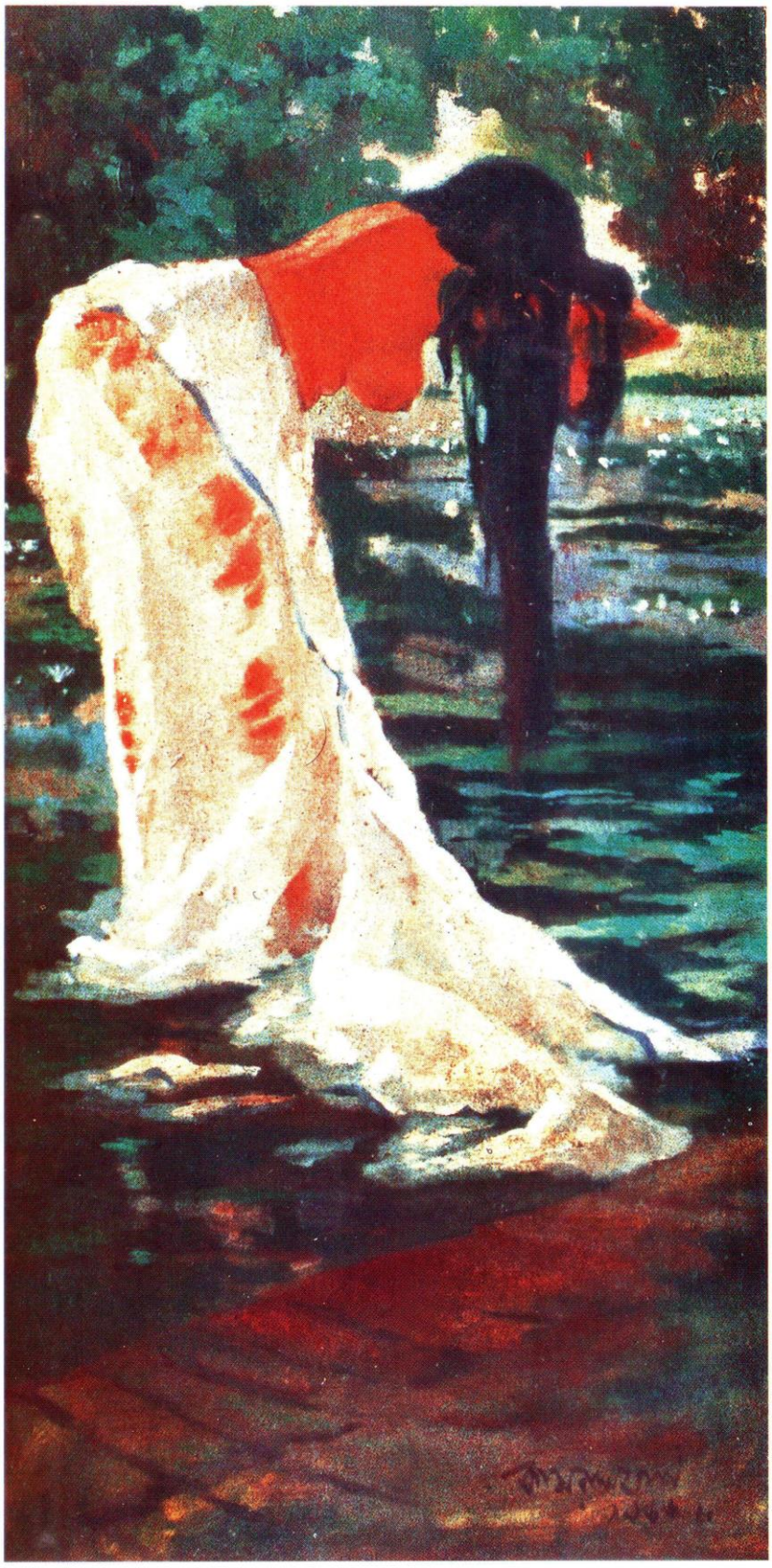

চিত্র-৫৬ : স্নান, তেলরং, ১৫০×৭৫ সেমি, ১৯৫৬, কামরুল হাসান

চিত্র-৫৭ : জেলে, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

চিত্র-৫৮ : তিন রমণী, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

চিত্র-৫৯ : গরুর স্নান, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

চিত্র-৬০ : বাউল, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

চিত্র-৬১ : কন্যার মালা গাঁথা, জলরং, ৬০×৫০ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

চিত্র-৬২ : বাউল, পোস্টার রং, ৭৫×৫১ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

চিত্র-৬৩ : জলকেলি-১, জলরং, ৭৫×৫৬ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

চিত্র-৬৪ : সুসজ্জিতা, পোস্টার রং, ৭৫×৫০ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

চিত্র-৬৫ : বংশীবাদক, পোস্টার রং, ৭৫×৫২ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

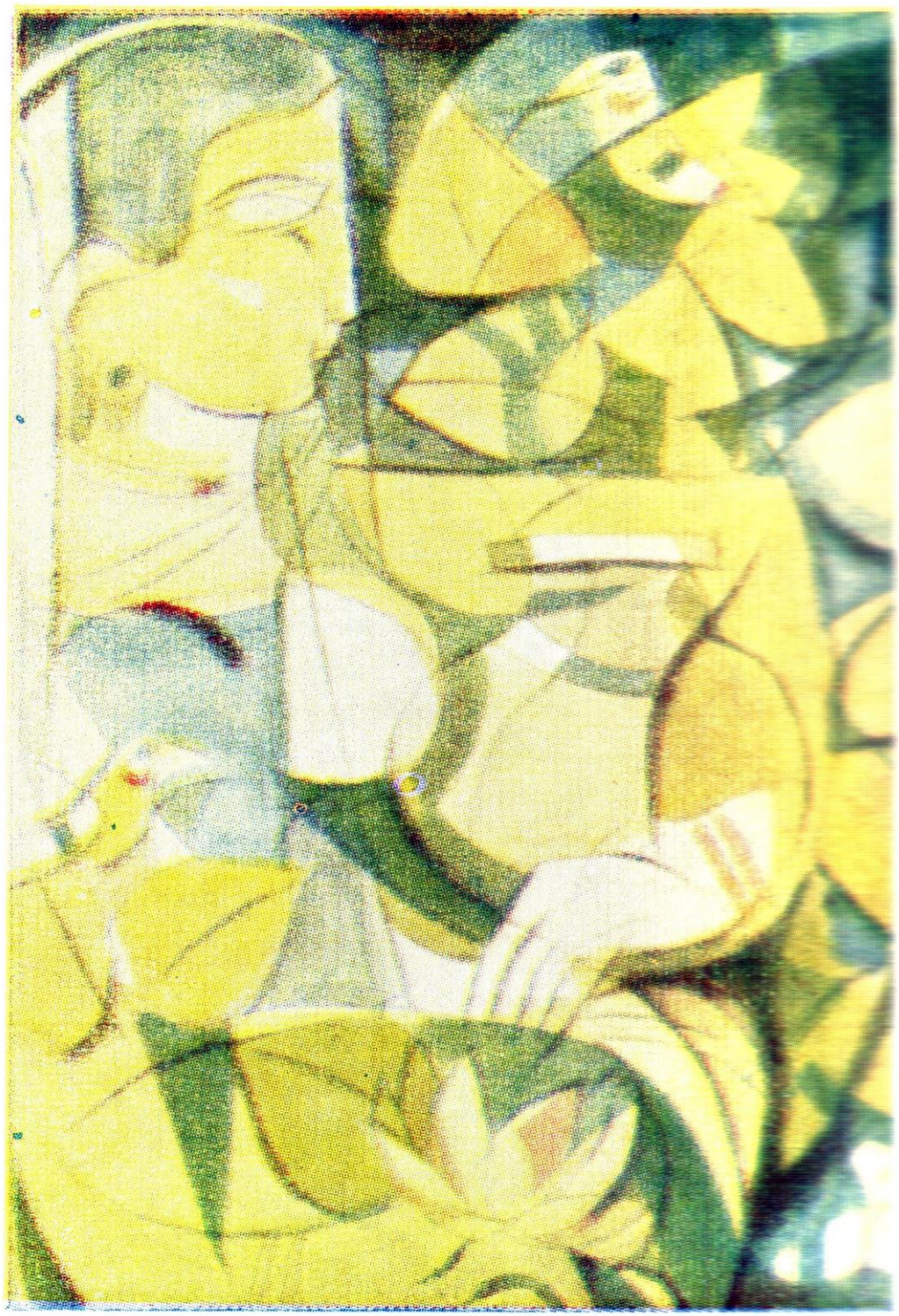

চিত্র-৬৬ : Birds, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

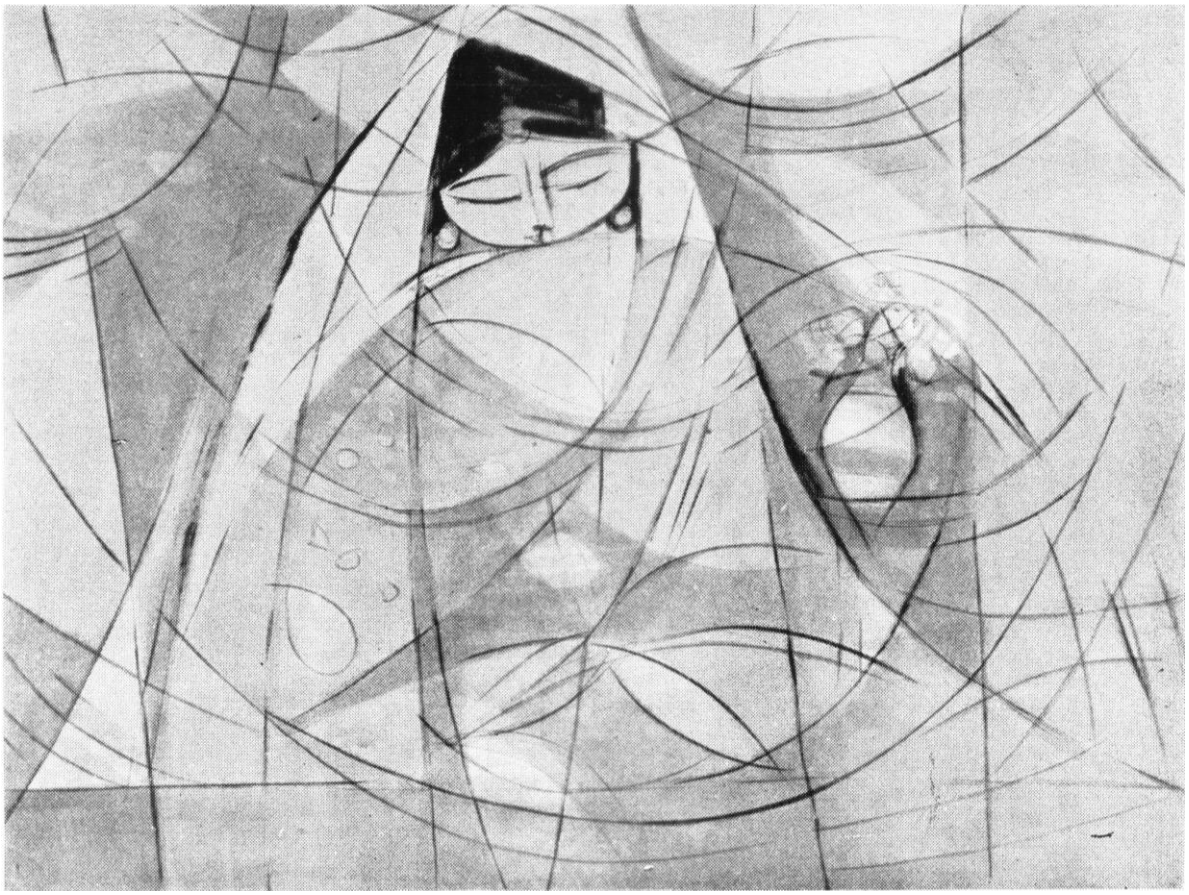

চিত্র-৬৭ : The Bride, জলরং, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

চিত্র-৬৮ : Village maid, টেম্পেরা, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

চিত্র-৬৯ : গল্পগুজব, তেলরং, ৯০×৬৪ সেমি, পঞ্চাশের দশক, কামরুল হাসান

চিত্র-৭০ : Vision, জলরং, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

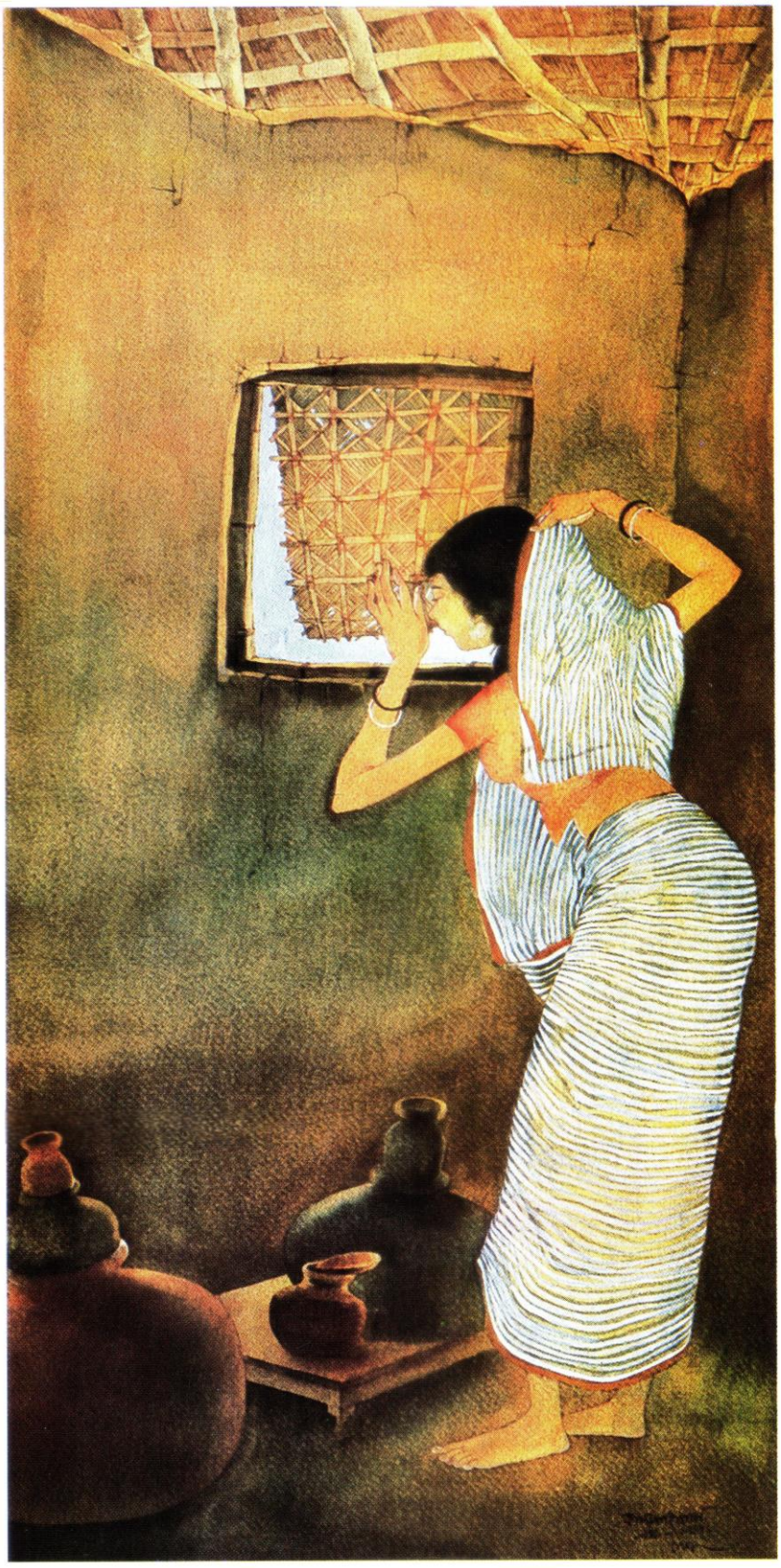

চিত্র-৭১ : উঁকি, গোয়াশ, ৭৫×৩৭ সেমি, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

চিত্র-৭২ : বাংলা একাডেমির বটবৃক্ষে অক্ষর বৃক্ষের প্রথম উদ্বোধন, ১৯৬৯, কামরুল হাসান

চিত্র-৭৩ : মাছ ধরা, জলরং, ১৬×২৭ সেমি, ১৯৩৮, সফিউদ্দীন আহমেদ

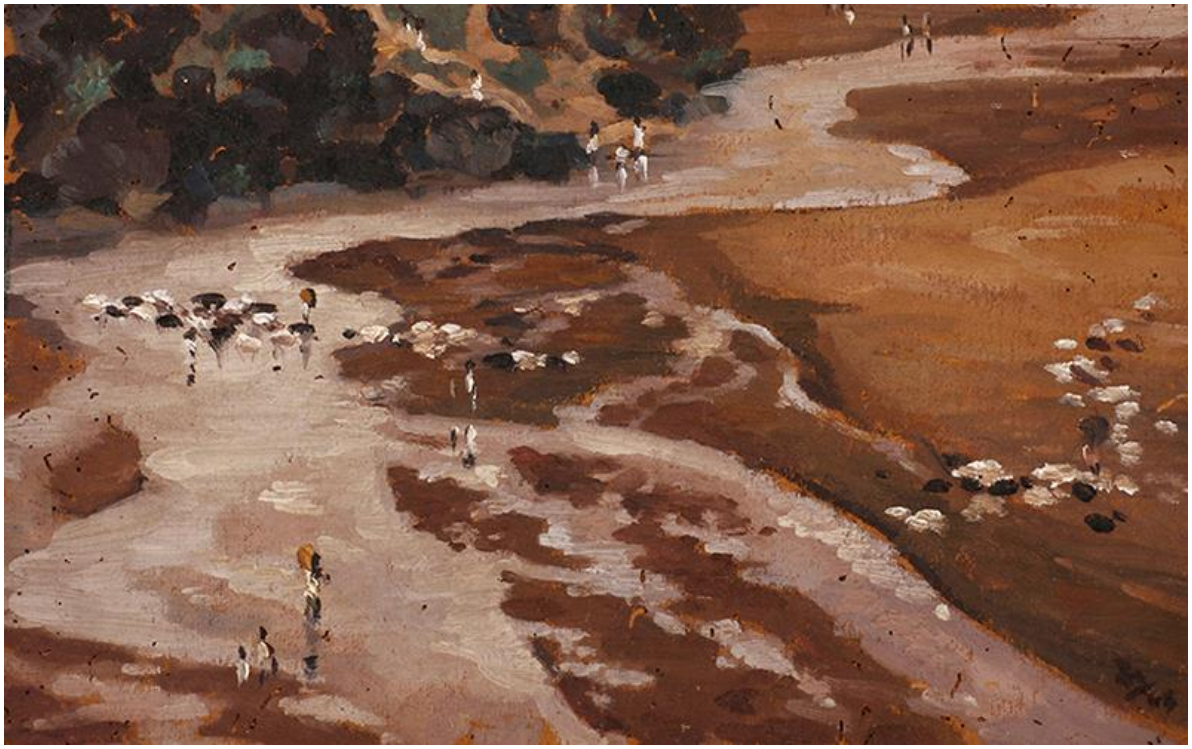

চিত্র-৭৪ : ময়ূরাক্ষী, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৭ সেমি, ১৯৪৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৭৫ : সূর্যালোকে কুটির, বোর্ডে তেলরং, ২০×২৯ সেমি, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৭৬ : দুমকার কর্মচঞ্চল জীবন, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৪৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৭৭ : দুমকার পথ-২, বোর্ডে তেলরং, ২১×২৯ সেমি, ১৯৪৫, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৭৮ : দুমকার পথ-৩, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৪৫, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৭৯ : গোপীবাগ, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮০ : বুড়িগঙ্গা-১, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

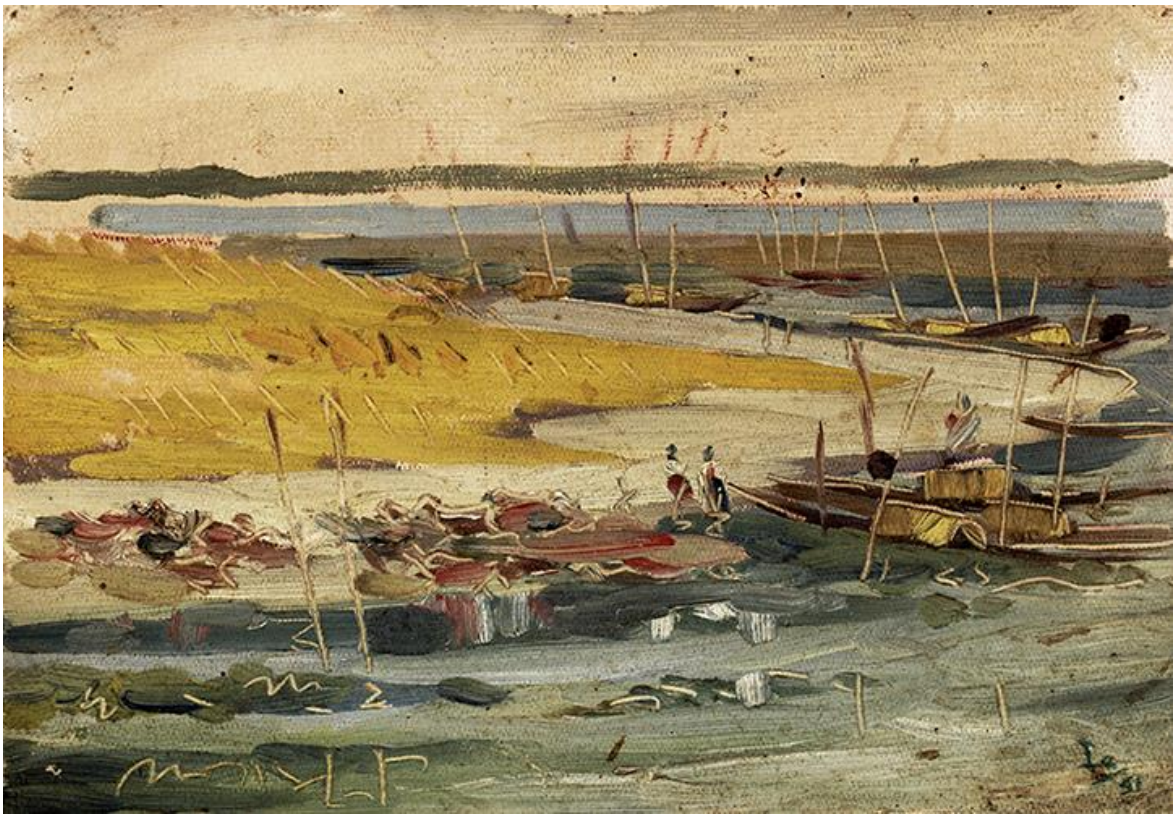

চিত্র-৮১ : বুড়িগঙ্গা-২, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮২ : মুন্সিগঞ্জ, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮৩ : ধানের হাট, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫২, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮৪ : বুড়িগঙ্গা-৩, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫২, সফিউদ্দীন আহমেদ

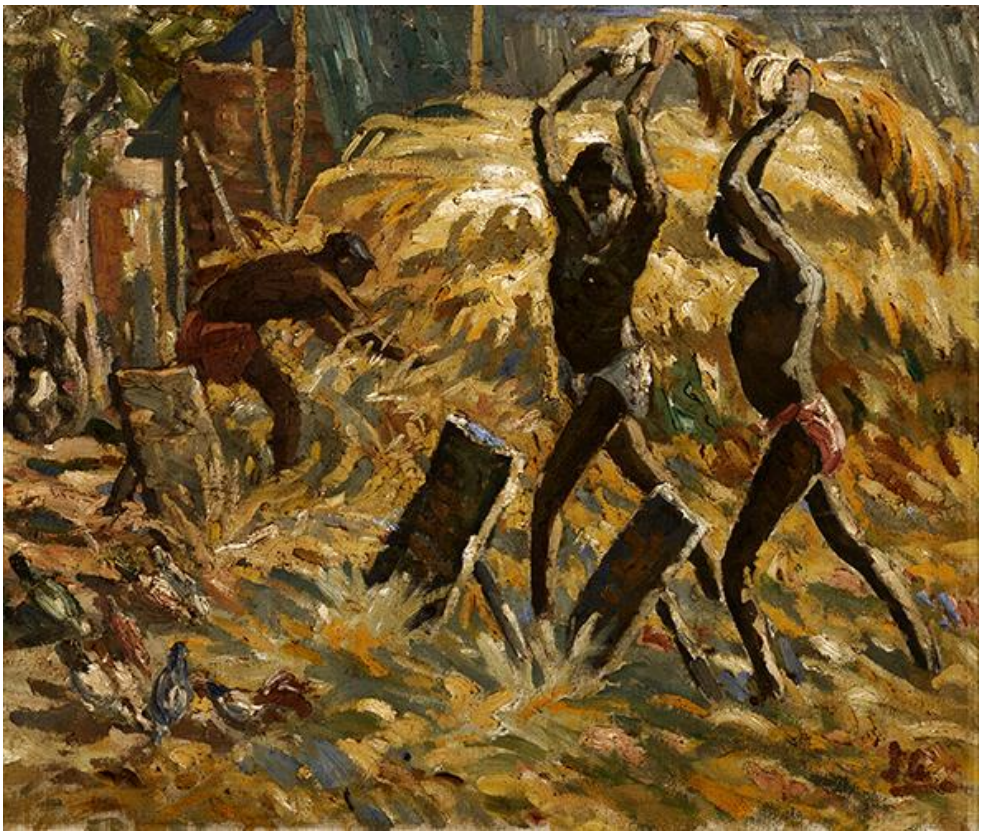

চিত্র-৮৫ : ধান মাড়ানো, ক্যানভাসে তেলরং, ৪৫×৫৬ সেমি, ১৯৫২, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮৬ : শরবতের দোকান-১, ক্যানভাসে তেলরং, ৬২×৯২ সেমি, ১৯৫৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮৭ : মুরগির খাঁচা, ক্যানভাসে তেলরং, ৬০×৯০ সেমি, ১৯৫৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮৮ : মাছ ধরা-১, বোর্ডে তেলরং, ৫৪×১২২ সেমি, ১৯৫৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৮৯ : কাঠমিস্ত্রি, বোর্ডে তেলরং, ৬৪×১২২ সেমি, ১৯৫৬, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯০ : গুণটানা-১, তুলি ও কালি, ২৬×৩৪ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯১ : মাছ ধরা, তুলি ও কালি, ১৯×২৩ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯২ : দম্পতি, তুলি ও কালি, ৫১×৩২ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯৩ : বেহালাবাদকসহ ছাদ পেটানো-১, তুলি ও কালি, ২৭×১৫ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯৪ : গুণটানা-৩, তুলি ও কালি, ৩৪×২২ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯৫ : জেলের স্বপ্ন (Fisherman's dream), কপার এনগ্রেভিং, ৩১×৪১ সেমি, ১৯৫৭, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯৬ : হলুদ জাল (Yellow Net), কপার এনগ্রেভিং ও সফট গ্রাউন্ড, ২৬×৩৯ সেমি, ১৯৫৭, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৯৭ : ঝড়ের পূর্বে (Before the Storm), এচিং এবং অ্যাকুয়াটিন্ট, ৩৮×২৪ সেমি, ১৯৫৮, সফিউদ্দীন আহমেদ

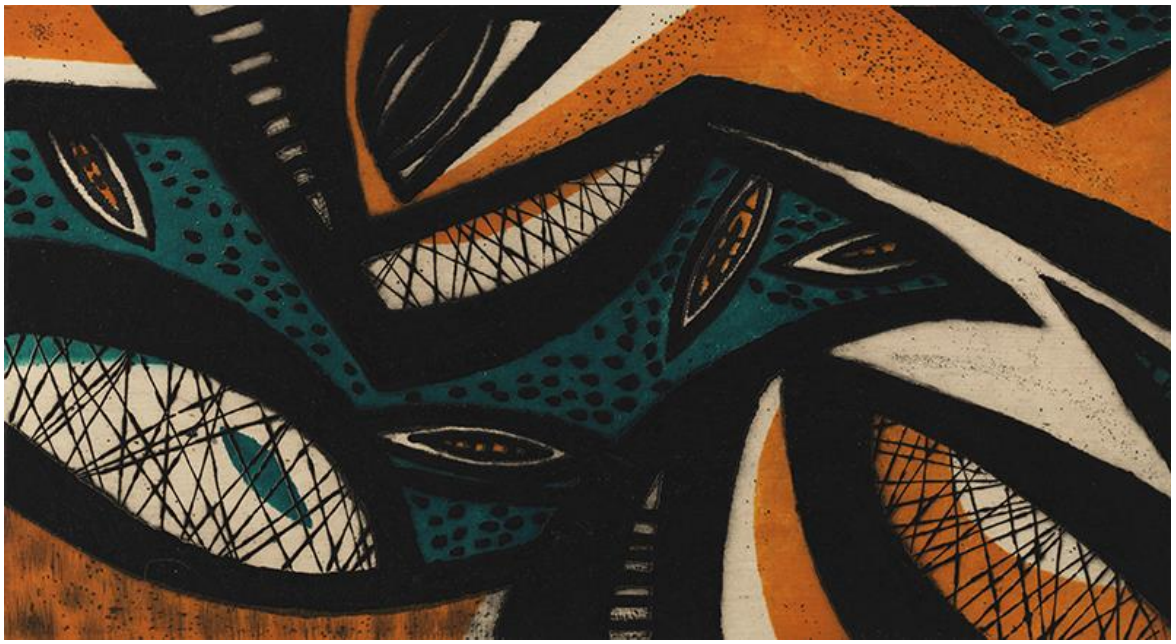

চিত্র-৯৮ : মাছ ধরা সময়-১, এচিং এবং অ্যাকুয়াটিন্ট, ২৬×৪৭ সেমি, ১৯৬২, সফিউদ্দীন আহমেদ

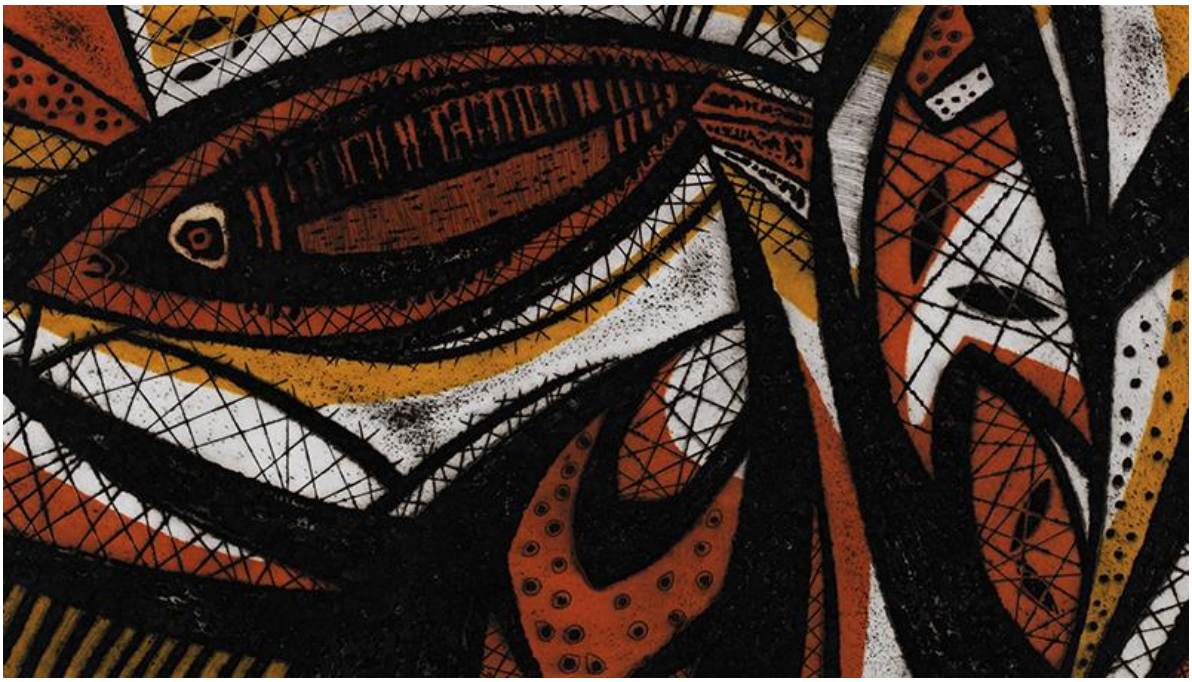

চিত্র-৯৯ : বিক্ষুব্ধ মাছ (The Angry Fish), এচিং এবং অ্যাকুয়াটিন্ট, ২৬×৪৬ সেমি, ১৯৬৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১০০ : জাল ও মাছ-২ (Net and Fish-2), এচিং এবং চারকোল, ২৫×৫০ সেমি, ১৯৬৬, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১০১ : Jeuxd' Eau, Copper plate engraving and soft ground etching with stencil colouring on hand made oatmeal Lauriet Paper, 62×48 cm, Stanly William Hayter

চিত্র-১০২ : বাদাম বিক্রেতা-১, চারকোল ও ক্রেয়ন, ২৪×৩৬ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১০৩ : ড্রইং-১, কন্টে ক্রেয়ন (Conte′ Crayon), ২৪×৩৬ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১০৪ : বেহালাবাদকসহ ছাট পেটানো-২, চারকোল ও ক্রেয়ন, ২৮×৩০ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১০৫ : শরবতের দোকান (Sherbet Stall), চারকোল ও ক্রেয়ন, ২৫×৩৩ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১০৬ : নৌকা এবং গাছ, চারকোল ও ক্রেয়ন, ৫১×৭৬ সেমি, ১৯৬৬, সফিউদ্দীন আহমেদ

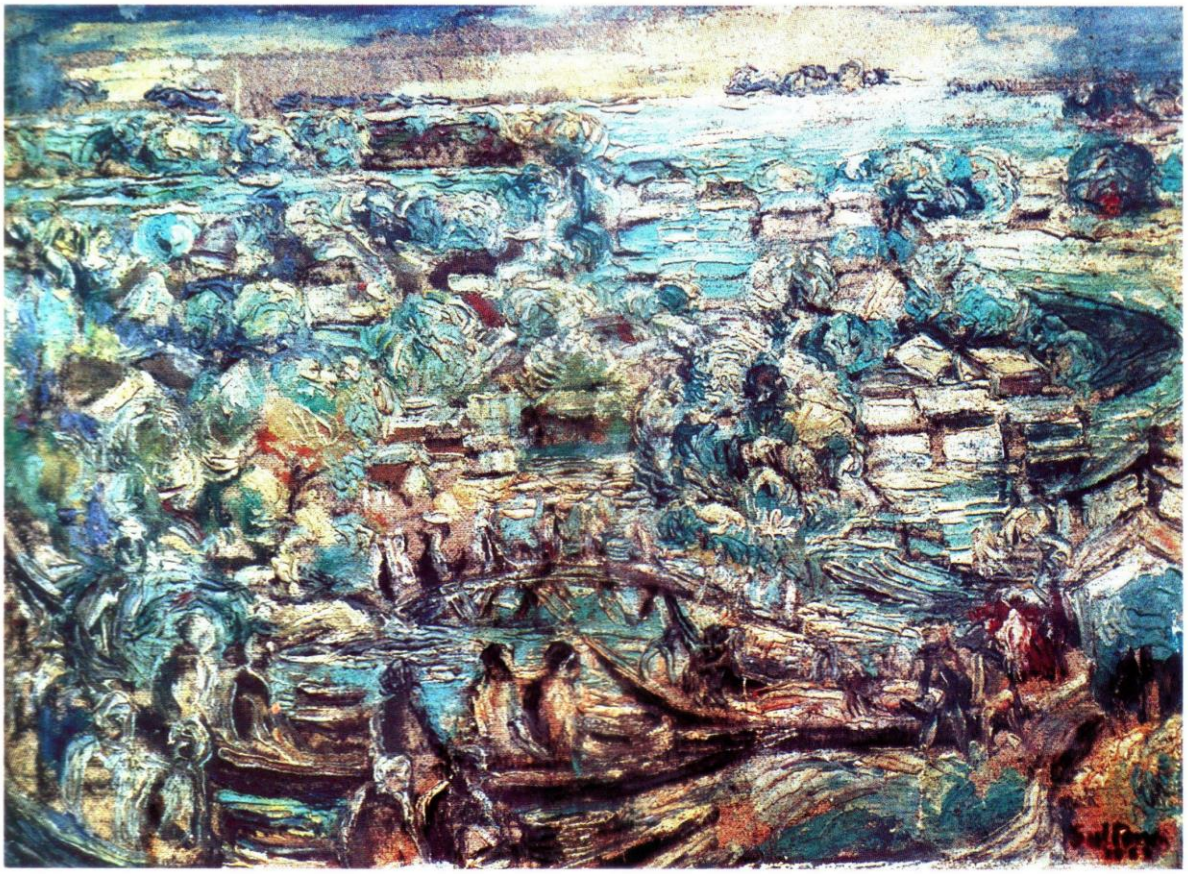

চিত্র-১০৭ : পারাপার, তেলরং, ৭৫×৫৫ সেমি, ১৯৫৩, এস. এম. সুলতান

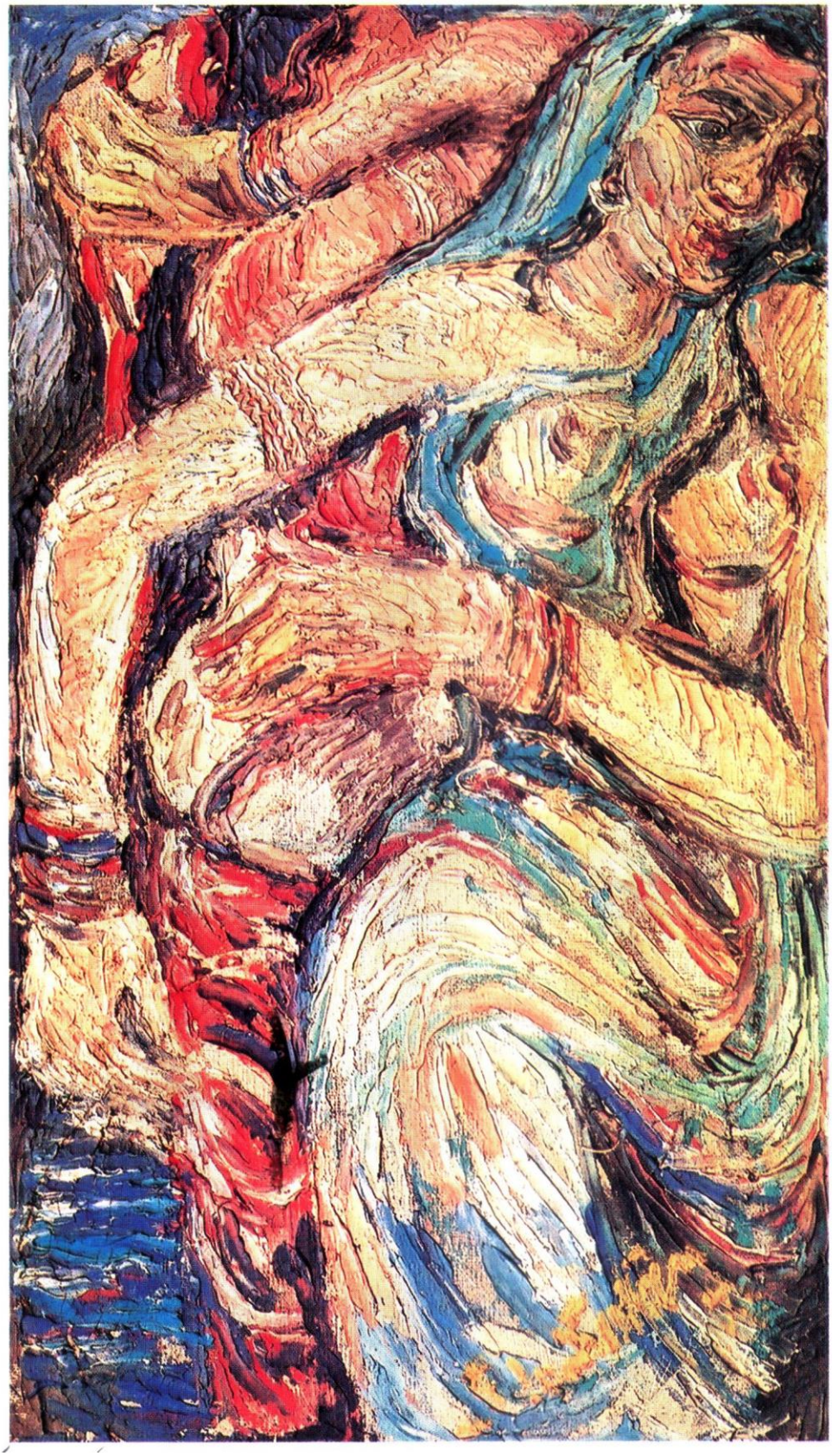

চিত্র-১০৮ : কলসি কাঁখে রমণী, তেলরং, ১২০×৬৮ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

চিত্র-১০৯ : মা ও শিশু, তেলরং, ১২০×৭৫ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

চিত্র-১১০ : নাইয়র, তেলরং, ১২০×৮০ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

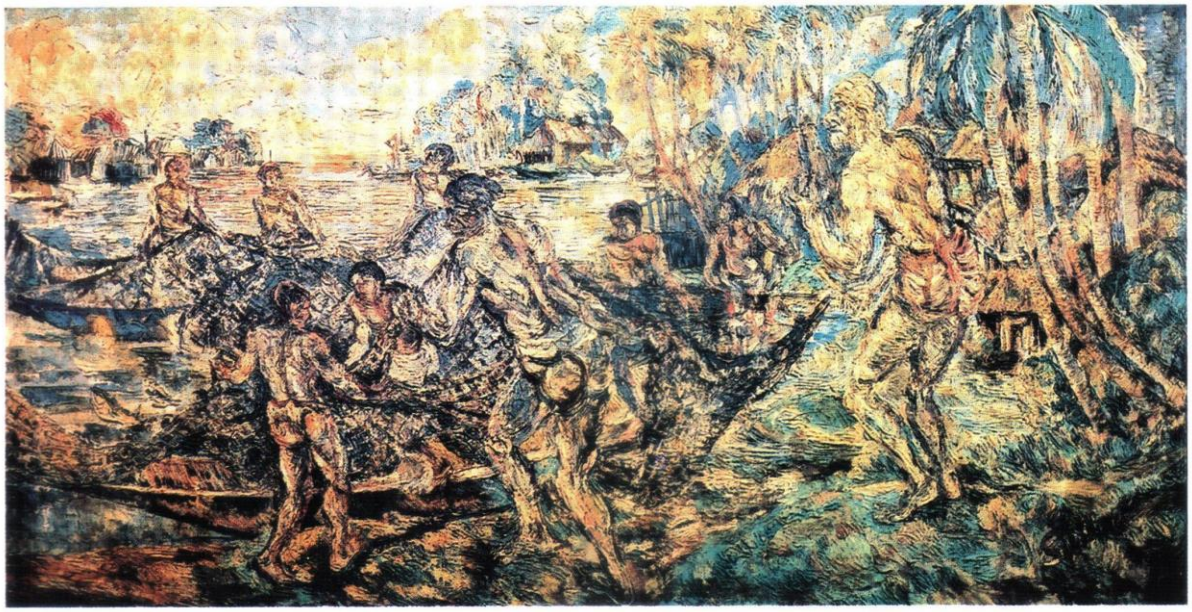

চিত্র-১১১ : মাছ ধরা-১, তেলরং, ২৪০×১২০ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রাহমান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, মুতর্জা বশীর, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত এবং দেবদাস চক্রবর্তীর চিত্রকর্ম

এই অধ্যায়ে '৫০-এর দশকে ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে যাঁরা চিত্রশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের চিত্রকর্ম আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১), হামিদুর রাহমান (১৯২৮-১৯৮৮), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-২০২০), আবদুর রাজ্জাক (১৯৩২-২০০৫), রশিদ চৌধুরী (১৯৩২-১৯৮৬), কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪), সৈয়দ জাহাঙ্গীর (১৯৩৫-২০১৮), কাজী আবদুল বাসেত (১৯৩৫-২০০২), দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩-২০০৮)। মোহাম্মদ কিবরিয়া (১৯২৯-২০১১) কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত করে ঢাকা চলে আসেন '৫০-এর দশকের শুরুতে। উল্লিখিত শিল্পীদের চিত্রকর্ম '৬০-এর দশক পর্যন্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এ শিল্পীদের কাজের মাধ্যমে আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চায় যে পরিবর্তন আসে, তাকে আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এ পর্বে। ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করার পর এই শিল্পীরা সৃজনশীলতা এবং নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্য দিয়ে যে বিমূর্ত চিত্রভাষা নির্মাণ করেন তাকেই দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরণ হিসেবে ধরা হয়েছে। এখানে বিমূর্ত রীতির চিত্র বা abstract art বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা হলো :

> Term that can in its broadest sense be applied to any art that does not represent recognizable bojects (much decorative art, for example), but which is most commonly applied to those forms of 20th-cent. art in which the traditional European conception of art as the imitation of nature is abandoned. Although modern abstract art has developed into many different movements and 'isms', three basic tendencies are recognizable within its; (i) the reduction of natural appearances to radically simplified forms... (ii) the construction of art objects form non-representational basic forms... (iii) spontaneous 'free' expression... (Chilvers et al. 1988 : 2).

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিমূর্ত শিল্প পুরোপুরি অপ্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে আবার কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে।

প্রথম পর্যায়ের জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ, এস. এম. সুলতান–এ চারজন শিল্পীর চিত্রভাষায় ব্যবহৃত বাঙালি সাংস্কৃতিক উপাদান (অর্থাৎ আবহমান বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ প্রভৃতি)

আত্মপরিচয় নির্মাণের উপাদান হয়ে উঠেছিল, পার্থ মিত্র যাকে বলেছেন ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রকাশের প্রতিরোধ (Partha, 2007 : 10)।[১] অর্থাৎ চিত্রের মাধ্যমে শিল্পীরা আত্মপরিচয় নির্মাণ করে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বাংলার প্রকৃতি, সাধারণ মানুষ ও লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য–প্রভৃতি বিষয় ও উপাদান চিত্রে অঙ্গীভূত হয়ে আত্মপরিচয়ের ভাষা নির্মিত হয়েছে এই শিল্পীদের কাজে। এভাবে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ভাবধারার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় এই আত্মপরিচয়ের ভাষা তৈরি করে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এ চারজন শিল্পীর গ্রামীণ প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে ছবি আঁকার ধরন ছবির একটি স্থায়ী বিষয়ে পরিণত হয়, যা আমিনুল, হামিদুর, মুর্তজা, রাজ্জাক, রশিদ, দেবদাস, জাহাঙ্গীর, বাসেত প্রমুখের ছাত্রজীবন এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রভাব ফেলে। এ শিল্পীদের অনেকেই আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে বিদেশে যান শিল্পচর্চায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে। তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাদের চিত্রচর্চায় নতুন উপাদানের সংযোজন ঘটায়। '৬০-এর দশক পর্যন্ত তাদের বিমূর্ত চিত্রভাষার চর্চাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই পর্বে। এই চিত্রভাষা চর্চার সাথে '৪০-এর দশকের শিল্পীদের চিত্রভাষার সম্পর্কের বিষয়টিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখানে। আর্ট ইনস্টিটিউটে পাঠ গ্রহণের সময় আমিনুলদের ওপর জয়নুল আবেদিনের শিল্পদর্শনের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে এই পর্বে। কারণ, এই প্রভাব পরবর্তী সময়ে তাঁদের কাজে বিদ্যমান ছিল।

১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস'-এ ক্লাস শুরু হয় (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৬৪)। দুই বছরের প্রাথমিক পর্ব (elementary part) ও তিন বছরের বিশেষায়িত কোর্স (specialized course) নিয়ে শিক্ষাপদ্ধতির কাঠামো গঠন করা হয়। বিশেষায়িত কোর্স পর্বে দুটি বিভাগ ছিল–ফাইন আর্ট বিভাগ ও কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগ। কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যসূচি (curriculumn) অনুসরণ করা হয় ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে (Lala Rukh, 1998 : 8-9)। তবে কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হলেও শুরু থেকে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের চিত্র অনুশীলনে জয়নুলের শিল্পদর্শনের প্রভাব পড়ে। ছাত্রদের ছবি আঁকার দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি তিনি বাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবনকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের ওপর গুরুত্ব দেন। এ জন্য তিনি শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে কর্মজীবী মানুষ, জীবজন্তু, নদী, নৌকা, হাটবাজার, ফসলের মাঠ, গাছপালা, গ্রাম ও শহরের দৃশ্য প্রভৃতি অনুশীলনের ওপর জোর দেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৬৫-৬৬)। ছাত্রদের চিত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রে জয়নুলের এই সাধারণ মানুষের জীবন ও দেশের প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লালা রুখ সেলিম লিখেছেন, মজার বিষয় হলো কলকাতা আর্ট স্কুলে কর্মরত মানুষের অবয়ব অনুশীলনের রীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু জয়নুলের দুর্ভিক্ষের চিত্রের বাস্তবতা এবং তাঁর ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রভাবের দ্বারা সেই

রীতি এখানে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। জয়নুল বিশ্বাস করতেন এ দেশের শিল্পের সাথে অবশ্যই এই দেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং এ দেশের মানুষের জীবনপ্রণালির সম্পর্ক থাকতে হবে। লালা রুখ আরো লেখেন যে, এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে সেই সময়ের বাবু সংস্কৃতির মাঝে থেকেও জয়নুল কখনোই ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলায় পরিবর্তন আনেননি এবং তিনি অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিল্প যে সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই জরুরি (Lala Rukh, 1998 : 8)।[২] লালা রুখের এই বক্তব্য থেকে জয়নুলের বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জয়নুল যে ছাত্রদের সাধারণ মানুষের জীবনকে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ছবি আঁকতে বলেছিলেন, তার উদাহরণ পাওয়া যায় ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনে। ছাত্ররা অতিসাধারণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতিকে বিষয় করে ছবি এঁকেছে। যেমন–একটি ছবির কথাই ধরা যাক, তা হলো আমিনুল ইসলামের 'রাতে গানের আসর' (জলরং, ১৯৫১ : ১৯) (চিত্র : ১১২)। ছবিটিতে অতিসাধারণ মানুষের জীবনে বিনোদনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

আমিনুল ইসলাম তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণায় জয়নুলের এই সাধারণ মানুষের জীবনকে পর্যবেক্ষণের বিষয়ে লিখেছেন :

> এ-সময় আবেদিন সাহেব একটা কম্পোজিশন ক্লাস নিয়েছিলেন, যার সাবজেক্ট ছিল স্বর্ণকার, ধুনকার, নৌকায় গুণ টানা, কামার অথবা কুমারের কর্মরত অবস্থার দৃশ্য। ...ঐ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে আমি বেছে নিয়েছিলাম তখনকার ইংলিশ রোডে অবস্থিত কামারশালায় তৈরি ছুরি, দা ইত্যাদির শান দেওয়ার দৃশ্য। অন্য ছাত্রদের মধ্যে আবদুর রহমানের 'গুণ টানা' আর সম্ভবত লোকনাথের 'স্বর্ণশিল্পী'র কাজটা বেশ ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল। লোকনাথের বাবাও ছিলেন একজন স্বর্ণশিল্পী। শিল্পী হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এই সব দরিদ্র শ্রমজীবী–জীবনের ছবি আঁকার প্রবর্তনা, ঢাকা আর্টস্কুলের পরবর্তী প্রায় সমস্ত ছাত্রেরই সামাজিক ভাবনায় প্রভাব ফেলেছে বহুদিন (আমিনুল, ২০০৩ : ৩৫)।

আমিনুল ইসলাম এই বহির্জগৎ চেনার ব্যাপারে আরো লেখেন 'ক্লাসের শেষে আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই সদরঘাট অঞ্চলে যেতাম বিভিন্ন ধরনের নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ এবং অসংখ্য মানুষজনের বসার ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখার চোখ তৈরি করতে। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই জনমানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য অবলোকনের এক চোখ তৈরি হতে থাকে' (আমিনুল, ২০০৩ : ৩৪)। মাহমুদ আল জামান লিখেছেন :

> ওঁরা তিনজন (আবদুল বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী, আবদুর রউফ) স্কেচ করবার জন্য কাকডাকা ভোরে চলে যেতেন কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা বা সদরঘাটে। ...এই তিনজন আউটডোরে স্কেচ করার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। আউটডোরে প্রবহমান জীবন অবলোকন তাঁদের শিল্পিত সত্তায়ও এক অর্থযোজনা করেছিল জীবন ও মানুষকে দেখবার চোখও তৈরি হয়েছিল (মাহমুদ, ২০০৪ : ২৭)।

এই বক্তব্যগুলো একটু বিস্তৃত পরিসরে উল্লেখ করা হলো এ কারণে যে, এর মধ্য দিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ছবি আঁকার প্রেরণার উৎসের পরিচয় মেলে। ছাত্রদের মাঝে সাধারণ মানুষের জীবনকে বোঝার আগ্রহের কারণে পরবর্তী সময়েও তাদের চিত্রে মানুষের উপস্থাপনার প্রাধান্য ছিল। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্য দিয়ে তাঁরা যে বিমূর্ত রীতির কাজগুলো করেছেন, সেগুলোর অধিকাংশই মানুষের অবয়বনির্ভর।

এই শিল্পীদের দ্বারা '৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে '৬০-এর দশকের মধ্যে চিত্রে যে বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা হলো বিমূর্ত রীতির চর্চা, বিশেষ করে পুরোপুরি অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির উদ্বোধন এবং তেলরং, অ্যাক্রেলিক প্রভৃতি উপকরণ ও নানা করণকৌশলের (যেমন impasto কৌশলে রঙের প্রয়োগ, palette knife-এর মতো সরঞ্জামের ব্যবহার এবং রঙের মাধ্যমে ক্যানভাসে texture বা বুনটের সৃষ্টি ইত্যাদি) ব্যাপক ব্যবহার। মূলত এর আগে তেলরং এবং অ্যাক্রেলিকের ব্যবহার সীমিত ছিল আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চায়। বিমূর্ত রীতির চর্চা এবং তেলরং বা অ্যাক্রেলিক প্রভৃতি নানা কৌশলের ব্যবহার–সামগ্রিকভাবে এই পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হলেও প্রত্যেক শিল্পীরই নিজের রচনার ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা রয়েছে।

আমিনুল ইসলাম : ১৯৫৩ সালে আমিনুল ইসলাম ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে ইতালি সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯৫৩-১৯৫৬ পর্যন্ত একাডেমি দা বেল্লি আর্ত-এ শিল্পশিক্ষা লাভ করেন (মইনুদ্দীন, ২০০৭ : ৩৫০)। সেখানে তিনি পেইন্টিং বিভাগের প্রফেসর কন্তি (Conti) (যাঁর কাজে রেমব্রান্ট, গয়া এবং এডওয়ার্ড মানের প্রভাব ছিল)-এর কাছে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন (আমিনুল, ২০০৩ : ৫৭-৫৮)। এ ছাড়া তিনি প্রফেসর কেক্কি (Checchi) (যিনি কাজ করতেন ফরাসি ইম্প্রেশনিস্ট স্টাইল এবং প্রধানত নিসর্গ আঁকতেন) এবং প্রফেসর খোলা চিককি (Cola Cicchi) (প্রধানত ফ্লেস্কো মাধ্যমে কাজ করতেন)-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের কাছ থেকেও শিক্ষা লাভ করেন (আমিনুল, ২০০৩ : ৫৭, ৯৯, ১৩৭)। ১৯৫৪ সালে ফ্লোরেন্সে থাকাকালে আমিনুল ইসলাম যে কাজগুলো করেন সেগুলো হলো 'ফ্লোরেন্স' (চিত্র : ১১৩), 'বৃষ্টিতে', 'কৃষকেরা', 'জেলে পরিবার', 'পরিবার', 'অন্ধ গায়ক', 'পন্টে ভেক্কিও', 'মা', 'রাখাল', 'জেলের স্বপ্ন' প্রভৃতি। এ কাজগুলো বিমূর্ত রীতিতে করা, জ্যামিতিক বিভাজনে ফিগার ও দৃশ্যপটকে আঁকা হয়েছে। এসব কাজের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে করেন 'মাছ' (১৯৫৬), 'তরুণ অশ্বারোহী' (১৯৫৮), 'নৌকা' (১৯৫৯), 'হকার' (১৯৫৭), 'দুর্গত' (১৯৫৮), 'নিসর্গ' (১৯৬০), 'লাল রঙে নারীর গঠন' (১৯৬২)। এ সবগুলো কাজই তেলরঙে করা। চিত্রগুলোতে ফিগার বা অবয়বকে জ্যামিতিক ফর্মে বিভাজন করেছেন। '৬০-এর দশকে আমিনুল ইসলাম নিরাবয়ব বিমূর্ত রীতির উদ্বোধন ঘটান তাঁর কাজে। 'ভুলে যাওয়া সুরের ছন্দ' (তেলরং, ১৯৬২) (চিত্র : ১১৪), 'The Trap' (তেলরং, ১৯৬৩), 'Dawn' (তেলরং, ১৯৬২), 'Early Autumn' (তেলরং ও ল্যাকার, ১৯৬৩), 'রূপান্তর-১' (অ্যাক্রেলিক, ১৯৬৭), 'রূপান্তর-২' (অ্যাক্রেলিক,

১৯৬৭), 'রূপান্তর-৬' (অ্যাক্রেলিক, ১৯৬৭), 'বৃদ্ধি' (তেলরং, ১৯৬৭), 'বিভক্ত' (অ্যাক্রেলিক ও কোলাজ, ১৯৬৭), 'সন্ধ্যার আলো' (তেলরং, ১৯৫৮), 'সকালের আলো' (তেলরং, ১৯৬৮), 'শক্তি' (তেলরং, ১৯৬৯) প্রভৃতি ছবিতে কোনো পরিচিত রূপ নেই, শুধু রঙের মাধ্যমে নির্বস্তুক ফর্মের বিন্যাস করা হয়েছে।

হামিদুর রাহমান : হামিদুর রাহমান ১৯৪৮ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এখানে দুই বছর শিক্ষালাভের পর তিনি প্যারিসের একোল দে বোজার্ত-এ ১৯৫০ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ম্যুরাল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন পিয়ের রোদে (মইনুদ্দীন, ২০০৭ : ৩৩৪)। ১৯৫১ সালে তিনি লন্ডনের সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ডিজাইনে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে ডিগ্রি লাভ করেন। এরই মাঝে ১৯৬৩ সালে ফ্লোরেন্সের একাডেমি দা বেল্লি আর্ত-এ একটি সংক্ষিপ্ত ম্যুরাল কোর্স করেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৫৮-৫৯ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় পেনসিলভানিয়া একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ রিসার্চ স্কলার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন (মইনুদ্দীন, ২০০৭ : ৩৩৫)। '৫০ ও '৬০-এর দশকে হামিদুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষামূলক কাজের মধ্যে অবয়ব বা পরিচিত রূপ নির্ভর কাজ হলো 'রোডা' (তেলরং, ১৯৬০) (চিত্র : ১১৫), 'বংশীবাদক' (তেলরং, ১৯৫৬), 'একটি মুখ শীতলপাটি' (তেলরং, ১৯৬৬), 'Couple' (তেলরং, '৫০ দশকের শেষ), 'নিসর্গের মাঝে মুখ' (তেলরং, ১৯৫৮), 'অস্তিত্ব' (তেলরং, ১৯৬৬), 'একাত্ব' (তেলরং, ১৯৫৬), 'স্থির নৌকা-১' (তেলরং, ১৯৬৪), 'স্থির নৌকা' (তেলরং, ১৯৬৪), 'Boat at Rest' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬১), 'Mother and Child' (তেলরং, ১৯৬৩), 'Fish' (মিশ্র মাধ্যম, ১৯৬০), 'Figure and Foliage' (আনু, ১৯৬০-৬৫), 'The Flute' (আনু. ১৯৬০-৬৫), 'Pet' (তেলরং, আনু, ১৯৬০-৬২) প্রভৃতি। হামিদুর রাহমানের নিরাবয়ব বিমূর্ত ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আমার প্রিয় রুমাল' (তেলরং, ১৯৬৫) (চিত্র : ১১৬), 'কুতুবদিয়া' (তেলরং, ১৯৬৪), 'চড়ুই-এর মৃত্যু' (তেলরং এবং ল্যাকার, ১৯৬৫), 'Whisper without Sound' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬৪), 'Landscape' (তেলরং, ১৯৬৩), 'Forest' (তেলরং, ১৯৬০-৬৪), 'Design F' (তেলরং, ১৯৬০-৬৪) প্রভৃতি। পরিচিত বা অপরিচিত যে আকারই হোক না কেন হামিদুর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আকারকে ফাঁকা পটভূমিতে স্থাপন করেছেন। পরিচিত রূপগুলো সরলীকরণের মাধ্যমে বিমূর্ত গুণ অর্জন করেছে। পরিচিত বিষয়গুলোর মধ্যে হামিদুর এঁকেছেন নদী, নৌকা, নারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রকৃতিকে নিয়ে আবেগে ভরা দৃশ্য।

মোহাম্মদ কিবরিয়া : কিবরিয়ার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায়। ১৯৪৫ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৫০ সালে পাস করেন। তিনি ঢাকায় চলে আসেন ১৯৫১ সালে (সৈয়দ মনজুরুল, ২০০৪ : ১৯-২০)। ১৯৫৯-৬২ এই সময়ে তিনি জাপানে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন (সৈয়দ মনজুরুল, ২০০৪ : ১০৬)। প্রথম দুই বছর তিনি তেলরঙে কাজ শেখেন তাকেশি হায়াকির কাছে। পরের এক বছর শেখেন কাঠ খোদাই, এচিং ও লিথোগ্রাফ। প্রফেসর কোমাই ও হিদেয়ো হাগিয়োয়ার কাছে শেখেন যথাক্রমে এচিং ও কাঠখোদাই

(মাহমুদুল, ২০০৭ : ৩৪২)। জাপানে যাওয়ার আগে কিবরিয়ার উল্লেখযোগ্য কাজ হলো 'জলকেলি' (তেলরং, ১৯৫৩) (চিত্র : ১১৭), 'খেলারত শিশু' (তেলরং আনু. পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে), 'গ্লাস হাতে বালক' (তেলরং, ১৯৫৮), 'তিন আত্মা' (তেলরং, ১৯৫৮), 'অন্ধ দার্শনিক' (আনু. ১৯৫৮)। ছবিগুলোতে রূপের সরলীকরণ ও জ্যামিতিক আকৃতিতে রূপ তৈরির প্রচেষ্টা আছে। জাপান থেকে ফেরার পর তিনি নিরাবয়ব বিমূর্ত রীতিতে কাজ করেছেন। তবে '৭০-এর দশকের আগে কিবরিয়া বিমূর্ত রীতিতে কাজ করেছেন বেশি লিথোগ্রাফ মাধ্যমে। তেলরঙে বিমূর্ত রীতির চিত্র '৭০-এর দশক থেকে বেশি পাওয়া যায়। '৬০-এর দশকে তেলরঙে করা দুটো চিত্র হলো 'Red Black and Mauve' (আনু. ১৯৬৬-৬৭) এবং 'কম্পোজিশন হলুদ' (১৯৬৫, মিশ্র মাধ্যম) (চিত্র : ১১৮)।

মুর্তজা বশীর : মুর্তজা বশীর ১৯৫৪ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে চার মাস আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন (ঢালী, ২০০৭ : ৩৬৭)। কলকাতায় পরিতোষ সেনের (১৯১৮-২০০৪) সাথে তার দেখা হয়। পরিতোষ সেনের কাছ থেকে তিনি প্যালেট নাইফ দিয়ে ছবি আঁকার কৌশল শেখেন এবং 'আবেগ' (তেলরং, ১৯৫৪) (চিত্র : ১১৯) নামে একটি ছবিতে এই কৌশল প্রয়োগ করেন (মুর্তজা, ২০১৪ : ৩৮)। এ পদ্ধতিতে তাঁর আর একটি ছবি হলো 'আগামী দিনের অপেক্ষায়-২' (তেলরং, ১৯৫৫) (চিত্র : ১২০)। কৃষাণ নেত্রী ইলা মিত্র হাসপাতালে থাকার সময় তাঁকে বিষয় করে মুর্তজা বশীর এ ছবিটি করেন (মুর্তজা, ২০০৪ : ৬১)। ছবিগুলোতে রূপের সরলীকরণ এবং সমতল বা ফ্ল্যাট করার প্রবণতা লক্ষণীয়। মুর্তজা বশীর ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের একাডেমি দা বেল্লি আর্ত-এ চিত্রকলা ও ফ্রেস্কোর ওপর উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন (হাসনাত, ২০০৪ : ১১৪)। ফ্লোরেন্সে থাকার সময় থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত তিনি যে চিত্রগুলো করেন সেগুলো হলো 'হলুদ বাড়ি' (তেলরং, ১৯৫৭), 'পথে' (তেলরং, ১৯৫৭), 'ঘরের পথে' (তেলরং, ১৯৫৮), 'জিপসী' (তেলরং, ১৯৫৮), 'অ্যাকর্ডিয়ান নিয়ে মানুষ' (তেলরং, ১৯৫৮), 'শান্তি' (তেলরং ও কাঠের গুঁড়া, ১৯৫৮), 'সেস্টো ফ্লোরেনটিনোর প্রাকৃতিক দৃশ্য' (তেলরং, ১৯৫৭), 'ভিনো, কমলা ও রুটি' (তেলরং, ১৯৫৭), 'স্বপ্নচারিতার গাথা' (তেলরং, ১৯৫৯), 'দুই প্রেমিকার জন্য সঙ্গীত' (তেলরং, ১৯৬২) (চিত্র : ১২১), 'মেয়ে ও পাখি' (তেলরং, ১৯৫৯), 'চিরন্তনী বোন' (তেলরং, ১৯৫৯), 'The Lemons' (তেলরং, ১৯৫৮), 'Girl and Mirror' (তেলরং, ১৯৫৯) প্রভৃতি। এই ছবিগুলোতে সমতল রং, আকারের সরলীকরণ, সমতল ভাব এবং বস্তুর বহিঃরেখা ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক ছবিতে এক রূপের বহিঃরেখা অন্য রূপকে ছেদ করে নানা মিশ্র আকৃতির সৃষ্টি করে দৃশ্যকে জটিল (Complex) করে তুলেছে। একটি রূপকে ভেদ করে অন্য রূপকে দৃষ্টিগোচর করেছেন বলে মুর্তজা বশীর এই পর্বের ছবিগুলোকে 'ট্রান্সপারেনসিজম' বলে আখ্যায়িত করেছেন (মুর্তজা, ২০১৪ : ৪২)।

তাঁর ছবির আর একটি পর্ব ১৯৬০ থেকে ১৯৬১ সাল। 'প্রভাতি' (ক্যানভাসে তেলরং ও ল্যাকার, ১৯৬০), 'তরুণী ও পাখি' (ক্যানভাসে ল্যাকার, তেলরং ও কাঠের গুঁড়া, ১৯৬১), 'রমণী ও তক্ষক' (মেসোনাইটে ল্যাকার, তেলরং ও কাঠের গুঁড়া, ১৯৬১), (চিত্র : ১২২) 'প্রেম পাখি' (মেসোনাইটে তেলরং ও ল্যাকার, ১৯৬১), 'ফুলের সুবাস নিচ্ছে নারী' (তেলরং, ১৯৬১), 'অসুস্থ বালক ও খাঁচাবদ্ধ পাখি' (তেলরং, ল্যাকার, ১৯৬০), 'মা ও শিশু' (তেলরং, ল্যাকার, ১৯৬০), 'পাখি হাতে বালক' (তেলরং, আনু. ১৯৬১), 'মোরগ' (ল্যাকার, আনু. ১৯৬০), 'Dead Lizard' (তেলরং, আনু. : ১৯৬১), 'Face in Green' (১৯৬১) প্রভৃতি ছবিগুলো এ সময়ে করা। এ ছবিগুলোতে রং প্রয়োগের নিরীক্ষাধর্মিতা চিত্রপটে বিভিন্ন বুনটের (Texture) সৃষ্টি করেছে। রঙের নানা টেক্সচারের মাঝে রেখার মাধ্যমে সরলভাবে ফিগারের উপস্থাপনা করা হয়েছে। এই ছবিগুলো আঁকার সময় মুর্তজা বশীর তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন :

> ... কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ আমাকে '৫৯ সালের ডিসেম্বর লাহোরে নিয়ে গেলেন। ... আত্মীয়স্বজনহীন, ভিন্ন পরিবেশ ও ভাষার মানুষ চারপাশে। যে ঘরে থাকি সে ঘরে কোনো পলেস্তারা নেই, জানালার কাচ নেই। এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার মাঝে বসবাস। একদিন দুপুরবেলা ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছি। ছাদের মাঝে লক্ষ করলাম, বৃষ্টির পানি চুইয়ে ফাঙ্গাস পড়েছে সেখানে। পলেস্তারাহীন সেই দৃশ্য আমার কাছে মনে হলো যেন এক ভয়ার্ত মানুষের মুখ। সে-সময় আমি লাহোরের পথে একা একা ঘুরতাম। দেয়ালে দেয়ালে এমন অসংখ্য মানুষের মুখ দেখতে পেতাম। লাহোরে আমার কোনো ইজেল ছিল না। ছবি আঁকতাম মাটিতে ক্যানভাস বিছিয়ে। তখন তেলরঙের চেয়ে আমি এনামেল রঙে ছবি আঁকতাম। মাঝে মাঝে কিছু অয়েল ব্যবহার করতাম। আমি তখন ক্যানভাসে রং ফেলে নিজের খুশিমতো আঁকতাম। কখনো কাপড়ে চেপে ধরতাম রং। নিচের সাদা রং বের হয়ে আসত কোথাও কোথাও। এককথায় আমার অবচেতনের চিন্তা, রেখা সব উঠে আসতে লাগল। আমি গভীরভাবে চেয়ে দেখলাম, সেখানে দেখা যাচ্ছে কোনো মুখ কিংবা কোনো মেয়ে বসে ফুল দেখছে। এ ধরনের আরো কিছু ছবি আমি এঁকেছিলাম লাহোরে থাকার সময় (মুর্তজা, ২০১৪ : ৪২-৪৩)।

১৯৬২ সাল থেকে মুর্তজা বশীরের ছবি আর একটি পর্যায়ে প্রবেশ করে। 'লাল জামা পরিহিতা নারী' (মেসোনাইটে তেলরং ও এনামেল, ১৯৬২) (চিত্র : ১২৩), 'মুখ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য-২' (মেসোনাইটে তেলরং ও ল্যাকার, ১৯৬২), 'দম্পতি, বাড়ি, গাছ ও একটি মুরগি' (মেসোনাইটে তেলরং, ল্যাকার ও কাঠের গুঁড়া, ১৯৬২), 'গ্রামীণ দৃশ্য' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬২), 'মুখ' (মেসোনাইটে তেলরং ও ল্যাকার, ১৯৬২), 'Landscape Composition' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৩), 'মুখ' (তেলরং, ১৯৬২) প্রভৃতি। এই ছবিগুলোতে রূপের সরলীকরণ করে ঘর, গাছ, মানুষ প্রভৃতিকে সন্নিহিতভাবে উপস্থাপন করেছেন শিল্পী। ছবিগুলোতে উজ্জ্বল লাল, সোনালি এবং রুপালি রঙের ব্যবহার লক্ষণীয় (ঢালী, ২০০৭ : ৩৬৯)। এসব ছবির

আশাবাদী মনোভঙ্গি সম্পর্কে শিল্পী নিজের বিবাহোত্তর জীবনের যৌথ ও সুশৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (মুর্তজা, ২০০৪ : ৪৩)।

মুর্তজা বশীরের এর পরের পর্ব দেয়াল সিরিজ। পুরোনো দেয়ালের গায়ের বৈচিত্র্য নিয়ে শিল্পী রচনা করেন ৯০টির অধিক ছবি। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনি এসব কাজ করেন। এই দেয়াল সিরিজের কাজের বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিষয়ের বা দেয়ালের যেকোনো একটি অংশকে বড় করে আঁকা হয়েছে। এ কারণে অনেক সময় কোনো কোনো চিত্র স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ হয়ে পুরোপুরি বিমূর্ত গুণের অধিকারী হয়েছে, যেমন–'দেয়াল-২৮' (তেলরং, ১৯৬৭) (চিত্র : ১২৪), 'দেয়াল-৪৮' (তেলরং, ১৯৬৭), 'দেয়াল-৫৮' (তেলরং, ১৯৬৯), 'দেয়াল-৬১' (তেলরং, ১৯৬৯), 'দেয়াল-৪৭' (তেলরং, ১৯৬৭) প্রভৃতি।

রশিদ চৌধুরী : রশিদ চৌধুরী ১৯৫৪ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে শিল্প-সমঝদারি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স করেন (আবুল মনসুর, ২০০৩ : ১০৩)। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি স্পেন সরকারের স্নাতকোত্তর বৃত্তি নিয়ে মাদ্রিদের সেন্ট্রাল এস্কুলা দেস বেলিয়াস আর্টস দ্য সান ফার্নান্দো থেকে ভাস্কর্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন (আবুল মনসুর, ২০০৩ : ১০৩)। ১৯৬০ সালে ফ্রান্সে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'জড়-জীবন' (তেলরং, ১৯৫৬), 'নৌকা' (তেলরং, ১৯৫৬), 'উপবিষ্ট মহিলা' (তেলরং, ১৯৫৭), 'তিন রমণী' (তেলরং, ১৯৫৭), 'নবান্ন-১' (তেলরং, ১৯৫৯) (চিত্র : ১২৫), 'নবান্ন-২' (তেলরং, ১৯৫৮), 'ছাগল' (তেলরং, ১৯৫৮) প্রভৃতি। 'নবান্ন-১' ও 'ছাগল' চিত্র দুটিতে মার্ক শাগালের প্রভাব লক্ষ করা যায়। '...শাগালের কাজের যে প্রেরণা–তাঁর মাতৃভূমির প্রতি প্রেম, স্মৃতি ও স্বপ্নের জগতের যে সংমিশ্রণ–তার সাথে রশিদ চৌধুরী সম্ভবত একটা মানসিক যোগ অনুভব করেছিলেন এবং নিজের মানস গঠনকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন' (নাসিমা, ২০০৭ : ৩৬১)। ১৯৬০-৬৪ সালে তিনি ফ্রান্স সরকারের স্নাতকোত্তর বৃত্তি নিয়ে প্যারিসের একাডেমি অব জুলিয়ান অ্যান্ড বোজ আর্টস থেকে ফ্রেস্কো, ভাস্কর্য ও ট্যাপিস্ট্রি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন (আবুল মনসুর, ২০০৩ : ১০৩)। তাঁর ট্যাপিস্ট্রি শিক্ষক জ্যঁ লুরসাতের (Jean Lurcat) প্রভাবে তিনি স্বদেশ ও ঐতিহ্যের ভাবনা এবং মাধ্যম হিসেবে ট্যাপিস্ট্রি–এ দুটো বিষয় নিয়ে নতুনভাবে তাঁর শিল্পের যাত্রা শুরু করেন। এ সময় থেকে স্বদেশ ও ঐতিহ্যের ভাবনা তাঁর কাজে উপস্থাপিত হতে থাকে (নাসিমা, ২০০৭ : ৩৬২)। এ সময় থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো : 'কিষান-কিষানি' (ট্যাপিস্ট্রি, ১৯৬৫) (চিত্র : ১২৬), 'কম্পোজিশন' (ট্যাপিস্ট্রি, ১৯৬৮), 'নৃত্যরত' (গোয়াশ, ১৯৬১) (চিত্র : ১২৭), 'উৎসব-৩' (গোয়াশ, ১৯৬৮), 'বাংলার প্রতি আনুগত্য' (গোয়াশ, আনু. ১৯৬৫), 'পাখি যখন নাচবে' (গোয়াশ, আনু. ১৯৬৫) প্রভৃতি। গ্রামীণ জীবন ও সেই জীবনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রশিদ চৌধুরীর কাজে বিষয় হিসেবে এসেছে, যেমন–কিষান-কিষানি, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি। চিত্রকর্ম ও ট্যাপিস্ট্রি–দুটোর ক্ষেত্রেই শিল্পী বিন্যাস ঘটিয়েছেন চারপাশের পটভূমি

ছেড়ে চিত্রপটের মাঝখানে বিষয়ের চিত্রায়ণের মাধ্যমে। রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির আদলে নানা রঙের (প্রধানত লাল, হলুদ, নীল) ছোট ছোট তুলির আঁচড়ে রূপকে বিন্যস্ত করেছেন। ছোট-বড় তুলির আঁচড় (যা অনেক সময় লোকশিল্পের অলংকরণের আভাস দেয়) এবং উষ্ণ ও শীতল রঙের পাশাপাশি ব্যবহার তাঁর চিত্রকর্মে চঞ্চলতা এবং গতি এনেছে। তাঁর ছবিতে বাস্তব অবয়বের আভাস অবয়বহীন বিমূর্ত হতে বাধা দেয়।
মীজানুর রহমান তাঁর কাজ সম্পর্কে লিখেছেন :

> ... বসন্ত সমাগমে কৃষ্ণের সম্মানে যে হোলি খেলা–তাঁর রঙটা তো নীলচে-লাল অর্থাৎ ম্যাজেন্টা, এই রঙটাও আমরা পাই রশিদের কাজে। নিসর্গের, দিনমানের ও জীবনের রঙগুলো নিয়ে শিল্পী তো খেলবেনই। রশিদের ছেলেবেলা কেটেছে মন্দিরের আঙিনায়, পুরোহিতের ছত্রছায়ায়, বৈষ্ণববৈষ্ণবীর সান্নিধ্যে–এসবের প্রভাবকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। তাইতো রশিদের শিল্পকর্মে সংহারকারিণী কালীও আসে ঘুরে ঘুরে। ...রশিদের চিত্রে আমরা দুর্গাকেও দেখি...এই দুর্গা এই কালী এই রাধা এই কালিয়া নানা রঙে ধরা দেয় রশিদের ট্যাপিস্ট্রিতে, তেল ও জলরঙে, নানা মাধ্যমে। (বেলাল, ১৯৮৮ : ৯৬-৯৭)।

বাল্যবয়সের অভিজ্ঞতা ছাড়াও বাংলাদেশের প্রথম পর্বের শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখের 'আত্মপরিচয় আবিষ্কারে লোকজ জীবন ও সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত' হওয়ার বিষয়টি রশিদ চৌধুরীকে প্রভাবিত করেছে (নাসিমা, ২০৭৭ : ৩৬১)। এভাবে লোকজীবনের বিষয়, লোকশিল্পের রূপ, রং প্রভৃতি মিলে রশিদ চৌধুরীর বিমূর্ত রীতির নানা পর্যায় গড়ে উঠেছে।

কাইয়ুম চৌধুরী : কাইয়ুম চৌধুরী ১৯৫৪ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করেন। স্বভাববাদী রীতিতে আঁকা শিখলেও ১৯৫৩ সালে 'দম্পতি' (তেলরং) ও 'ঘুড়ি হাতে বালক' (তেলরং) ছবিতে জ্যামিতিক বিভাজনের প্রয়োগে বিষয়কে সরলীকরণের মধ্য দিয়ে সমতলভাব আনার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ১৯৫৬ সালে আঁকা 'মহাজন' (তেলরং, ১৯৫৬) (চিত্র : ১২৮) ছবিটিতেও মানুষ এবং তাঁর পরিবেশকে জ্যামিতিক বিভাজনে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এই বছরেই আঁকা 'চন্দ্রালোকে নৌকা' (জলরং) ছবিটিতে বস্তুর রূপ মূর্ত হলেও তিন মাত্রার ভ্রম তৈরির পরিবর্তে ছবির সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ আর পশ্চাদভাগ মিলে একটি তল সৃষ্টি করেছে রেখা ও রূপের বিভাজনের মধ্য দিয়ে। এভাবে ছবি, ফ্ল্যাট বা সমতল হয়ে উঠেছে এবং বিমূর্ত গুণ লাভ করেছে। একইভাবে তাঁর 'কাক ও নৌকা' (১৯৫৮, তেলরং), 'কারফিউর কবলে গ্রাম' (তেলরং, ১৯৫৯), 'বসন্ত' (তেলরং, ১৯৬০), 'সেতু ও গরু' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬০), 'নকশা' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬০), 'পাল তোলা' (ক্যানভাসে তেলরং, ১৯৬৩) (চিত্র : ১২৯) ইত্যাদি ছবি সম্পাদন করা হয়েছে। তাঁর ছবিতে লোকশিল্পের নকশা, নৌকা, নৌকার গলুই, পাখি ইত্যাদি লোকশিল্পের মোটিফ বা অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। রঙের ক্ষেত্রে নীল, লাল, হলুদ ইত্যাদি লোকশিল্পের রঙের প্রাধান্য রয়েছে তাঁর ছবিতে। গ্রামীণ প্রকৃতি–গাছপালা, নদী-নৌকা তাঁর ছবির বিষয় হয়েছে। 'গোধূলি-১' (মেসোনাইটে তেলরং-১৯৬৫),

'কদলীবৃক্ষ' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৬) (চিত্র : ১৩০), 'নৌকা' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৭), 'বৃক্ষমাঝে সূর্যালোক' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৭), 'গোধূলি-২' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৭) প্রভৃতি ছবিতে কাইয়ুম চৌধুরী বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশীয় সংস্কৃতির চিহ্ন–কলাগাছ, গাছগাছড়া, লতা-গুল্ম, পাখি ইত্যাদির আভাস (suggestion) সংবলিত বিমূর্ত রীতির উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। সফিউদ্দীন আহমেদ যেমন তাঁর বিমূর্ত চিত্রের রূপ চয়ন করেছেন বাংলার প্রকৃতি থেকে, কাইয়ুম চৌধুরীও তাঁর বিমূর্ত রীতির রং এবং রূপ বাংলার প্রকৃতি থেকেই নিয়েছেন, এর বাইরে যাননি। কাইয়ুম চৌধুরীর ছবিতে লোকশিল্পের প্রভাব বা গ্রামীণ ঐতিহ্যের ব্যবহার সম্পর্কে শিল্প ইতিহাসবেত্তা সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন 'লোকঐতিহ্যের প্রতি জয়নুল আবেদিনের সুতীব্র অনুরাগ কাইয়ুম চৌধুরীর মনেও ওই শিল্পপ্রকরণের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে।' এ ছাড়া 'নন্দলাল বসুর হরিপুরা চিত্রমালা, যামিনী রায় ও কামরুল হাসানের' চিত্রকর্মও তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এসবের প্রভাবে লোকশিল্প তাঁর কাছে ঐতিহ্যের ঠিকানা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে (সৈয়দ আজিজুল, ২০০৭ : ৩৮২)।

আবদুর রাজ্জাক : আবদুর রাজ্জাক ১৯৫৪ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৫৫ সালে প্রতিযোগিতামূলক ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যান। এই বৃত্তির মেয়াদ ছিল এক বছরের। কিন্তু তাঁর কাজের দক্ষতা প্রমাণিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রদান করে এবং গবেষণা সহকারী পদ প্রদান করে। তেলচিত্রে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি ছাপচিত্রে ডিগ্রি অর্জন করেন। শেষ বর্ষে আর একটি বিষয় হিসেবে ভাস্কর্যে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দেশে ফেরেন (নাসিমা, ২০০৭ : ৩৭২)। '৫০ ও '৬০-এর দশকজুড়ে আবদুর রাজ্জাক চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে নিরীক্ষামূলক যে কাজগুলো করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'Painting-V' (তেলরং, ১৯৫৬), 'Composition-11' (বোর্ডে তেলরং, ১৯৬৬), 'Composition-1' (বোর্ডে তেলরং, ১৯৬৬), 'Composition-4' (বোর্ডে তেলরং, ১৯৬১) (চিত্র : ১৩১), 'Composition' (মিশ্র মাধ্যম ১৯৬৮), 'Composition' (কাগজে তেলরং, ১৯৬৮)। এই ছবিগুলো বিমূর্ত হলেও তাতে প্রকৃতিকে শনাক্ত করার উপাদান– সবুজের ব্যবহার, গাছগাছড়া, পাতা, ডাল, আলো, মাটি ইত্যাদির ইঙ্গিতময় (suggestive) রঙের প্রয়োগ চোখে পড়ে। বস্তুত আবদুর রাজ্জাক ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবস্থা থেকে '৫০ ও '৬০-এর দশকজুড়ে প্রকৃতিকে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন প্রচুর। এত অধিকসংখ্যক ছবি আঁকতে গিয়ে প্রকৃতির নির্যাস তাঁর শিল্পমানসে স্থায়ী প্রভাব ফেলে, যার কারণে তাঁর বিমূর্ত চিত্রকলাও গড়ে উঠেছে প্রকৃতির নির্যাসটুকু নিয়ে–রঙের ক্ষেত্রে হোক বা ফর্মের ক্ষেত্রে হোক। তাই বিমূর্ত হয়েও তাঁর ছবি বিষয়নিরপেক্ষ হতে পারেনি।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর : সৈয়দ জাহাঙ্গীর ১৯৫৫ সালে ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন (রবিউল এবং সৈয়দ মনজুরুল, ১৯৯৮ : ১০৫)। '৫০-এর দশকেই জাহাঙ্গীর বিমূর্ত ধারার কাজ করেন। 'সংগঠন'

(তেলরং, ১৯৫৬), 'ত্রয়ী' (জলরং, ১৯৫৬), 'চাঁদ, নদী ও জলমগ্ন নৌকা' (তেলরং, ১৯৫৮) (চিত্র : ১৩২) ইত্যাদি ছবিতে জ্যামিতিক রূপ, রেখা বা রঙের মাধ্যমে বিমূর্ত রূপ সৃষ্টি করেছেন। 'চাঁদ, নদী ও জলমগ্ন নৌকা' ছবিটিতে সবুজ রঙের ব্যবহার এবং গাছের রূপের আকৃতি বাস্তব পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়। '৬০-এর দশকে করা 'প্রস্ফুটিত' (তেলরং, ১৯৬৬), 'পাথর নুড়ির আকার ও গড়ন' (তেলরং, ১৯৬৯), 'নিবেদন' (তেলরং, ১৯৬৮) প্রভৃতি ছবি রং আর তুলির আঁচড়ে সৃষ্ট আকার বা রেখাতে নিরাবয়ব বিমূর্ত।

কাজী আবদুল বাসেত : আবদুল বাসেত ১৯৫৬ সালে আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে পাস করেন। ১৯৫৬ সালেই তাঁর কাজে নিরীক্ষাধর্মিতার উপস্থিতি ছিল। বিষয় এবং পটভূমি নানা ফর্মে বিভক্ত হয়ে একটি অগভীর (shallow) তল সৃষ্টি করেছে, এর উদাহরণ হলো 'মাতৃগর্ব' (তেলরং, ১৯৫৬) ছবিটি। এরপর ১৯৫৮ সালে করা 'বসন্ত' (তেলরং, ১৯৫৮), 'গোধূলি' (তেলরং, ১৯৫৮), 'ধানভানা-১' (তেলরং, ১৯৫৮) (চিত্র : ১৩৩), 'Birdseller' (গোয়াশ, ১৯৫৮), 'মা ও শিশু' (১৯৫৮), এবং '৬০-এর দশকের শুরুতে করা 'Face' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬১), 'Reverie' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬১) ইত্যাদি ছবিতেও একই ধরনের নিরীক্ষাপ্রবণতা দেখা যায়। রঙে হোক বা জ্যামিতিক আকৃতিতে রূপের বিভাজনে হোক পটভূমি (সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ, পশ্চাদভাগ) ও অবয়বকে একই সমতলে এনে একটি অগভীর তল সৃষ্টি করা হয়েছে এ ছবিগুলোতে। আবদুল বাসেত ১৯৬৩-৬৪ সাল সময়ে ফুলব্রাইট ফেলোশিপের অধীনে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ইনস্টিটিউট থেকে চিত্রকলায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন (মাহমুদ, ২০০৪ : ৯৮)। শিকাগোতে তিনি শিক্ষক হিসেবে পান পল উইগার্ড, হ্যান্স হফম্যান আর বাবভিক্টকে (মাহমুদ, ২০০৪ : ২৪)। '৬০-এর দশকেই তিনি নিরাবয়ব বিমূর্ততায় চলে যান। তাঁর এই বিমূর্ত কাজগুলোর মধ্যে হলো : 'প্রতিবিম্ব' (তেলরং, ১৯৬৮) (চিত্র : ১৩৪), 'Sunbeam in the rain' (তেলরং, আনু. ১৯৬৫-৬৭), 'ঝরাপাতার শিশিরবিন্দু' (তেলরং, আনু. ১৯৬৪-৬৫), 'কম্পোজিশন' (১৯৬৪, তেলরং) প্রভৃতি। রঙের প্রাধান্যে এই ছবিগুলো বিমূর্ত আঙ্গিকে করা হয়েছে।

দেবদাস চক্রবর্তী : দেবদাস চক্রবর্তী ১৯৪৮ সালে কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কারণ তাঁর বাবা ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় থাকাকালে দেবদাস বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। আর্ট কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় দেবদাস বহিষ্কৃত হন আরো কয়েকজনের সঙ্গে। এরপর ঢাকায় এসে ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন (আনিসুজ্জামান, ২০০৩ : ১৯)। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে শিক্ষা সমাপ্ত করেন (আনিসুজ্জামান, ২০০৩ : ৯৫)। ১৯৫৭ সালে দেবদাসের আঁকা 'জড়জীবন (তেলরং) ছবিটি এক্সপ্রেশনিস্ট ধারায় আঁকা। ষাটের দশকের প্রথম দিকে তাঁর আঁকা উল্লেখযোগ্য কাজ হলো 'Girl and thought' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬১), 'The Hairdresser and

the lazy Woman', (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬৩) (চিত্র : ১৩৫), 'Two Friends and the Moon in a Big City' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬৩), 'Misfits : Glow and Decay' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬৩), 'Queue Between Hospital Door and Death' (তেলরং, আনু. ১৯৬০-৬৩)। চিত্রগুলো এক্সপ্রেশনিস্ট ভাবধারায় বা রীতির প্রাধান্যে কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতিতে করা এবং মানুষের অবয়বনির্ভর। তবে ছবিতে অগভীর ভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের দুটি বিমূর্ত রীতির ছবি হলো 'Composition' (তেলরং, আনু. ১৯৬৪-৬৫) এবং 'কম্পোজিশন' (তেলরং, ১৯৬৬) (চিত্র : ১৩৬)। ছবি দুটি রঙের প্রাধান্যে বিমূর্ত রীতিতে আঁকা হলেও অনেক মানুষের মুখমণ্ডলের আভাস পাওয়া যায়।

উল্লিখিত শিল্পীদের চিত্রকর্মগুলো আমাদের আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে '৫০ ও '৬০-এর দশকের নতুন চিত্রভাষা নির্মাণ করে এবং একে বলা যেতে পারে আমাদের আধুনিক চিত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের উত্তরণ। তবে এ চিত্রভাষার তাৎপর্য, স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার অবকাশ থেকে যায়। এবং এর সঙ্গে চল্লিশের শিল্পীদের বা জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দীন–এঁদের যোগাযোগ বা সম্পর্কটা কোথায়, সে ব্যাখ্যারও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ '৪০-এর উত্তরাধিকার ও '৫০-এর দশকের নতুন শিল্পচেতনা নিয়েই '৫০-এর শিল্পীরা অগ্রসর হয়েছিলেন। ঢাকায় শিল্পশিক্ষা শেষ করে এঁদের অনেকেই বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যান বা না যান '৫০-এর দশকের মধ্যপর্ব থেকে এঁদের দ্বারাই বিমূর্ত রীতির চর্চার মাধ্যমে নতুন ধরনের ছবি নির্মিত হয়। তবে বিমূর্ত রীতির চর্চা এর আগেও হয়েছে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমেদের কাজের মধ্য দিয়ে। জয়নুলদের বিমূর্ত রীতির ধরন ছিল আলাদা। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে জয়নুল আবেদিনের ১৯৫৩ সালে করা 'বাঙালি রমণী' (চিত্র : ২৪) ছবিটির কথা ধরা যাক। ছবিটিতে অবয়বের সরলীকৃত রূপ, অবয়ব ও পটভূমির জ্যামিতিক বিভাজন, সমতলভাবে রঙের প্রয়োগ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো ছবির বিষয়বস্তুকে বাস্তব থেকে অনেকটাই দূরে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ভ্রমের মাধ্যমে বাস্তব এখানে রূপ পায়নি। অথচ বিষয়ের চিত্রণে বাস্তবের অনুভব আছে। এখানে সরলীকৃত রূপ, সমতলভাব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের কারণে চিত্র কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রূপ লাভ করেছে। কামরুল হাসানের 'মাছ ধরা' (চিত্র : ৫০) ছবিটিতে অবয়ব সরল করে আঁকা, সমতলভাবে রঙের ব্যবহার এবং পুরো দেশ বা স্পেসে ছোট ছোট উলম্ব রেখা এঁকে ফসলের জমির ইঙ্গিত করা হয়েছে। ছবিটি বাস্তবের ইঙ্গিত দেয় কিন্তু বাস্তবের অনুপুঙ্খ বর্ণনা কোথাও নেই। এভাবে এ ছবি বিমূর্ত গুণ লাভ করেছে। বিমূর্ত রীতির আরেকটি উদাহরণ কামরুল হাসানের 'The bride' (চিত্র : ৬৭) ছবিটি। এখানেও রূপের সংক্ষিপ্ততা ছবিতে বিমূর্ত গুণ আরোপ করেছে। সফিউদ্দীন আহমেদ ছাপচিত্রের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্য যেমন নদীর বাঁক, গাছপালা, জালের বাঁকানো রেখা, মাছের বাঁকানো রেখা, নৌকার বাঁকানো রেখা ইত্যাদিকে আশ্রয় করে বিমূর্ত ছবি নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'বন্যাকবলিত গ্রাম' (এচিং, ১৯৫৮) (চিত্র : ১৩৭) এবং 'নেমে যাওয়া বান' (সফট-গ্রাউন্ড

অ্যাকুয়াটিন্ট, ১৯৫৯) (চিত্র : ১৩৮), ছাপাই ছবি দুটি বিমূর্ত রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মোটকথা এ তিন শিল্পীর বিমূর্তের ভিত্তি ছিল অবয়বের সরলীকরণ, সমতলভাব এবং কামরুল হাসান ও জয়নুল আবেদিনের ক্ষেত্রে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিরীক্ষা। ব্রিটিশ ছাপচিত্রশিল্পী স্ট্যানিল উইলিয়াম হের্টারের সুরিয়ালিজমের প্রভাবে অবচেতন মনের ক্রিয়া (automatism)-ভিত্তিক নমনীয় রেখার মতো (Rainmond, 2004 : 101) সফিউদ্দীনও স্বয়ংক্রিয় রেখা দ্বারা জমিনকে নানাভাগে ভাগ করেছেন, নানা বক্র আকৃতির রেখা বাংলার প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন (চিত্র : ১৩৯)। এভাবে সফিউদ্দিনের ছবিতে সমতলভাবের প্রাধান্য এসেছে। জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের ছবিতে সমতল ভাবের প্রাধান্য এসেছে লোকশিল্পের গুণাগুণ থেকে। নব্যবঙ্গীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্যে চীনা-জাপানি শৈলীর প্রভাবের প্রতি জয়নুলের আগ্রহের কথা বিশ্লেষণ করেছেন নিসার হোসেন তাঁর লেখাতে (নিসার, ২০০৭ : ২৭৫)। অন্যদিকে আমিনুলরা অবয়বনির্ভর বিমূর্ত রীতির ছবির চর্চায় পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম, ফোবিজম প্রভৃতি পাশ্চাত্যের কয়েকটি শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে নিজেদের দেশের বিষয়াবলিকে নিরীক্ষাধর্মিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এই নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে অন্বেষা তাঁদের ছিল, তা হলো 'Integrity of the picture plane' বা চিত্রের দেশ (স্পেস)-এর বিশুদ্ধতা বা অখণ্ডতা (John, 1997 : 54)। উনিশ শতকজুড়ে শিল্পীরা চিত্রের দেশ-এর বিশুদ্ধতাকে গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। কিউবিজমের উদ্দেশ্য এবং জটিলতা এটা প্রমাণ করে। কিউবিস্ট শিল্পীদের প্রধান চিন্তা ছিল বিষয়কে এর পারিপার্শ্বিকের সাথে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যেখানে চিত্রসংক্রান্ত জটিলতা প্রতিনিয়ত ক্যানভাসের সমতল বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল এবং শিল্পী মূলত বিষয়ের চিত্রণ করতে গিয়ে এরই মুখোমুখি হচ্ছিল (John, 1997 : 54)।[৩] এটা করতে গিয়ে শিল্পীরা কিছু কৌশল অবলম্বন করেছিল, যেমন–গতানুগতিক পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারকে অস্বীকার করা, পরিপ্রেক্ষিতের অসঙ্গতি তৈরি করা, বিষয়ের চারদিকের খালি দেশকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সামনের দিকে অগ্রসরমাণ করে গুরুত্ব দেওয়া, আকারের বহিঃরেখার ছেদ বা বিভক্তি, আকারের সরলীকরণ ইত্যাদি (John, 1997 : 56-57)। এভাবে ক্যানভাসের সমতল বৈশিষ্ট্যকে বিশুদ্ধ রেখে শিল্পী তার বিষয় বিশেষত অবয়বনির্ভর বিষয়কে বর্ণনা করেছে, যা একধরনের জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আমিনুলরা মূলত এভাবে চিত্রের স্পেসের সমতল বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয় বর্ণনায় আগ্রহী ছিলেন। তাদের কারও কারও চিত্রে (যেমন কাইয়ুম চৌধুরী) লোকশিল্পের মোটিফ বা রং প্রাধান্য লাভ করলেও লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে তারা বিষয় আর ক্যানভাসের সমতল ভাবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেননি। জয়নুলরা চিত্রের স্পেসের বিশুদ্ধতাকে রক্ষার চেষ্টা করেননি। তাঁরা মূলত অবয়বের সরলীকরণের মাধ্যমে বিমূর্তগুণ এনেছেন। বিষয়ের চারপাশের খালি দেশকে গুরুত্ব দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসরমাণ করেননি কিংবা সুনির্দিষ্টভাবে পরিপ্রেক্ষিতের অসঙ্গতি তৈরি করেননি। যদিও তাদের ক্ষেত্রেও এক্সপ্রেশনিজম, ফোবিজম এবং কিউবিজমের প্রভাব ছিল অবয়বের সরলীকরণ কিংবা রং ব্যবহারের

ক্ষেত্রে। কিউবিজম যেন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য-উভয় অঞ্চলে আধুনিকতার সমার্থক হয়ে উঠেছিল, পার্থ মিত্র যেমন বলেছিলেন :

> The enormous expansion of the European cultural horizon in the 'heroic' age of the avant-garde cannot be gainsaid, as the modernist technology of art, not to mention the formal language and syntax of Cubism, allowed artists around the globe to device new ways to represent the visible world. The modernist revolt against academic naturalism and its attendant ideology was openly welcomed by the subject nations who were engaged in formulating their own resistance to the colonial order (Partha, 2014 : 37).

এভাবে এ অঞ্চলের শিল্পীদের কাছেও কিউবিজম একটি অত্যাবশ্যক কৌশল হয়েছে আধুনিক নিরীক্ষামূলক ছবি তৈরির ক্ষেত্রে।

আমিনুলদের অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত ছবিগুলো একটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। উদাহরণ হিসেবে আমিনুল ইসলামের 'রাখাল' (তেলরং, ১৯৫৪) (চিত্র : ১৪০) ছবিটি বিশ্লেষণ করা যায়। চিত্রটিতে পরিচিত বিষয় যেভাবে সংস্থাপিত হয়েছে, তা হুবহু বাস্তবের মতো না কিন্তু বাস্তবের অনুভূতি জাগায়। চিত্রে মানুষ, গাছ, গরু–সবই স্পষ্ট করে আঁকা। তবে এই অবয়বগুলোসহ পুরো পৃষ্ঠতলকে শিল্পী নানা জ্যামিতিক আকৃতিতে ভাগ করেছেন মূলত রঙের প্রাধান্যে। এর ফলে অবয়বগুলো কিছুমাত্রায় নানা অংশে ভাগ হয়েছে। ফলে বিষয়কে অনুভব করার আগেই জ্যামিতিক বিভাজনের জন্য চিত্রে সম্মুখ, মধ্য আর পশ্চাৎপটের গভীরতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। ফলে চিত্রের সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ, পশ্চাদভাগ একটি দুই মাত্রার সমতল পটভূমিতে একে অন্যের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে একটি তলের সৃষ্টি করে চিত্রে অগভীর ভাব বা shallowness-এর অনুভূতি জাগায় অথচ একই সময়ে বাস্তবতারও বোধ তৈরি করে। এই বৈশিষ্ট্যটি চিত্রশিল্পচর্চার ইতিহাসে প্রথম পাওয়া যায় পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাজে, শিল্প ইতিহাসবেত্তা এইচ এইচ আরনাসন (H H Arnason) যাকে বলেছেন চিত্রের নতুন বাস্তবতা, যা সেজাঁ (Cezanne) চেষ্টা করেছিল তাঁর চিত্রপটে মূর্ত করতে (Arnason, 1977 : 55)। বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শিল্প ইতিহাসবেত্তা এইচ এইচ অরনাসন লিখেছেন :

> ... Post-Impressionism...does offer the virtue of specifying the one element that Seurat, Cezanne, Gauguin and Van Gogh all had in common-their determination to move beyond the relatively passive registration of perceptual experience and give formal expression to the conceptual realm of ideas and intuitions (Arnason, 1977 : 52).

আরনাসন আরো লেখেন :

> Never would they work other than in direct contact with perceptual reality, if only through the medium of photography, but increasingly perception and its translation into art would cease to be an end unto itself and become a means toward the knowledge of form in the service of expressive content (Arnason, 1977 : 52).

আরনাসনের বক্তব্যের এই ধারণামূলক (conceptual) ভাব এবং রূপ নতুন বাস্তবতার উন্মোচন ঘটায়। কীভাবে এই নতুন বাস্তবতার উন্মোচন ঘটে, তা সেজাঁর ছবির বিশ্লেষণে স্পষ্ট হবে।

'Bacchanal' (1875-76) চিত্রকর্মে (চিত্র : ১৪১) সেজাঁ অবজেক্ট বা মানুষের অবয়ব এবং তার চারপাশের জায়গা কীভাবে একে অন্যের মাঝে প্রবিষ্ট হচ্ছে বা একে অন্যকে কীভাবে ছেদ করছে, তা অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই ছবিতে মানবশরীরের অংশ অনেক ক্ষেত্রে মেঘের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে (Arnason, 1977 : 56)।[৪] সেজাঁর আর একটি ছবি 'The Bay from L' Estaque' (1886) (চিত্র : ১৪২)-তে তিনি ছবির স্পেসকে রেনেসাঁ ও বারোক রীতির ছবির মতো পশ্চাদপসরণ করাননি পরিপ্রেক্ষিতের মাধ্যমে। ছবির সম্মুখভাগের ঘরবাড়ি এবং এর মাঝে মাঝে মেটে রং, হলুদ, লালচে কমলা ও সবুজে আঁকা গাছগুলোকে শিল্পী এমনভাবে এঁকেছেন, যেন তা দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বাড়ি, বাড়ির চিমনি, ছাদ, গাছপালা–এসবের মাঝে বায়ু চলাচলের মতো কোনো স্বাভাবিক দেশ বা স্পেস তৈরি করা হয়নি। সে কারণে এদের অবস্থানকে অস্বাভাবিক মনে হয়। এদের তুলনায় উপসাগরের নীল অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নিজেকে দুর্বোধ্য ও সমপ্রকৃতির (homogeneous) করে তুলেছে (Arnason, 1977 : 57)।[৫] এই ব্যাখ্যাগুলো থেকে বোঝা যায় কীভাবে ছবির পশ্চাৎপটের বিষয় আর সম্মুখভাগের বিষয় একে অন্যের মাঝে প্রবিষ্ট হতে পারে কিংবা ছবির মধ্যে দূরের বস্তু গভীরতার বোধ তৈরি না করে ছবিতে একটি অগভীর (shallow) ভাব আনে। এই বৈশিষ্ট্যের আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পিকাসোর (Picasso) 'Les Demoiselles D' Avignon' (1907) (চিত্র : ১৪৩)। এই ছবির রীতিগত কাঠামো (formal structure) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরনাসন লিখেছেন অগভীর, অভেদ্য দেশ, শারীরিক বিকৃতি (যেখানে সম্মুখ মুখমণ্ডলে নাকের পার্শ্বচিত্র অথবা মুখের পার্শ্বচিত্রে সম্মুখ আকৃতির চোখ স্থাপিত) এবং পুরো জমিন, অবয়ব এবং ভঙ্গুর পশ্চাৎপট সবকিছু একটি অসমতল, এলোমেলো, কাত হওয়া, অমসৃণ বৈশিষ্ট্য-সংবলিত পরস্পরছেদী জালের মতো বিন্যাস সৃষ্টি করেছে এই ছবিতে (Arnason, 1977 : 146)।[৬] এখানে 'shallow space'-এর সাথে আর একটি বিষয় উঠে এসেছে, তা হলো 'sealed space' বা অভেদ্য কিংবা অপ্রবেশ্য দেশ বা স্পেস। সেজাঁর কাজেও স্বাভাবিক দেশের (natural space) অন্তর্ধান অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় বা arial perspective-এর অনুপস্থিতিতে অভেদ্য দেশের আবির্ভাব হয়েছে। এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা প্রাসঙ্গিক হবে, সেটি হলো বিষয়কে গভীরতা প্রদান না করে সমতলে (plane) আঁকার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাস্কর্যের (tribal sculpture) প্রভাব ছিল পিকাসো, মাতিস বা গগাঁর ক্ষেত্রে। আরনাসন যেমন লিখেছেন, পিকাসো ট্রাইবাল ভাস্কর্যকে 'abstract plastic mass'

হিসেবে দেখেছেন। এই উপলব্ধি তাঁকে দেশ বা স্পেস-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেছে (Arnason, 1977 : 147)।

আমাদের দেশে '৫০-এর দশকের শিল্পীরা যখন নিরীক্ষামূলক কাজ শুরু করেন, তখন তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল ছবির বিষয় এবং একাধিক তলকে একীভূত (integrate) করা, প্রতিচ্ছেদ (intersection) করা এবং একটি অগভীর (shallow) সমতলভাব (flatness) তৈরি করা। এবং অনেক সময়েই দেশ (space) হয় অপ্রবেশ্য, অভেদ্য যাকে আরনাসন বলেছেন 'sealed space' অর্থাৎ যা স্বাভাবিক দেশ বা natural space নয়। বিষয়কে মূর্ত রেখেও চিত্রের পৃষ্ঠতল কতখানি অগভীর বা shallow হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কাইয়ুম চৌধুরীর 'মসজিদে লাল মাছ' (১৯৬১), তেলরং) (চিত্র : ১৪৪), যেখানে পুরো বিষয়টি স্থাপত্যসংক্রান্ত স্থান (architectural space)-এ নিবদ্ধ কিন্তু শিল্পী এই দালান, চত্বরের মাঝে সম্মুখভাগের ছোট জলধারকে (একটি নির্দিষ্ট জায়গা দখল করা সত্ত্বেও) সমতলভাবে এঁকেছেন অথচ সবকিছু একই সঙ্গে বাস্তবতার অনুভূতি জাগায়। যে দেশ বা স্পেস এই চিত্রে সৃষ্টি হয়েছে, তা অভেদ্য (sealed space), এখানে স্বাভাবিক দেশ (natural space) নেই। সত্যিকার অর্থে এই বাস্তবতা চোখে দেখা বাস্তবতা নয়, ধারণামূলক বাস্তবতা। আর একটি ছবি এখানে আলোচনায় আসতে পারে, সেটি হলো দেবদাস চক্রবর্তীর 'জড়জীবন' (তেলরং, ১৯৫৭) (চিত্র : ১৪৫)। সদ্য পাস করা (১৯৫৬) দেবদাসের এ কাজটি অনুশীলনধর্মী হলেও এখানে দেশ বা স্পেসকে অগভীর করা হয়েছে দূরের বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে। অনুশীলনধর্মী কাজ এবং বাস্তব বিষয় হলেও পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করা হয়েছে ছবিতে। এভাবে চিত্রে দেশ (space) আর তাতে বিষয়ের সংস্থান নিয়ে নতুন নির্মাণ শিক্ষানবিশি পর্যায়ে যে ভাবিত করেছিল, শিল্পীর ছবিটি তার প্রমাণ।

বিভিন্নজনের লেখা থেকে এ শিল্পীদের পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট রীতির প্রভাবের কথা জানা যায়। মাহমুদ আল জামান লিখেছেন :

> বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী ও রউফ শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে, স্কেচ করে এই ক্যাপিটেল রেস্টুরেন্টে এসেই আড্ডা ও দুপুরের আহার সেরে নিতেন। তখন ভ্যান গঘ, গগাঁ সেজান–এঁদের হৃদয়মন অধিকার করেছিল। এঁদের জীবনযাপন ও সৃষ্টির প্রভাময় উদ্যান দ্বারা এঁরা আবিষ্ট ছিলেন (মাহমুদ, ২০০৪ : ২৭)।

সৈয়দ আজিজুল হক লিখেছেন :

> ভ্যান গঘ অথবা গগাঁ কিংবা তুলোলোত্রেক ছিল তখন সকলেরই আদর্শ। রোমান্টিসিজমের চূড়ান্ত অনুভব ছিল তাঁদের জীবনেও। ভ্যান গঘের জীবন-অবলম্বী চলচ্চিত্র *লাস্ট ফর লাইফ*, গগাঁর *নোয়া নোয়া জার্নাল*, লোত্রেকের *মুল্যাঁ রুজ* নিয়ে উন্মাদনা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। মুর্তজা বশীর কি অঙ্কনে, কি জীবনযাত্রায় এসবের প্রতিফলন ঘটাতে চাইতেন।

তাতে অঘটনও কিছু কিছু ঘটত। কিন্তু তাতে তাঁদের কারোরই কোনো অনুশোচনা ছিল না। আঁকার প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁদের সকলকে এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫ : ৪১)।

চিত্রের সম্মুখতল আর পশ্চাদতলের প্রতিচ্ছেদ, অগভীর পৃষ্ঠতল তৈরি, সরলীকরণ-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইত্যাদি কৌশলের চর্চার প্রমাণ মেলে শিল্পীদের নিজেদের উক্তি থেকে। যেমন মুর্তজা বশীর লিখেছেন :

...সবচেয়ে বেশি আমাকে অভিভূত করে পরিতোষ সেনের কাজগুলো। আমার মনে হলো, যা আমি বলতে চাচ্ছি তা একমাত্র পরিতোষ সেনের কাছ থেকেই আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব। পরিতোষ সেনের কাজগুলোয় ছিল রঙের খুব সীমিত ব্যবহার, ফর্মের সরলীকরণ এবং একটা ফ্ল্যাট সারফেস। সমতলভূমিতে অনেকটা দ্বিমাত্রিকভাবে চিত্রগুলো চিত্রিত করা হয়েছে। চিত্রগুলো ছিল প্যালেট নাইফে আঁকা। প্যালেট নাইফ দিয়ে রেখা, ফর্ম তৈরি এবং রংকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

আমি সেই টেকনিকে এতটাই অভিভূত হয়ে যাই যে সেভাবেই কাজ শুরু করি। ফলে, আমি কিছুটা পরিতোষ সেন দ্বারা অনুপ্রাণিত হই এবং কিছুটা অনুকরণও করি। সেই সময় আমি প্যালেট নাইফ দিয়ে বেশ কিছু ছবি আঁকি' (মুর্তজা, ২০১৪ : ৬০) (চিত্র : ১১৯)।

উল্লেখ্য, ভারতের শিল্পী পরিতোষ সেন (১৯১৮-২০০৮) এবং ক্যালকাটা গ্রুপের (১৯৪৩) শিল্পীদের উদ্দিষ্ট ছিল ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, ফোবিজম এবং কিউবিজমের রীতিকে নিয়ে নিরীক্ষা করা এবং চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা (পরিতোষ, ২০০২ : ১৩) (চিত্র : ১৪৬) । পরিতোষ সেন ক্যালকাটা গ্রুপের সেই সময়ের ভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন ছবির সমতল জমি, রেখার প্রাধান্য, স্পেসের বিভাজন ইত্যাদিকে তাঁরা নতুন মূল্যবোধের অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (পরিতোষ, ২০০২ : ১৩)। মুর্তজা বশীর ১৯৫৬ সালে ইতালি যাওয়ার পর ছবির কাঠামো এবং স্পেস নিয়ে তাঁর একটি নতুন উপলব্ধি সম্পর্কে লেখেন :

একটা জিনিস তখন অনুভব করলাম, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে যা বুঝি সেটি আমার কাছে নতুনভাবে দেখা দিল। ...তথাকথিত ব্যাকগ্রাউন্ড বলে কোনো কিছু নেই। সবকিছুই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি চেয়ারের ওপর একটি লোক বসে রয়েছে। তার পেছনের জানালা যেমন সত্য তেমনি জানালার সামনে একজন বসে আছে এটাও সত্য (মুর্তজা, ২০১৪ : ৬২)।

১৯৫৪ সালে ফ্লোরেন্সে থাকার সময় আমিনুল ইসলাম তাঁর নতুন রীতিতে আঁকা ছবি সম্পর্কে লিখেছেন, 'এদের কোনোটাই একাডেমিক পদ্ধতিতে নয়। এগুলো আমার ছবি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণার নতুন পর্যায়, আধা বিমূর্ত সরলীকরণ এবং জ্যামিতি ও ছন্দের রাখিবন্ধন' (আমিনুল, ২০০৩ : ৭৯)।

এভাবে আমাদের দেশের '৫০-এর দশকের শিল্পীরা পাশ্চাত্যের পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম, ফোবিজম প্রভৃতি রীতির বিমূর্তায়নের কৌশলকে আমাদের চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের সাংস্কৃতিক

বিষয়াবলিকে উপস্থাপনার কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। এই অন্তর্ভুক্তিকরণ '৪০-এর দশকের শিল্পীদের অর্জনের পর আমাদের চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আর একটি পর্যায়ে উন্নীত করে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের চিত্রচর্চা বা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এই আত্তীকরণ সত্যই আমাদের সমৃদ্ধ করেছে, নাকি এটা পাশ্চাত্য অধিপত্যের লক্ষণ। এর উত্তরে পার্থ মিত্রের ভাষায় বলা যায়, প্রান্তিক অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও শিল্পীরা সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করে তাকে শক্তিশালী করতে পারে (Partha, 2007 : 9)।[৭] এ ক্ষেত্রে পার্থ মিত্র আরো যোগ করেন, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান নিজস্ব পরিচয়কে বাতিল করে দেয় না, বরং তাকে আরো সমৃদ্ধ করে (Partha, 2007: 9-10)।[৮] যেমন পাশ্চাত্যের এক্সপ্রেশনজিম ও কিউবিজম শিল্প আন্দোলন; যেখানে অপশ্চিমা (non-western) সাংস্কৃতিক উপাদান নতুন ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (Partha, 2007 : 12)। পার্থ মিত্রের এই বক্তব্য অনুযায়ী পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট, কিউবিস্ট প্রভৃতি রীতি দ্বারা প্রভাবিত আমাদের শিল্পীদের কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির চর্চা একটি নতুন চিত্রভাষায় এ অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতা এবং বিষয়াবলিকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের চিত্রচর্চার সমৃদ্ধিকেই প্রকাশ করে।

'৫০-এর দশকের ২য় পর্ব জুড়ে সরলীকৃত রূপ, বিষয়, পটভূমির প্রতিচ্ছেদ, অগভীর এবং সমতল পৃষ্ঠতল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসংবলিত অবয়বনির্ভর বা কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির চিত্র নির্মাণ করেছেন আমিনুল, মুর্তজা, হামিদুর, কিবরিয়া, কাইয়ুম, রাজ্জাক, দেবদাস, বাসেত, জাহাঙ্গীর প্রমুখ। '৬০-এর দশকেও এই রীতি প্রবহমান থেকেছে। চিত্রচর্চায় পুরোপুরি অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির শুরু '৫০-এর দশকের শেষ পর্যায়ে থেকে। মূলত আমিনুল ইসলামই এই প্রক্রিয়ায় অধিকসংখ্যক চিত্র রচনা করেছেন '৫০-এর শেষ থেকে পুরো '৬০ দশকজুড়ে, মোহাম্মদ কিবরিয়া '৬০-এর দশকের শুরুতে বিমূর্ত রীতি শুরু করেন চিত্রকলা ও ছাপচিত্র উভয় মাধ্যমে। রাজ্জাক, বাসেত, হামিদুর, রশিদ, জাহাঙ্গীর, দেবদাস, মুর্তজা–এঁরা সবাই বিমূর্ত চিত্রচর্চা '৬০-এর দশকেই শুরু করেন। তবে এ শিল্পীদের অধিকাংশই বিমূর্ত রীতি ব্যাপকভাবে চর্চা করেন '৭০ ও '৮০-এর দশকে, যে সময় এই অভিসন্দর্ভের ব্যাপ্তির মধ্যে পড়ে না।

শিল্প ইতিহাসবেত্তা আবুল মনসুর '৫০-এর দশকের শিল্পীদের শিল্পকর্মের বিশ্লেষণে লিখেছেন :

> পঞ্চাশের শিল্পীরা তাঁদের গুরুদের অনুসরণ করেননি, ...পঞ্চাশের শিল্পীরাও নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রসারিত সুযোগে দলেবলে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলেন, কেউ ফ্রান্সে, কেউ ইতালিতে বা স্পেনে, কেউবা যুক্তরাষ্ট্রে। এঁরা এসে পূর্ব পাকিস্তানি শিল্পের একটা নতুন চেহারা উপস্থাপন করলেন, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বিমূর্ততাই যার মূল চরিত্র। এই পরিচয়মুক্ত পক্ষ-অবলম্বনহীন শিল্পে পাকিস্তানি শাসকদের খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, অতএব পঞ্চাশ-

> ষাটের দশকজুড়ে পাকিস্তাব্যাপী বিমূর্ত শিল্পের ব্যাপক বিস্তারের পেছনে এটি কোনো কার্যকারণ কি না সেটি একটি অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে (আবুল মনসুর, ২০১৬ : ১২৫)।

বক্তব্যটিকে মেনে নিলে '৫০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে '৬০-এর দশক পর্যন্ত আঁকা আমিনুল, কিবরিয়া, মুর্তজা, হামিদুর, রাজ্জাক, রশিদ, কাইয়ুম, দেবদাস, বাসেত প্রমুখের অবয়বনির্ভর (অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অবয়ব) বিমূর্ত রীতিতে আঁকা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চিত্রকে মূল্যায়নের অবকাশ থাকে না। এই চিত্রগুলোর বিষয় বাংলার মানুষ, প্রকৃতি যা জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দিনের ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে। কাজেই আমিনুলরা যে চল্লিশের শিল্পীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ছবি এঁকেছেন, তা-ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। চিত্রসমালোচক নজরুল ইসলামের মতে, 'বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের কোনো কোনো বিশ্লেষক মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রতন্ত্র এবং সামরিক শাসনের কারণে এ দেশের শিল্পীরা ব্যাপকভাবে নির্বস্তুক আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ব্যাখ্যাটি আংশিক গ্রহণযোগ্য। কেননা আমরা দেখি জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দীন আহমেদ দিব্যি মানব-অবয়বভিত্তিক ছবি এঁকে গেছেন' (নজরুল, ২০১২ : ১৯)। পশ্চিম পাকিস্তানেও অবয়বনির্ভর ছবির চর্চা হয়েছে শুরু থেকে। আবদুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৪-১৯৭৫) (চিত্র : ১৪৭) থেকে শুরু করে ফাইজ রাহামিন (১৮৮০-১৯৬৪), আল্লাহ বক্স (১৮৯৫-১৯৭৮), হাজি শরীফ (১৮৮৯-১৯৭৮), সৈয়দ হাসান আসকারী (১৯০৭-১৯৬৪), মোহাম্মদ হুসেইন হানজরা (১৯১১-১৯৮২), অজ্জির জুবি (১৯২২), ইসমাইল গুগলী (১৯২৬), আন্না মোলকা আহমেদ (১৯১৭-১৯৯৪) (চিত্র : ১৪৮), জুবেইদা আগা (১৯২২-১৯৯৭), শাকির আলি (১৯১৬-১৯৭৫), সাদেকিন (১৯৩০-১৯৮৭) (চিত্র : ১৪৯), জামিল নাক্স (১৯৩৯-২০১৯) প্রমুখ শিল্পী সকলেই অবয়ব নিয়ে চিত্র রচনা করেছেন। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত মোহাম্মদ কিবরিয়ার 'তিন আত্মা' (চিত্র : ১৫০) ও দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজী আবদুল বাসেতের 'মা ও শিশু' (চিত্র : ১৫১) ছবি দুটি মানুষের অবয়বনির্ভর বিমূর্ত রীতিতে করা। শুধু তা-ই নয়, আবদুল বাসেতের 'মা ও শিশু'র কম্পোজিশন জয়নুল আবেদিনের 'মা ও শিশু'র (চিত্র : ৩৪) কথা মনে করিয়ে দেয়। এই প্রদর্শনীতে আমিনুল ইসলামের 'দুর্গত' ছবিটি (চিত্র : ১৫২) প্রদর্শিত হয় এবং এই ছবিটি জয়নুলের 'চার মুখ' (চিত্র : ৩৩)-এর বিন্যাসের সঙ্গে মিলে যায়। এস আমজাদ আলীর লেখা প্রকাশিত হয় ওই প্রদর্শনী নিয়ে ১৯৫৯ সালে 'পাকিস্তান কোয়ার্টার্লি'তে। সেখানে তিনি লেখেন যে ঢাকার এবং লাহোরের শিল্পীদের কাজকে স্পষ্টভাবে দুটি আলাদা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুই অঞ্চলের স্কুল ও শিক্ষকদের প্রভাব, বিশেষভাবে লাহোর ফাইন আর্ট বিভাগের মিসেস আহমেদ এবং ঢাকায় জয়নুল আবেদিনের প্রভাবের জন্য। তেলরঙে ইমপ্যাস্টো টেকনিক সাদাসিধা গ্রাম্য দৃশ্যের বাস্তবধর্মী চিত্র অনুশীলন ছিল লাহোরের বিশেষত নারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পীদের লাহোর ফাইন আর্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ ছিল। কালো রঙের সরু লাইনের

ব্যবহারে ইম্প্রেশনিস্টিক রীতিতে জলরঙে ভূমি এবং নদীর দৃশ্য অঙ্কন ছিল ঢাকার শিল্পীদের জন্য সাধারণ বিষয়। তিনি আরো লেখেন, লাহোরের নারী শিল্পীদের বিমূর্ত চিত্রের গুণাগুণ সেজাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে ঢাকার শিল্পীদের সব কাজই ইম্প্রেশনিস্টিক রীতিতে ভূদৃশ্যের চিত্রায়ণ ছিল না। এমনকি ভূদৃশ্যের চিত্রায়ণে, কিছু শিল্পী (যেমন নিতুন কুণ্ড) বিমূর্ত আকার বা ছন্দোবদ্ধ নকশার অন্বেষণ করেছেন। অন্যদিকে কিবরিয়া, বাসেত, আমিনুল ইসলাম এবং অন্যরা স্পষ্টত বিমূর্ত রীতির ব্যবহার করেছেন। রশিদ চৌধুরী শাগালের সুরিয়ালিজম রীতিতে প্রভাবিত হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মুর্তজা বশীর আকার, দেশ ইত্যাদির আধুনিকতাবোধকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'ইতালীয় প্রিমিটিভ' রীতির (style of Italian primitive) ব্যবহার করেছেন (S Amjad, 1959 : 29)।[৯]

এখানে আরেকটি বিষয়ের আলোচনা জরুরি, সেটি হলো কামরুল হাসান, জয়নুল আবেদিনের চিত্রে রেখার ব্যবহার নরম। তুলির রেখায় ছন্দায়িত, তরঙ্গায়িত ভাব আছে। এ ছাড়া ছবির একাধিক তলকে (পশ্চাৎপট, সম্মুখভাগ, মধ্যভাগ), একটি তলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে খুব বেশি জটিলতার (complexity) সৃষ্টি হয়নি তাঁদের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে আমিনুলদের পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট এবং কিউবিস্ট রীতির প্রভাবে জ্যামিতিকতার প্রাধান্য, চিত্রের স্পেস বা দেশ-এর অখণ্ডতা রক্ষা এবং মাধ্যমগতভাবে তেলরং, অ্যাক্রেলিক, প্যালেট নাইফের ব্যবহার, ইমপ্যাস্টো কৌশলে রঙের প্রয়োগ ও রঙের মাধ্যমে বুনট তৈরি প্রভৃতি করণকৌশল ছবিতে দৃঢ়তার অনুভূতি বেশি প্রকাশ করতে সহায়তা করেছে। জলরঙে তুলির আঁচড়ে যা হয়ে ওঠে না। তবে কাইয়ুম চৌধুরী ও রশিদ চৌধুরী হয়তো এই দুইয়ের মাঝে একটি যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন তাঁদের চিত্রে। তাঁরা লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে (রং, অলংকার ইত্যাদি) নিপুণ দক্ষতায় পাশ্চাত্যঘেঁষা বিমূর্ত রীতিতে অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমেদের বাংলার সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতি এবং জয়নুল ও কামরুলের ক্ষেত্রে লোকশিল্প আঙ্গিক ব্যবহার করার সাথে আত্মপরিচয় নির্মাণের যোগসূত্র ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ সময়ে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে আত্মজাগরণের কালে, সাধারণ মানুষ আর বাঙালি সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার মধ্য দিয়ে জয়নুল, কামরুল আর সফিউদ্দীনের যে চেতনা জাগ্রত হয়, তার সঙ্গে তাদের শিল্পমানসও জড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময়ে তাঁদের এই চেতনা আরো দৃঢ় এবং পরিণত হয়ে বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয়ের পথ বেছে নেয় বাঙালি ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির মাঝে। এ ঘটনাটি ঘটে তাদের বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে একটি পরিণত পর্যায়ে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাও যুক্ত ছিল। অন্যদিকে '৫০-এর শিল্পীরা অর্থাৎ আমিনুলরাও নিরীক্ষাধর্মী কাজ শুরু করেন পূর্ব পাকিস্তান পর্যায়ে এবং তখনো এ দেশের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের নিজেদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলছিল। আমিনুলরা যে বাঙালি সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করেছেন, তা নয়। তার প্রমাণ তাঁরা এ দেশের প্রকৃতি

আর সাধারণ মানুষকেই বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তবে তাঁদের আগ্রহ ছিল পাশ্চাত্য চিত্রচর্চার কিছু নিরীক্ষাপ্রবণতার দিকে, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ক্যালকাটা গ্রুপের প্রসঙ্গ আরেকবার উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যালকাটা গ্রুপের শিল্পীরা এই আঙ্গিকের অন্বেষণকে তৎকালীন বাস্তবতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলানোর কথা বলেছেন (মৃণাল, ২০০৫ : ২৬৩)। ক্যালকাটা গ্রুপের মতো আমিনুলরা এক সাথে আঙ্গিক-ভাবনা নিয়ে কোনো সংগঠন গড়ে না তুললেও বা নির্দিষ্ট কোনো মতাদর্শের অধীনে এক না হলেও তাদের প্রত্যেকেই ছবির নতুন আঙ্গিক-ভাবনা নিয়ে কাজ করেছে এবং এই ভাবনা থেকেই আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয় অবয়বধর্মী এবং নিরাবয়ব বিমূর্ত চিত্ররীতি নিয়ে।

এবার আসা যাক অপ্রতিনিধিত্বশীল বা নিরাবয়ব বিমূর্ত রীতির চিত্র আলোচনায়। বিমূর্ত প্রকাশবাদ (Abstract Expressionism) আমাদের দেশের পঞ্চাশ দশকের শিল্পীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে (আবুল মনসুর, ২০১৬ : ১২৭)। এই প্রভাবে আমাদের দেশের শিল্পীরা অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত চিত্রচর্চা শুরু করেন। যেমন আমিনুল ইসলামের 'ভুলে যাওয়া সুরের ছন্দ' (চিত্র : ১১৪), হামিদুর রাহমানের 'আমার প্রিয় রুমাল' (চিত্র : ১১৬), মুর্তজা বশীরের 'দেয়াল-৪৮' (তেলরং, ১৯৬৭) (চিত্র : ১৫৩), কাইয়ুম চৌধুরীর 'গোধূলি-১' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৫) (চিত্র : ১৫৪), আবদুল বাসেতের 'ঝরাপাতায় শিশিরবিন্দু' (তেলরং, ষাটের দশক) (চিত্র : ১৫৫) ও 'প্রতিবিম্ব' (চিত্র : ১৩৪), দেবদাস চক্রবর্তীর 'কম্পোজিশন' (চিত্র : ১৩৬) এবং মোহাম্মদ কিবরিয়ার ১৯৬৩ সালে করা একটি তেলচিত্র, যার শিরোনাম পাওয়া যায়নি (চিত্র : ১৫৬) প্রভৃতি।

বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্প আন্দোলন নিউইয়র্কে বিশ শতকের '৪০-এর দশকে গড়ে ওঠে। '৫০ ও '৬০-এর দশকে আমাদের দেশের শিল্পীদের বিমূর্ত প্রকাশবাদ রীতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার পেছনে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চেয়ে বেশি প্রভাব ছিল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিমূর্ত শিল্পকে রাজনীতিকরণের আওতার মধ্যে নিয়ে আসা। এ কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনকে কী ভূমিকায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গে স্বল্প পরিসরে হলেও একটু আলোচনা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ইউরোপ ঠান্ডা লড়াই বা যুদ্ধের সম্মুখীন হয় রাশিয়ার নেতৃত্বে থাকা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং আমেরিকার নেতৃত্বে থাকা পুঁজিবাদী পশ্চিমের মধ্যে (B V Rao, 1989 : 229)।[১০] দুই পরাশক্তির অতিশয় সরাসরি আক্রমণাত্মক বিরোধিতার ক্ষেত্রে উচ্চতর সামরিক, কূটনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক কৌশলসমূহ আশুর্কতব্য হয়ে দাঁড়ায় পূর্ণ বিজয়ের জন্য। এ ছাড়া সাম্যবাদ এবং পুঁজিবাদের মধ্যে যে ভাবাদর্শগত দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ছিল, তা প্রকাশ পায় আধুনিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে, যেমন–শিল্প, সংগীত ও সাহিত্য (Battaglia, 2008 : 1)।[১১] ফলে এই যুগের আভাঁ-গার্দ (Avant-garde) আন্দোলন (সবচেয়ে অগ্রগামী, নতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ও ভাবনা), যার দায়ভার ছিল আধুনিক শিল্প, সংগীত ও সাহিত্যসৃষ্টির, সেই আভাঁ-গার্দ আন্দোলনেরও কৌশলগত অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্ব ছিল দুই পক্ষের জন্য

(অর্থাৎ সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ), যদিও অনেক সময়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিল্পী নিজেই অজ্ঞাত থেকে যেত তার শিল্পের এই রাজনীতিকরণ সম্পর্কে (Battaglia, 2008 : 1)।[১২] এখন প্রশ্ন আসে, বিমূর্ত প্রকাশবাদ শিল্পের কোন বৈশিষ্ট্যগুলো পুঁজিবাদীদের জন্য ঠান্ডা যুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত হলো। 'Oxford Dictionary of Art'-এ বিমূর্ত প্রকাশবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> The painters embraced by the term shared a similarity of outlook rather than of style-an outlook characterized by a spirit of revolt against affiliations with traditional styles or prescribed technical procedures, renunciation of the ideal of a finished art product subject to traditional aesthetic canons, an aggressive spirit of self-determination, and a strong demand for spontaneous freedom of expression (Chilvers et al. 1988 : 2).

বিমূর্ত প্রকাশবাদের বৈশিষ্ট্যকে রাজনীতির আওতায় নিয়ে আসার ব্যাখ্যা নানাভাবে হয়েছে। ম্যানফ্রেড জে হলার (Marfreed J Holler) এবং বারবারা ক্লোস-উলমানের (Barbara klose-Ullmann) বক্তব্য হলো, সিআইএ মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট এবং কংগ্রেস অব কালচারাল ফ্রিডম এই দৃশ্যপটের প্রধান খেলোয়াড় হলে, বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পীরা সেই খেলার ঘুঁটি এবং শিল্পসমালোচক ক্লিমেন্ট গ্রিনবার্গ (Clement Greenberg) এবং হ্যারল্ড রজেনবার্গ (Harold Rosenberg) হলেন সেই শিল্পীদের মুখপাত্র। এই দৃশ্যপটে প্রধান ভূমিকা যাঁদের ছিল তাঁরা শিল্পীদের সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন এবং তাঁদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল শিল্পীদের কাজ এবং এই কাজের পেছনে ভাবাদর্শের ওপর। পুরো বিষয়টিতে একটা আপাতবিরোধী ভাবনা কাজ করছিল, কারণ ব্যক্তিকতাবাদ ছিল বিমূর্ত প্রকাশবাদের ভিত্তি এবং এই ব্যক্তিকতাবাদের জন্য এই শিল্পকে সমাজতন্ত্রের সমষ্টিগতভাবের শিল্পের বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছিল (Holler & Ullmann, 2010 : 8)।[১৩]

তিরিশের দশকে অনেক বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পীর রাজনৈতিক শিকড় বা ভিত্তি (political roots) ছিল মার্ক্সবাদে, যদিও চল্লিশের দশকে এতে পরিবর্তন আসে (Holler & Ullmann, 2010 : 10)।[১৪] এর কারণ হিসেবে থমাস বেনডার (Thomas Bendar) বলেছেন, আমেরিকায় বামপন্থীদের জন্য অনেকগুলো বিধ্বংসী রাজনৈতিক মোহভঙ্গ যেমন, ১৯৩৬-৩৮ সালের মস্কো শো ট্রায়ালস (Moscow show trials), ১৯৩৯ সালের হিটলার-স্টালিন প্যাক্ট (Hitler-Stalin Pact) এবং ১৯৪৫ সালের আণবিক বোমা প্রভৃতি বিষয় শিল্পীদের জন্য অরাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। এই শিল্পীরা যদিও '৩০-এর দশকে সমাজের সংকট ও আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের স্বপ্নের দ্বারা সামাজিক দায়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, তথাপি তাঁরা নিজেদের এই রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং অপ্রতিনিধিত্বশীল শিল্পভাষার সম্ভাবনাকে অন্বেষণ করেছিলেন। এই অন্বেষণকে সহজ করেছিল মেয়ার শ্যাপিরোর (Meyer Schapiro) ১৯৩৭ সালে Marxist Quarterly-তে প্রকাশিত 'The Nature of Abstract Art' প্রবন্ধটি,

যেখানে বিমূর্ত শিল্পে মানবতা এবং এর সাথে সামাজিক অভিজ্ঞতার যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে (Bendar, 1984)।[১৫] শ্যাপিরো তাঁর সেই প্রবন্ধে লিখেছেন, বিষয়ের সব বর্ণনাই, হোক তা অবিকল, এমনকি ফটোগ্রাফও মূল্যবোধ, কৌশল এবং দৃষ্টিকোণ থেকে নির্গত হয়, যা ভাবমূর্তিকে (Image) আকার প্রদান করে এবং বিষয়বস্তুকে নির্ধারণ করে। অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতার দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত বা শর্তহীন 'শুদ্ধ শিল্প' বলে কিছু নেই। সকল কল্পনা এবং আকারগত গঠন, এলোমেলো বা হিজিবিজি রেখাঙ্কনকেও আকার দেয় অভিজ্ঞতা এবং অনন্দনতাত্ত্বিক সম্পৃক্ততা (Schapiro, 1979 : 196)। তিনি আরো লেখেন, তাৎক্ষণিকভাবে রচিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আকারের বিকৃতি বা প্রচ্ছন্ন করে বিমূর্ত রীতির চর্চার মধ্য দিয়ে শিল্পী তার অবদমিত অন্তর্জগতের ইঙ্গিতময় বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। তবে শিল্পীর কল্পনা নির্মাণের কৌশল শিশু কিংবা মানসিক রোগীর থেকে ভিন্ন, কারণ শিল্পীর প্রধান পেশা হলো মানবীয় মূল্যবোধের সচেতন উৎস থেকে উদ্ভাবন করা। এরই সূত্র ধরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতি মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দী, এর বাস্তবধর্মী চিত্র, যুক্তিবাদ এবং উদ্ভাবন, বস্তুতন্ত্র ও কৌশলের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অলংকরণকে গ্রাহ্য করেছে, কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপস্থাপনকে বিকট বা বীভৎস হিসেবে বিবেচনা করেছে। অন্যপক্ষে বিমূর্ত শিল্পীরা আপেক্ষিকভাবে উদাসীন ছিল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জ্যামিতিক মোটিফের প্রতি। কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পের বিকৃত, উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত অবয়বের সাথে আধুনিক একদল শিল্পীরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে (Schapiro, 1979 : 199-200)।[১৬] এ ছাড়া অনেক বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পীরা ছিল কার্ল ইয়ুংয়ের (Cart Jung) অনুসারী। ইয়ুংয়ের মতবাদ বিমূর্ত প্রকাশবাদী শিল্পীদের প্রভাবিত করেছে এবং রাজনীতিকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই প্রভাব এবং রাজনীতিকরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যানফ্রেড জে হলার এবং বারবারা ক্লোস-উলমান লিখেছেন, ইয়ুংয়ের অনুসারী শিল্পীরা বিশ্বাস করত যৌথ অবচেতন হলো বিশ্বজনীন এবং সমগ্র মানবজাতিতে অভিন্ন এবং শিল্পের কাজ হলো স্থানীয় নয় বরং বিশ্বজনীনতায় রূপান্তরিত করার জন্য সেই গূঢ়লেখকে আবিষ্কার করা। অবচেতন গিয়ে শিল্পীরা অভিজ্ঞতার গভীর থেকে রূপক, প্রতীক বের করে আনেন, যা বিশ্বজনীনতা ধারণ করে। এটাই ছিল বিশ্বজনীনতার আধ্যাত্মিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি এবং যুদ্ধ-পূর্বকালীন আমেরিকার বিচ্ছিন্নতাবাদীভাবের মুক্তি–যা ছিল শিল্পকে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে ব্যবহার করার পূর্বশর্ত (Holler & Ullmann, 2010 : 10)।[১৭] ১৯৫৬ সালের মধ্যে MoMa-র আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ৩৩টি প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যার মধ্যে ভেনিস বিয়েনালে অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত ছিল (Holler & Ullmann, 2010 : 7)। MoMa-র আন্তর্জাতিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি ঘটে, তাকে ইভা কক্রফ্ট (Eva Cockroft) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, শিল্পের জগতে বিমূর্ত প্রকাশবাদ এই প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আদর্শ রীতি গঠন করেছিল। বিমূর্ত প্রকাশবাদ ছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বৈশিষ্ট্য যেমন নিয়ন্ত্রিত, ঐতিহ্যগত এবং সংকীর্ণতার নিখুঁত বৈপরীত্য। এটা ছিল নতুন, সতেজ

এবং সৃষ্টিশীল, শৈল্পিক দিক দিয়ে আভাঁ-গার্দ এবং আমেরিকাকে প্যারিসের সাথে প্রতিযোগিতায় হালনাগাদ হিসেবে দেখাতে পেরেছিল (Cockroft, 2000 : 150-51)।[১৮]

বিমূর্ত প্রকাশবাদ শিল্প আন্দোলন নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে রাজনীতিকরণের বিষয়ে একটু বিস্তৃত পরিসরে এখানে আলোচনা করা হলো এ কারণে যে, এই রাজনীতিকরণের কারণে এই শিল্পরীতি বা শিল্প আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে এবং এই রীতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। এই রীতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন 'মুক্ত প্রকাশ' (free expression), 'বিশ্বজনীনতা' (universalism), 'স্বাতন্ত্র্যবাদ' (individualism) প্রভৃতি শিল্পীকে আকৃষ্ট করে। '৫০ ও '৬০-এর দশকে আমাদের শিল্পীরাও এই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে এটা বলা অমূলক হবে না যে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চেয়ে বিশ্বব্যাপী বিমূর্ত প্রকাশবাদের আধিপত্য আমাদের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এই রীতিকে তাদের চিত্রচর্চার সাথে অঙ্গীভূত করে নিতে। আমাদের শিল্পীরা বিমূর্ত প্রকাশবাদ শিল্পরীতির আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার পেছনে যে রাজনীতি ক্রিয়াশীল ছিল যে সম্পর্কে সচেতনতা থেকে এই রীতি গ্রহণ করেননি। তাঁরা আন্তর্জাতিক আধুনিক শিল্পভাষা হিসেবে নিজেদের দেশের চিত্রচর্চায় অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন এই রীতিকে। পিকাসো এবং অন্য আধুনিক শিল্পীরা যেমন 'আদিম' শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে এর সমাজ-প্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে তাদের শিল্পে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। কলিন রোডসের (Colin Rhodes) বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন, শিল্পীরা যখন আদিম শিল্পকে ব্যবহার করেন তখন তারা একটি সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন, তবে তা আদিম শিল্পকে কেন্দ্র করে না, বরং তাদের নিজেদের সমাজের সভ্য নিয়মকে উদ্দেশ্য করে। এটা তারা করেছিল হয় সমাজ পরিবর্তনের জন্য অথবা পশ্চিমের প্রতিষ্ঠিত শিল্পচর্চাকে সমালোচনা করার জন্য (Rhodes, 1994 : 110)।[১৯] কলিনের আরো কিছু বক্তব্য এখানে উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। যেমন তিনি লিখেছেন, পিকাসোর ডেমওয়াজেল (Demoisselles) চিত্রকর্মের নারীরা ঔপনিবেশিক 'আদিমের' 'অন্য'-এর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, এই 'অন্য' পশ্চিমা সংস্কৃতির নিজস্ব, যে সংস্কৃতির ভিত্তি ভয়ংকর যৌনতা (91)[২০] এবং কলিনের আরো একটি বিশ্লেষণ হলো, কির্চনারের (Kirchner) আদিমতাকে ভৌগোলিক অথবা ঐতিহাসিক সুদূর আদিমের সাথে ভাববিনিময় হিসেবে দেখা উচিত হবে না। এটা তাঁর বোহেমিয়ান জীবনের অংশ এবং এর মাধ্যমে ইউরোপের বাইরের অঞ্চলের শিল্পভাষা নিয়ে এমন একটি ভাবমূর্তি (image) তৈরি করেছে, যা নিজেই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের থেকে ভিন্ন (103)।[২১] অর্থাৎ 'আদিম' শিল্পকে ইউরোপের শিল্পীরা তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। বিমূর্ত প্রকাশবাদকেও আমাদের দেশের শিল্পীরা নিজেদের প্রেক্ষাপটে এভাবেই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এর সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি নয় বরং শৈল্পিক গুণাবলিকে নিজেদের সংস্কৃতিতে অভিযোজন করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমাদের চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে নতুন ভাষা সংযোজন করেছেন।

বিষয়টিকে আর একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অর্থাৎ '৫০-এর দশকের শেষ পর্ব থেকে '৬০-এর দশক পর্যন্ত এখানে বিমূর্ত চিত্রভাষাচর্চার স্বরূপ কেমন ছিল? ১৯৬১ সালের Contemporary Art in Pakistan নামক জার্নালে বি কে জাহাঙ্গীর (B K Jahangir) আমিনুল ইসলামের বিমূর্ত চিত্রকর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন :

> Though Aminul Islam's researches in the field of form are intensive, he does not fall into formalism. He is bound up with reality. He delights in interwoven [sic] of form and sense emerging from a fleeting study of phenomena of nature or of daily life. From a given situation he proceeds, sometimes like a musician, using memory towards building up a harmonious relationship. ...Sometimes, nature becomes a starting point, and from there he develops an internal image of a fleeting phenomenon, thus blending the entire range of formal and creative possibilities. *In before the Flight*, the colour seems to leap out from the gay whirl of the paint, the horizontal strokes refer to the rising rhythm of the butterfly, vibrating in high notes ...
>
> Aminul Islam's sense of exploration sometimes makes him a pretender of actual experience (B K Jahangir, 1961 : 10).

মাহমুদ আল জামান '৬০-এর দশকে আবদুল বাসেতের বিমূর্ত চিত্রকলার ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

> এই পর্বে বাসেত বিশেষত ১৯৬৪ সালে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত বিষয় ছন্দোময় হয়ে উঠলেও তিনি সময়ের উত্তাপকে অস্বীকার করতে পারেননি। তৎকালে দেশে বিরাজমান স্বৈরশাসন, নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ষাটের দশকের মধ্য পর্যায় থেকে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহে পালাবদলের হাওয়া লেগেছিল। সচেতন বাসেতের হৃদয়মনে তা প্রচ্ছন্ন দাগ কেটেছিল।
>
> ...তাঁর সামাজিক অঙ্গীকারের চেতনা ছিল ছবিকে ঘিরে। তাঁর সৃষ্টিতেই তিনি সমাজের তমসাকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সময়ের কম্পোজিশন-সিরিজের চিত্রগুচ্ছে তিনি ধূসর রং-ব্যবহারের মাধ্যমে সময়কে বিম্বিত করেছেন। এই ধূসরতা নব অর্থযোজনা করেছিল তাঁর এই চিত্রগুচ্ছে। ...বাসেত বিমূর্ত ধারাকে আশ্রয় করে এই ধূসর সময়কে অঙ্কনে প্রয়াসী হলেন (মাহমুদ, ২০০৪ : ৩০)।

ওসমান জামাল আমিনুলের 'Transformation' চিত্রমালার (চিত্র : ১৫৭) ব্যাখ্যায় লিখেছেন, '১৯৬৭ সালের Transformation সিরিজের এ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট ছবিগুলোর একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আমিনুল বলেছেন যে ছবিগুলো তার মনোজাগতিক পরিবর্তনের বিমূর্তায়িত চিত্র, যে রাজনীতিক অস্থিরতা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছে এরা তার প্রতিফলন এবং সেই বিপর্যয়ের ভবিষ্যৎ নির্দেশকও বটে' (ওসমান, ২০০৪ : ৩২)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ভাষা অভিযোজনের ক্ষেত্রে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে। যেমন মুর্তজা বশীরের কথা বলা যায়। তিনি স্মৃতিচারণায় লিখেছেন :

> ১৯৬৬ সালের ঘটনা এসব, আমার সমসাময়িক শিল্পী বন্ধু আমিনুল ইসলাম, কিবরিয়া সবাই তখন অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি আঁকছে। আমি তখনো ফিগারেটিভ করি। কারণ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ... একদিকে আমার বিশ্বাস, অন্যদিকে বিমূর্ত ছবি আঁকছি না বলে একধরনের হীনম্মন্যতা ও বন্ধুদের কাছে অনাধুনিক হিসেবে গণ্য হচ্ছি। সব মিলিয়ে বেশ টানাপড়েনের মাঝে ছিলাম। তখন বেগমবাজারে থাকতাম। রিকশায় জেলখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি একদিন। হঠাৎ জেলখানার দেয়ালে নজর গেল। পলেস্তারা খসে ইট উঁকি দিচ্ছে, কোথাও আলকাতরা দিয়ে হাতের ছাপ, আবার পোস্টার লাগিয়ে ছিঁড়ে ফেলার কিছু অংশ বা আঠারো দাগ রয়েছে। তখন ভাবলাম কেন আমি এইসব আঁকি না। তখনই দেয়াল সিরিজের চিন্তা আসে (মুর্তজা, ২০১৪ : ৪৩)।

মুর্তজা বশীরের দেয়াল সিরিজের অনেক ছবিই পুরোপুরি বিমূর্ত। যেমন 'দেয়াল-৫৮' (ক্যানভাসে তেলরং, ১৯৬৯) (চিত্র : ১৫৮)।

এভাবে আমাদের শিল্পীরা বিমূর্ত রীতিকে নিজেদের চেতনার সাথে অভিযোজন করেছেন। ওপরের আলোচনাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পীর চেতনাজুড়ে ছিল তাঁর পারিপার্শ্বিক, প্রকৃতি, সমাজ, দেশ। মুর্তজা বশীরের বক্তব্য সে সময়ের বিমূর্ত ভাষার আধিপত্যবাদী ভূমিকাকেও প্রকাশ করে। তবে বিমূর্ত রীতির চর্চা করলেও দেশজ চেতনাকে শিল্পীরা বাদ দিতে পারেননি। একটি ছবি উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করা যেতে পারে। তা হলো কাইয়ুম চৌধুরীর 'নৌকা' (মেসোনাইটে তেলরং, ১৯৬৭) (চিত্র : ১৫৯)। ছবিটি বিমূর্ত, এখানে কোনো মূর্ত রূপ নেই, কিন্তু তুলির আঁচড়ে লোকশিল্পের আলংকারিক গুণের ইঙ্গিত আছে, হলুদ ও নীল রঙের ব্যবহার লোকশিল্পে ব্যবহৃত রঙের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং একই সঙ্গে গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশেরও ইঙ্গিত দেয়। রঙের মাধ্যমে মূলত রূপগুলো তৈরি, তবে তা সুস্পষ্ট কোনো রূপকে প্রকাশ করে না। কিন্তু ছবিটি দেখলে গাছপালা, নদী, নৌকার রূপ মানসপটে ভেসে ওঠে। বিমূর্তভাবে আঁকা সত্ত্বেও দক্ষতার সাথে শিল্পী আমাদের গ্রামীণ পরিবেশীয় সংস্কৃতিকে এই চিত্রে মূর্ত করেছেন এবং প্রকাশের ধরনে মৌলিকত্ব আছে। দেশীয় বিষয়, ভাবনা এবং বিদেশি প্রকাশরীতি–এই দুইয়ের সম্মিলনে একটি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের নিজস্ব। যাকে পার্থ মিত্রের ভাষায় বলা যায়, 'They found sustenance in a form of syncretism that offered fresh existential and epistemological possibilities' (Partha, 2008 : 538)। অর্থাৎ আমাদের অঞ্চলে বিমূর্ত রীতির পরিপুষ্টি ঘটেছে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে, যা চিত্রভাষা নির্মাণের নতুন জ্ঞানের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এভাবেই আমাদের চিত্রচর্চা বিমূর্ত চিত্রভাষা নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছে। তবে এর পরও কথা থেকে যায়। কারণ, চিত্রভাষা নির্মাণের নতুন জ্ঞান যে দ্বিতীয় পর্যায়ে বা আমিনুলদের সময়ে এসে সৃষ্টি হয়েছে, তা কিন্তু নয়। এই নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি আমরা পেয়েছি জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও সফিউদ্দীন আহমদের '৫০-এর দশকের চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে। ১৯৫১ সালে করা জয়নুলের 'মা ও শিশু' (চিত্র : ১৮), 'কলসি কাঁখে নারী' (চিত্র :

১৯), ১৯৫৩ সালের 'বাঙালি রমণী' (চিত্র : ২৪), 'কৃষক' (চিত্র : ২৫), কামরুল হাসানের ১৯৫০ সালে আঁকা 'মাছ ধরা' (চিত্র : ৫০), ১৯৫৫ সালের 'তিন কন্যা' (চিত্র : ৫৩) কিংবা সফিউদ্দিনের ছাপচিত্র মাধ্যমে করা 'জেলের স্বপ্ন' (চিত্র : ৯৫), 'হলুদ জাল' (চিত্র : ৯৬), এবং '৬০-এর দশকের 'মাছ ধরার সময়-১' (চিত্র : ৯৮), 'বিক্ষুব্ধ মাছ' (চিত্র : ৯৯), 'জাল ও মাছ-২' (চিত্র : ১০০) প্রভৃতি ছবিগুলোর ভাষা এ কথাকে প্রমাণ করে। কাজেই এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে এই অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শিল্পীদের অর্থাৎ বাংলাদেশের '৪০ ও '৫০ দশকের শিল্পীদের '৫০ ও '৬০-এর দশকে করা নিরীক্ষামূলক চিত্রকর্ম আমাদের আধুনিক চিত্রকলা চর্চার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ '৫০-এর দশকের প্রথম দিকে আত্মপরিচয় নির্মাণের মাধ্যমে আমাদের আধুনিকতা নির্মাণের প্রক্রিয়ায় চিত্রভাষার এই নতুন জ্ঞান নির্মাণের যাত্রা শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় '৫০ ও '৬০-এর দশকেও তা অব্যাহত থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জয়নুলদের আত্মপরিচয় নির্মাণের ভাষা, যাকে প্রথম পর্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং আমিনুলদের বিমূর্ত রীতির ভাষা যাকে দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে–দুটো পর্যায়ের ভাষাই আধুনিক নিরীক্ষামূলক ছবির চর্চার ভাষা, যা পাশ্চাত্য চিত্রচর্চার সংস্পর্শে এসে বিকশিত হয়েছে এবং আমাদের আধুনিক চিত্রের ভাষা হয়েছে। জয়নুলদের ক্ষেত্রে চিত্রভাষা নির্মাণে উপনিবেশবাদীবিরোধী ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল বেশি। তাঁরা কিউবিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফোবিজমের রীতির সাথে লোকশিল্পের আঙ্গিকের সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন, যেখানে লোকরীতি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যেমন–'গুণটানা' (চিত্র : ২০), 'দুই বোন' (চিত্র : ২১), 'গল্পগুজব' (চিত্র : ৬৯), 'Vision' (চিত্র : ৭০) ইত্যাদি। মানুষের অবয়ব নির্মাণে লেকেপুতুলের আদল, বহিঃরেখার ব্যবহার, অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপট লোকচিত্রের মতো ফাঁকা রাখা–ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োগ হয়েছে চিত্রে। সফিউদ্দীন হেটারের ছবির স্পেস বিভাজনকে সুনিপুণভাবে বাংলার নদীর বাঁক, ঢেউ, মাছ ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। সুলতানের '৫০-এর দশকের কাজে গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ অঙ্কনে একাডেমিক রীতি উপেক্ষিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বাস্তব বিষয়ের চিত্রণ হলেও আলোছায়ার ব্যবহারে ভলিউম তৈরির কোনো প্রচেষ্টা নেই। আমিনুলরা কৌশলের দিক দিয়ে পরিবর্তন আনলেও মুখ্য পরিবর্তন এনেছেন চিত্রভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে। জয়নুলের শিল্পদর্শনের প্রভাব পড়েছিল আমিনুলদের ওপর ঢাকায় শিল্পশিক্ষা লাভের সময়। এই প্রভাবে মানুষের জীবন বিশেষত সাধারণ মানুষের জীবন এবং দেশের প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের শিল্পচেতনা গড়ে ওঠে। শিল্পশিক্ষা শেষ করার অব্যবহিত পর তারা নিরীক্ষামূলক ছবি নির্মাণ করেন। এই পর্যায়ে পাশ্চত্যের শিল্পচর্চার ইতিহাসে পোস্ট-ইম্প্রেশনজিনম, কিউবিজম ও ফোবিজমের শিল্পীদের ক্যানভাসের দুই মাত্রার স্পেস বা সমতল বৈশিষ্ট্য এবং তিন মাত্রার ভ্রম তৈরি–এ দুইয়ের মাঝে যে বোঝাপড়া নির্ণয়, যাকে আরনাসন বলেছেন শিল্পের নতুন বাস্তবতা বা ধারণামূলক বাস্তবতা এবং এর ফলে যে বিমূর্ত ভাষা তৈরি হলো, সেই ভাষাকে আমিনুলরা গ্রহণ করলেন

তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে ছবি তৈরির ক্ষেত্রে। এবং এই বিমূর্তের নানা তারতম্য ঘটিয়ে এ দেশের বিষয়াবলি নিয়ে নতুন ছবি নির্মাণ করলেন। তাঁদের ছবির সমতলভাব নির্মাণে পাশ্চাত্যের নিরীক্ষার প্রভাব বেশি। যদিও পাশ্চাত্যের প্রেক্ষাপট এখানে মুখ্য নয়। আমিনুলদের নিজেদের পরিবেশে, সংস্কৃতিতে এই ভাষা কীভাবে অভিযোজিত হলো, সেটাই মুখ্য। এই পর্যায়ের বিমূর্ত ছবিগুলো কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল। এরপর বিমূর্ত প্রকাশবাদের প্রভাবে তাঁরা অপ্রতিনিধিত্বশীল বিমূর্ত রীতির প্রতি মনোযোগী হন। বিমূর্ত প্রকাশবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আভাঁ-গার্দ আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধে আমেরিকার জন্য সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এই রীতির ব্যাপক প্রসার, প্রচার এবং এর বিশ্বজনীনতা আমিনুলদের প্রভাবিত করে। তাঁদের কাছে এই রীতি আধুনিকতার সমার্থক হয়ে ওঠে। তাঁরা এই ভাষা আগ্রহের সাথে আয়ত্ত করেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁদের চেতনায় ক্রিয়াশীল ছিল নিজেদের দেশের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতি, পরিবেশ। তাঁরা একেবারে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে এই ভাষার চর্চা করেননি। সমাজ এবং দেশের প্রকৃতি তাঁদের ভাবনার উৎস ছিল। কাজেই শিল্পীদের চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রেক্ষিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল। এটা যেমন জয়নুলদের ক্ষেত্রে, তেমনি আমিনুলদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে সময়ে, যে প্রেক্ষাপটে চিত্র নির্মিত হয়, চিত্রের ভাষার বৈশিষ্ট্যকে অনেকটা তা নির্ধারণ করে। এর সাথে শিল্পীর ভাবনা বা শিল্পমানস এবং প্রভাবক হিসেবে চিত্রভাষার নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের সামগ্রিক ইতিহাসকে উপেক্ষা করে কিংবা বৈশ্বিক ইতিহাসের গতিধারাকে উপেক্ষা করে হয়তো শিল্পচর্চা সম্ভব হয় না। এ বিষয়গুলো এই অধ্যায়ের চিত্রভাষা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে সহায়ক হয়েছে। এই বিমূর্ত চিত্রভাষা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের চিত্রভাষার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।

টীকা

[1] '... an artistic expression of resistance to colonial rule...' (Partha, 2007 : 10).

[২] 'Interestingly in Caltutta Art School this practice of studying figures in action was common but perhaps the influence of Zainul's ideas, the realism of his famine sketches and his professed belief that the art of this country should be related to the traditional art and way of life of this land gave it a different taste. It is not insignificant that he never changed his Mymensingh dialect in those days of Babu culture and he staunchly believed that it was important to acknowledge the cultural background art was based on' (Lala Rukh, 1998 : 8).

[৩] 'Throughout the nineteenth century painters had become increasingly anxious to respect the integrity of the picture plane, and it is proof of the ambitions and complexities of Cubism that, while its painters sought to give the spectator an ever fuller inventory of the formal properties of their subjects, they carried this preoccupation to new lengths. For one of the major concerns of the Cubists was to unite the subject with its surroundings in such a way that the whole pictorial complex could be constantly forced or related back to the flat canvas with which the artist had been originally confronted' (Golding, 1997 : 54).

[৪] 'At this stage he is still exploring the problem of integrating figures or objects and surrounding space. The figures are clearly outlined, and thus exist sculpturally in space. However, their broken contours, sometimes seemingly independent of the cream-color area of their flesh, begin to dissolve solids and integrate figures with the shaped clouds that, in an advancing background, reiterate the carnal struggles of the bacchanal' (Arnason, 1977 : 56).

[৫] 'However, the space of the picture does not recede into a perspective of infinity in the Renaissance or Baroque manner. ... The foreground buildings and intervening tress are composed in ocher, yellow, orange-red, and green, with little distinction in definition as objects recede from the eye. Although the elements of the foreground–houses, rooftops, chimneys, trees–are perfectly recognizable as such, it is difficult to think of them as objects existing in natural space. If we try to envisage the space and air surrounding the solid objects, such as houses and chimneys, we realize that there is no empty space. ...The abrupt manner in which the artist cuts off his space at the sides of the painting has the effect of denying the illusion of recession in depth. The blue of the bay asserts itself even more strongly than the ochers and reds of the foreground...' (Arnason, 1977 :57).

[৬] '...the shallow, sealed space, the anatomical deformations that put profile noses on frontal heads or a full-front eye on a profile face, and the fracturing of the total field, figures and background alike, into an overall, network of jagged edges and tilting planes' (Arnason, 1977 : 145).

[৭] 'In our post-colonial environment, scholars have proposed ways of empowering non-Western modernism that seek to restore the artists' choice and to view them as active rather than passive agents of transmission. ...Gerardo Mosquera argues that the periphery is ceasing to be reservoir of traditions, creating at once multiple sites of international culture as well as strengthening local developments is constant hybridization of cultures' (Partha, 2007 : 9).

[৮] 'Arguably, the strongest cultures have often developed through constant cross-fertilizations and crossing of cultural frontiers, through the original forms and ideas necessarily acquire a new meaning in the new environment. But what one must remember is that these exchanges of ideas and forms need not necessarily be a question of domination and dependence nor do they represent a loss of self' (Partha, 2007 : 9-10).

[৯] 'The work of Lahore and Dacca artists tended to fall into well marked groups, because of the strong influence of the local art schools and teachers, in particular Mrs. Ahmed of the Department of Fine Arts Lahore, and Mr. Zainul Abedin of Dacca. ... Impressionistic sketches in water colour with the lines emphasized with a thin brush in black, showing landscapes and river scenes, are common in the work of the Dacca artists.
The heavy and somewhat awkward work of the Lahore women artists is yet in the form of finished paintings that have some measure of those structural qualities that Cezanne admired in the "art of the museums"...
Similarly the work of the Dacca artists is not all impressionistic landscape. Even in these landscapes, some artists (as kundu) are seeking abstract shapes or rhythmic patterns; while their most promising young artists– Kibria, Basit, Aminul Islam, and others-are going openly abstract. Rashid Chowdhury is experimenting in the Surrealistic manner of Chagall, Murtaza Bashir is employing the style of the Italian primitives to express the modern sense of form and space, and so on' (S Amjad, 1959 : 29).

[১০] 'Soon after the conclusion of World War II Europe witnessed the advent of the cold war between the communist countries led by Russia and the capitalists West led the United States of America' (B V Rao, 1989 : 229).

[১১] 'In the highly aggressive confrontation that arose between these two superpowers superior military, diplomatic, scientific and economic strategies became imperative to an eventual total victory. There was also an acknowledgement that major areas of modern culture, such as art, music, and literature were also essential fronts in the ideological conflict between capitalism and communism' (Battaglia, 2008 : 1).

[১২] 'Consequently, the avant-garde movements responsible for creating the modern art, music and literature of this era were of vital strategic importance to both sides, even if the individual artists sometimes remained blind to the political appropriation of their art' (Battaglia, 2008 : 1).

[٩٥] 'If the CIA, the Museum of Modern Art, and the Congress of Cultural Freedom were the major players behind the scene of the cultural warfare game, then the Abstract expressionist artists were the pawns of the game and the art critics Clement Greenberg and Harold Rosenberg were the voice of this these pawns. In fact, the major players behind the scene did not really care about the individual artists but focused on the work and the ideology behind their work. This was, in a sense, paradoxical because individualism was one of the cornerstones of Abstract Expressionism and a major reason why this art was supported as an alternative to the "collectivistic art of socialism"' (Holler & Ullmann, 2010 : 8).

[٩٤] 'Several Abstract expressionist artists had political roots in the Marxism of the 1930s, and their analysis of the new political situation and their own position in it bore the imprint of the Marxist tradition. However, in the 1940s, there was an important shift away from critical studies of the social and political environment, alienation in the capitalist society, etc. Gottlieb and Rothko were dedicated readers of Fraud and Jung' (Holler & Ullmann, 2010 : 10).

[٩٥] 'A series of devastating political disillusionments for the American left-the Moscow show trials of 1936-38, the Hitler-Stalin pact of 1939 and the atomic bomb in 1945-provided the context for the movement of these artists to an apolitical stance. They did not mean to lose touch with humanity or abandon their sense of social commitment. These artists were affected enough by the social crisis and the radical dreams of the 30's to feel the pull of social obligation even as they separated themselves from radial politics and explored the possibilities of nonrepresentational art. Mr. Guilbaut skillfully shows how their transition was eased by Mayer Schapiro's 1937 essay in The Marxist Quarterly, "The Nature of Abstract Art", which insisted on the humanity of abstract art and its connection to social experience' (Bender, 1984).

[٩٦] 'All renderings of objects, no matter how exact they seem, even photographs, proceed from values, methods and viewpoints which somehow shape the image and often determine its contents. On the other hand, there is no "pure art", unconditioned by experience; all fantasy and formal construction, even the random scribbling of the hand, are shaped by experience and by nonaesthetic concerns. ...

By his very practice of abstract art, in which forms are improvised and deliberately distorted or obscured, the painter opens the field to the suggestions of his repressed interior life. But the painter's manipulation of his fantasy must differ from the child's or psychopath's in so far as the act of designing is his chief occupation and the conscious source of his human works; it acquires a burden of energy, a sustained pathos and firmness of execution foreign to the others.

The attitude to primitive art is in this respect very significant. The nineteenth century, with its realistic art, its rationalism and curiosity about production, materials and techniques often appreciated primitive ornaments, but considered primitive representation monstrous. It was as little acceptable to an enlightened mind as the fetishism or magic which these images sometimes served. Abstract painters, on the other hand, have been relatively indifferent to the primitive geometrical styles of ornament. The distinctness of motifs, the emblematic schemes, the clear order of patterns, the direct submission to handicraft and utility, are foreign to modern Art. But in the

distorted, fantastic figures some groups of modern artists found an intimate kinship with their own work;....' (Schapiro, 1979 : 196-200).

[١٩] 'Many abstract Expressionist artists were followers of Carl Jung. As Jungians they believed that the collective unconscious was universal and "self-identical" in all human beings (Gibson, 1997, p.48). The function of art was considered as the invention of codes to transpose universal, rather than local, meaning into visual form. "Turning ... to private visions, insights, and most especially the subconscious, the abstract expressionists plumbed the depths of their own experience for metaphors and symbols that would somehow possess universal meaning" (de Hart Mathews, 1976. p.783). This was the spiritual-intellectual basis for the claim on universalism and the discharge of the isolationist spirit of pre-war America-a pre-condition for applying art as a weapon of cultural warfare' (Holler & Ullmann, 2010 : 10).

[١٨] 'In the world of art, Abstract Expressionism constituted the ideal style for these propaganda activities. It was the perfect contrast to 'the regimented, traditional, and narrow' nature of 'socialist realism'. It was new, fresh and creative. Artistically avant-garde and original, Abstract expressionism could show the United States as culturally up-to-date in competition with Paris' (Cockcroft, 2000 : 150-151).

[١٩] 'When artists made use of primitive art they adopted a critical stance not to the primitive itself but, rather, to the civilized norms of their own society. This was either a way of proposing actual social change or a critique of established Western artistic practice' (Rhodes, 1994 : 110).

[٢٠] 'The women in the *Demoisselles*, therefore, operate not as signs for the 'otherness' of the colonial 'primitive', but an 'otherness' internal to Western culture, based on their presumed dangerous sexuality' (Rhodes, 1994 : 91).

[٢١] 'Kirchner's Primitivism should not be seen, therefore, in terms of a dialogue with the geographically or historically remote primitive. Instead, it belongs in the context of his bohemianism, which placed him at the periphery of conventional society, and his attempts to construct images of Europe's outsiders via an artistic language that was itself different to the academic norm' (Rhodes, 1994 : 103).

চিত্র-১১২ : রাতে গানের আসর, জলরং, ৪৭×৬১ সেমি, ১৯৫১, আমিনুল ইসলাম

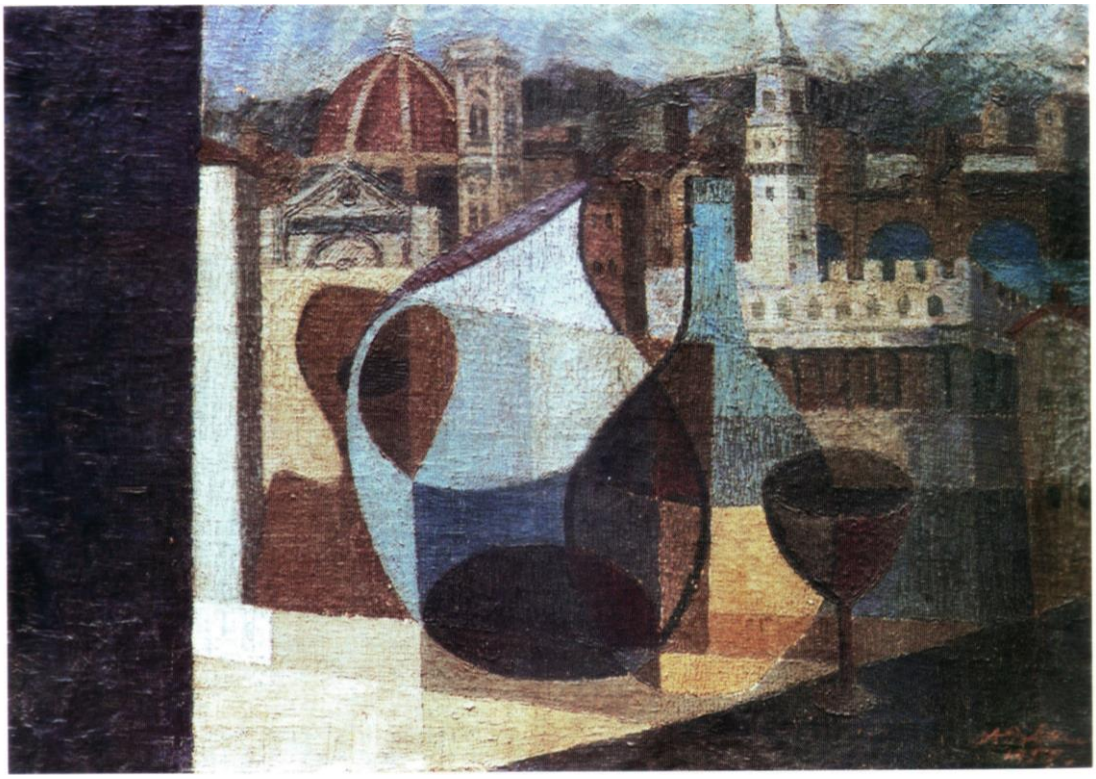

চিত্র-১১৩ : ফ্লোরেন্স, তেলরং, ৬৪×৮৯ সেমি, ১৯৫৪, আমিনুল ইসলাম

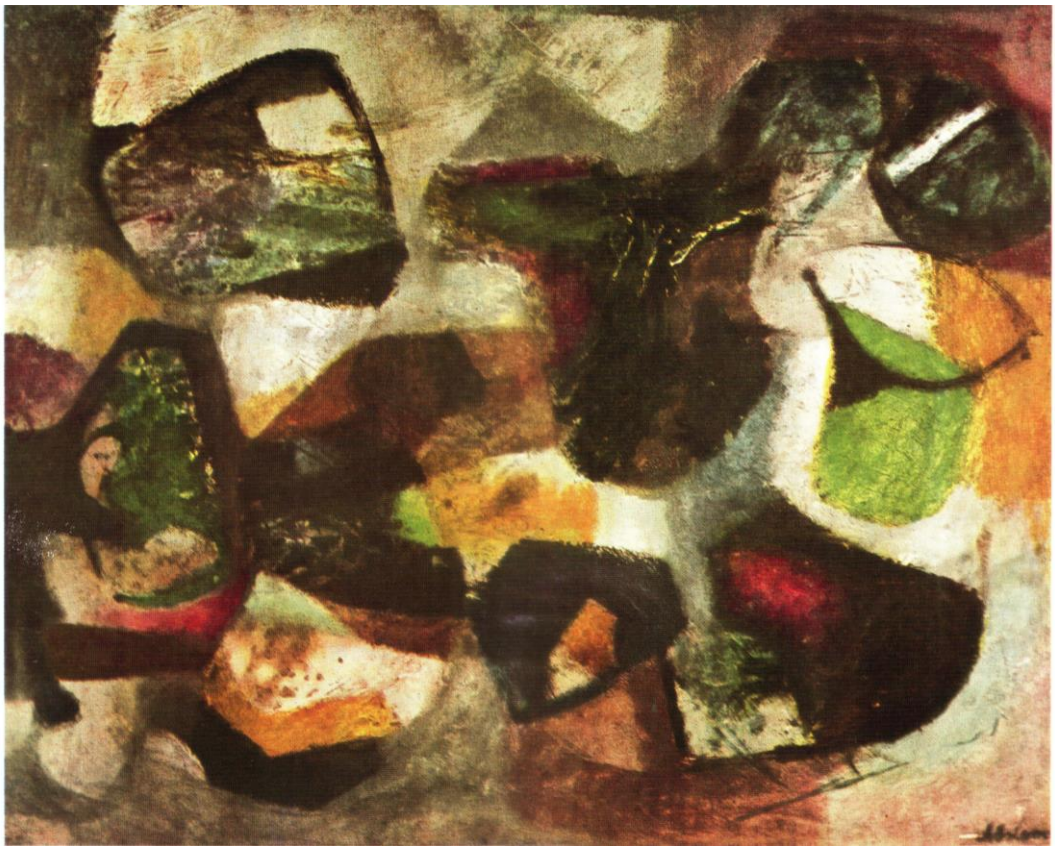

চিত্র-১১৪ : ভুলে যাওয়া সুরের ছন্দ, তেলরং, ৯০×৭৫ সেমি, ১৯৬২, আমিনুল ইসলাম

চিত্র-১১৫ : রোডা, তেলরং, ৭৫×১২০ সেমি, ১৯৬০, হামিদুর রাহমান

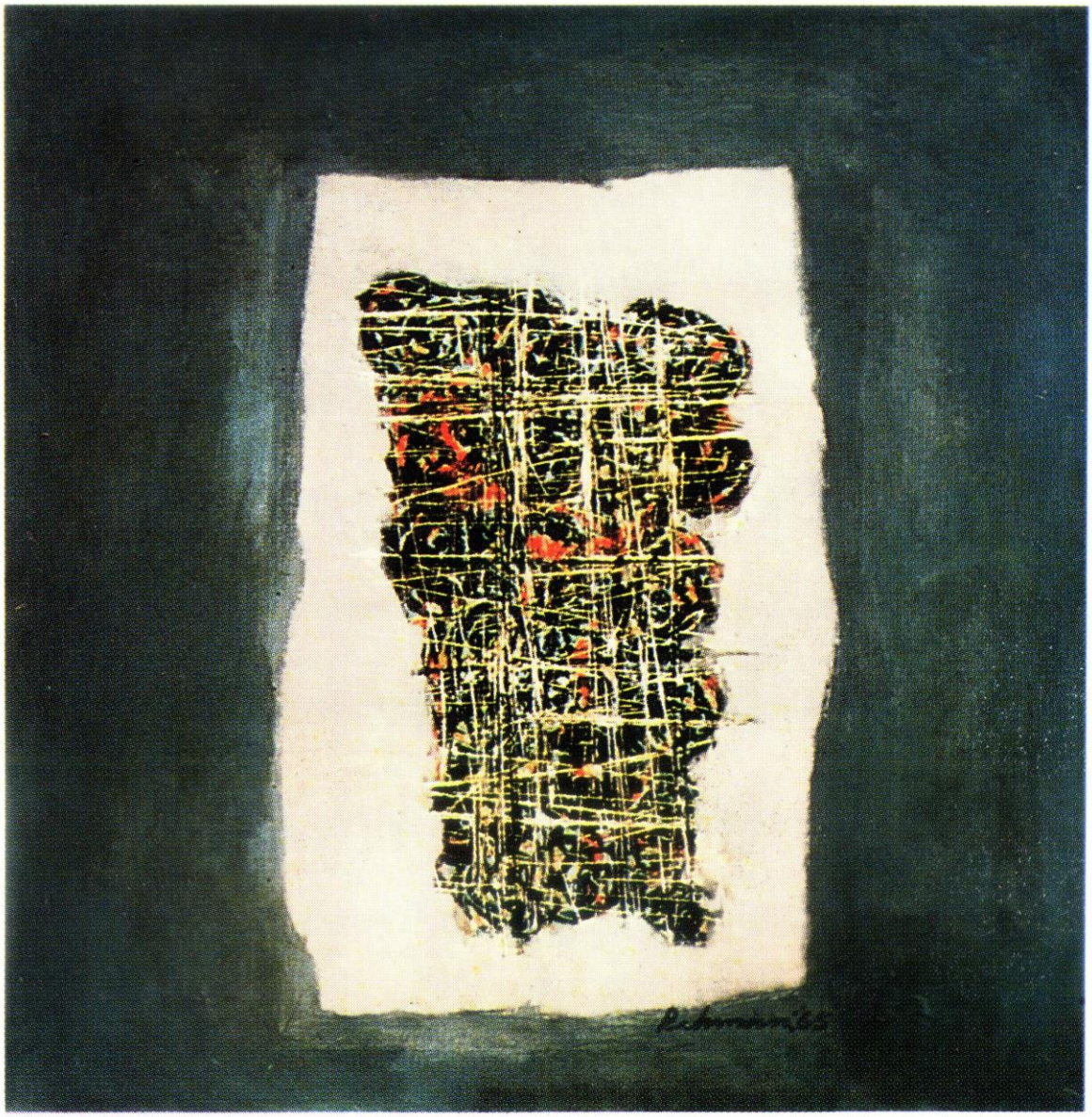

চিত্র-১১৬ : আমার প্রিয় রুমাল, তেলরং, ১৯৬৫, হামিদুর রাহমান

চিত্র-১১৭ : জলকেলি, তেলরং, ৯১×৬০ সেমি, ১৯৫৩, মোহাম্মদ কিবরিয়া

চিত্র-১১৮ : কম্পোজিশন হলুদ, মিশ্র মাধ্যম, ষাটের দশক, মোহাম্মদ কিবরিয়া

চিত্র-১১৯ : আবেগ, তেলরং, ৭৬×৫১ সেমি, ১৯৫৪, মুর্তজা বশীর

চিত্র-১২০ : আগামী দিনের অপেক্ষায়-২, তেলরং, ৭৬×৫১ সেমি, ১৯৫৫, মুর্তজা বশীর

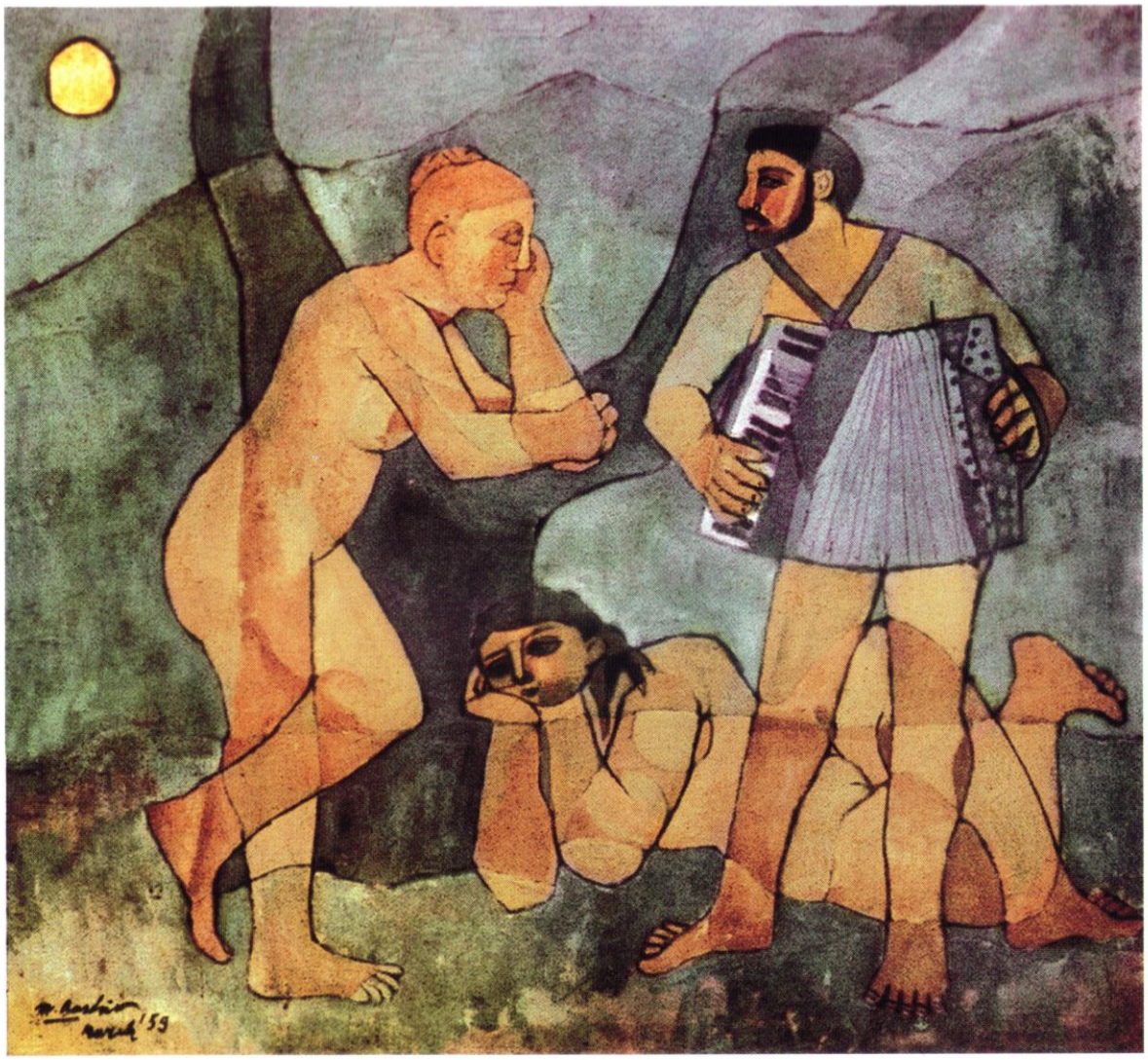

চিত্র-১২১ : দুই প্রেমিকার জন্য সঙ্গীত, ক্যানভাসে তেলরং, ৮৫×৯৬ সেমি, ১৯৫৯, মুর্তজা বশীর

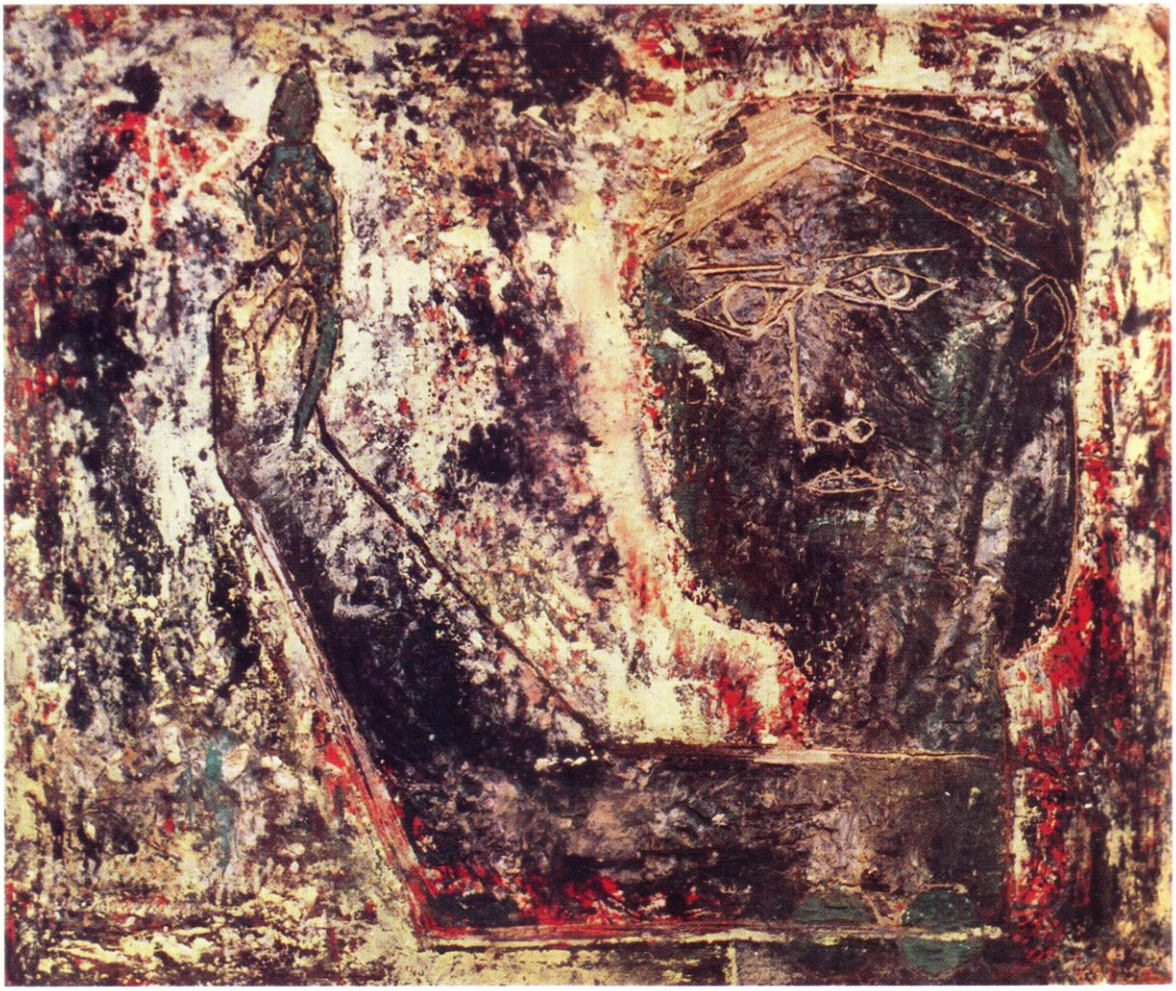

চিত্র-১২২ : রমণী ও তক্ষক, মেসোনাইটে ল্যাকার, তেলরং ও কাঠের গুঁড়া, ৫৫×৬৬ সেমি, ১৯৬১, মুর্তজা বশীর

চিত্র-১২৩ : লাল জামা পরিহিতা রমণী, মেসোনাইটে তেলরং ও এনামেল, ৭৩×৬১ সেমি, ১৯৬২, মুর্তজা বশীর

চিত্র-১২৪ : দেয়াল-২৮, ক্যানভাসে তেলরং, ১৫৩×৮৩ সেমি, ১৯৬৭, মুর্তজা বশীর

চিত্র-১২৫ : নবান্ন-১, তেলরং, ৯০×৬৭ সেমি, ১৯৫৯, রশিদ চৌধুরী

চিত্র-১২৬ : কিষান-কিষানি, ট্যাপিস্ট্রি, ১৮০×১৫০ সেমি, ১৯৬৫, রশিদ চৌধুরী

চিত্র-১২৭ : নৃত্যরত, গোয়াশ, ৪৫×৩৪ সেমি, ১৯৬৯, রশিদ চৌধুরী

চিত্র-১২৮ : মহাজন, ক্যানভাসে তেলরং, ৫১×৭১ সেমি, ১৯৫৬, কাইয়ুম চৌধুরী

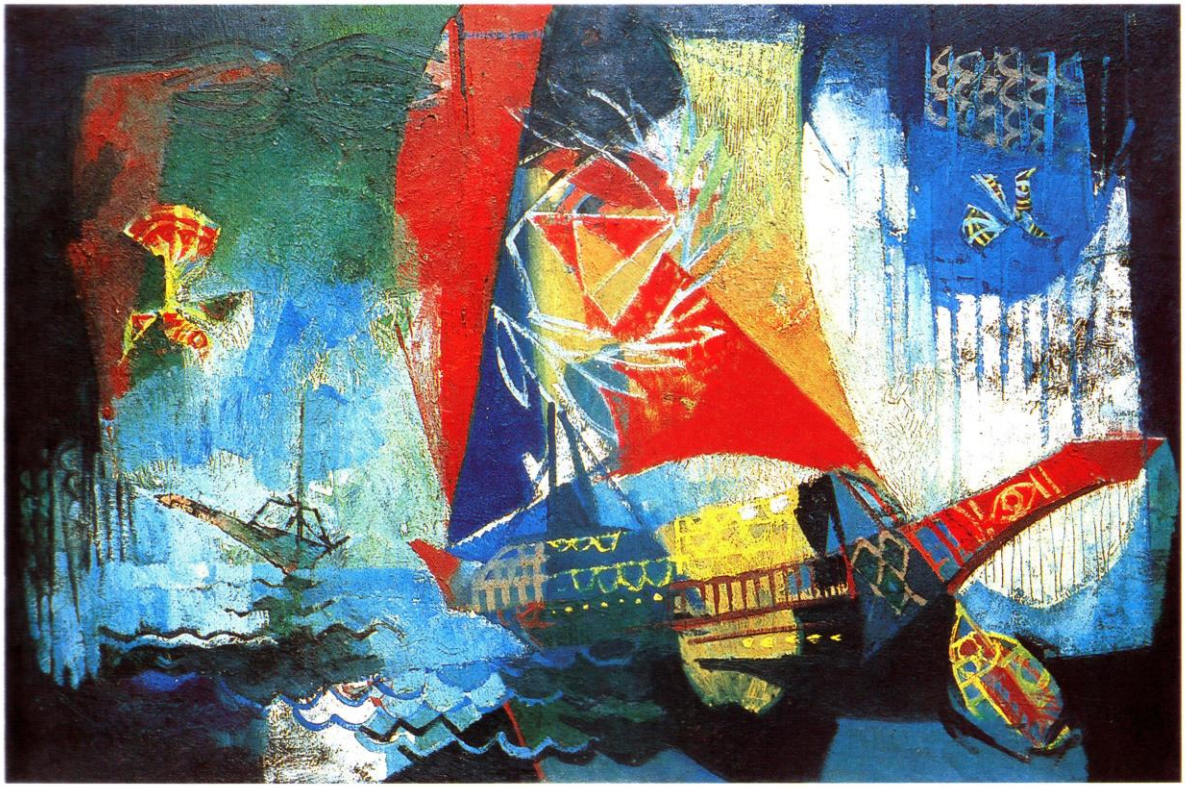

চিত্র-১২৯ : পালতোলা, ক্যানভাসে তেলরং, ৯২×৬১ সেমি, ১৯৬৩, কাইয়ুম চৌধুরী

চিত্র-১৩০ : কদলীবৃক্ষ, মেসোনাইটে তেলরং, ৭০×৯১ সেমি, ১৯৬৬, কাইয়ুম চৌধুরী

চিত্র-১৩১ : কম্পোজিশন-৪, বোর্ডে তেলরং, ১৯৬১, আবদুর রাজ্জাক

চিত্র-১৩২ : চাঁদ, নদী ও জলমগ্ন নৌকা, তেলরং, ৮৮×১২০ সেমি, ১৯৫৮, সৈয়দ জাহাঙ্গীর

চিত্র-১৩৩ : ধানভানা-১, তেলরং, ৯০×৭৭ সেমি, ১৯৫৮, কাজী আবদুল বাসেত

চিত্র-১৩৪ : প্রতিবিম্ব, তেলরং, ৯০×৫৭ সেমি, ১৯৬৮, কাজী আবদুল বাসেত

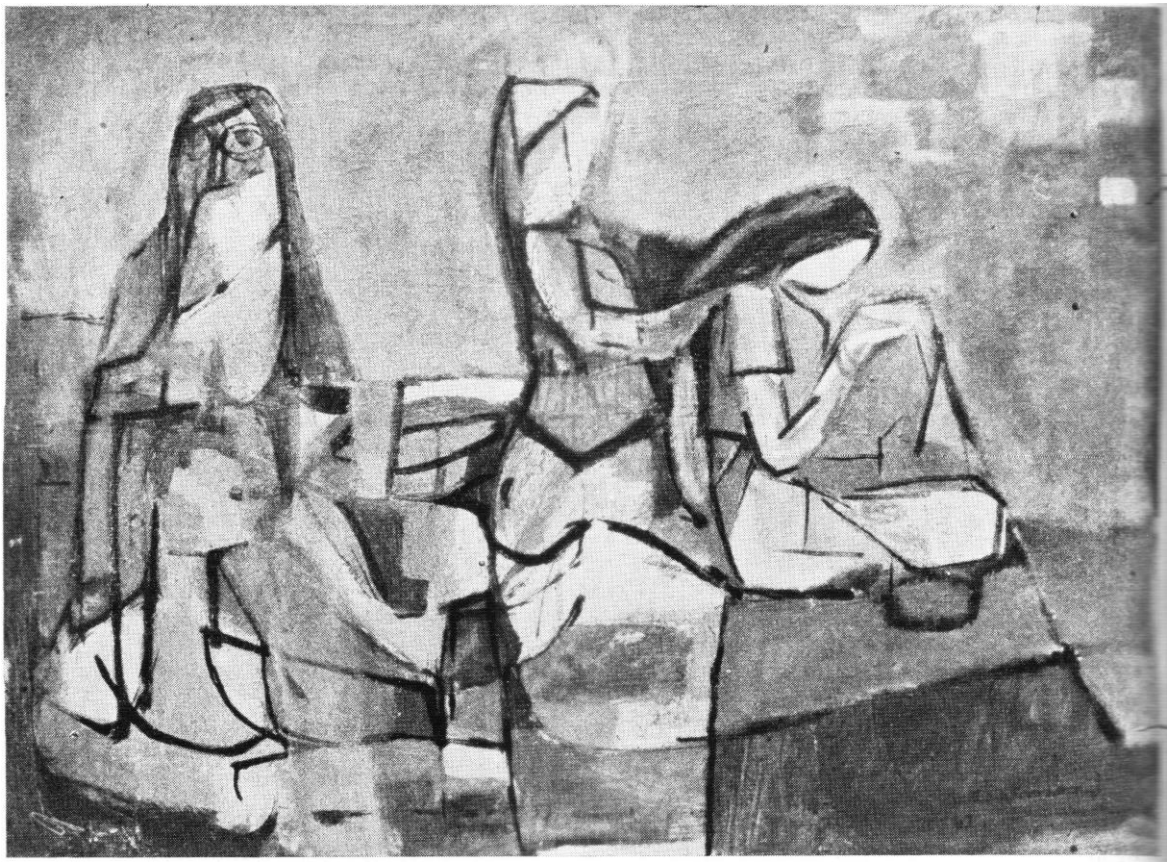

চিত্র-১৩৫ : The Hairdresser and the Lazy Women, তেলরং, ষাটের দশক, দেবদাস চক্রবর্তী

চিত্র-১৩৬ : কম্পোজিশন, তেলরং, ১৯৬৬, দেবদাস চক্রবর্তী

চিত্র-১৩৭ : বন্যাকবলিত গ্রাম (Flooded Village) এচিং, ২৮×৩৬ সেমি, ১৯৫৮, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১৩৮ : নেমে যাওয়া বান (Receding Flood), সফট-গ্রাউন্ড অ্যাকুয়াটিন্ট, ৩৭×৫০ সেমি, ১৯৫৯, সফিউদ্দীন আহমেদ

চিত্র-১৩৯ : Le Couple, Engraving, soft-ground etching and scorper, 44×29.2 cm, 1952, Stanly William Hayter

চিত্র-১৪০ : রাখাল, তেলরং, ৯০×১২০ সেমি, ১৯৫৪, আমিনুল ইসলাম

চিত্র-১৪১ : Bacchanal (The Battle of love), oil on canvas, 15×18.5in ,1875-76, Paul Cezanne

চিত্র-১৪২ : The Bay from; L, Estaque, 31.5×38.5in, oil on canvas, 1886, Paul Cezanne

চিত্র-১৪৩ : Les Demoisells d’Avignon, 96×92in , oil on canvas, 1907, Pablo Picasso

চিত্র-১৪৪ : মসজিদে লাল মাছ, তেলরং, ১৯৬১, কাইয়ুম চৌধুরী

চিত্র-১৪৫ : জড়জীবন, ক্যানভাসে তেলরং, ২৮×৪৩ সেমি, ১৯৫৭, দেবদাস চক্রবর্তী

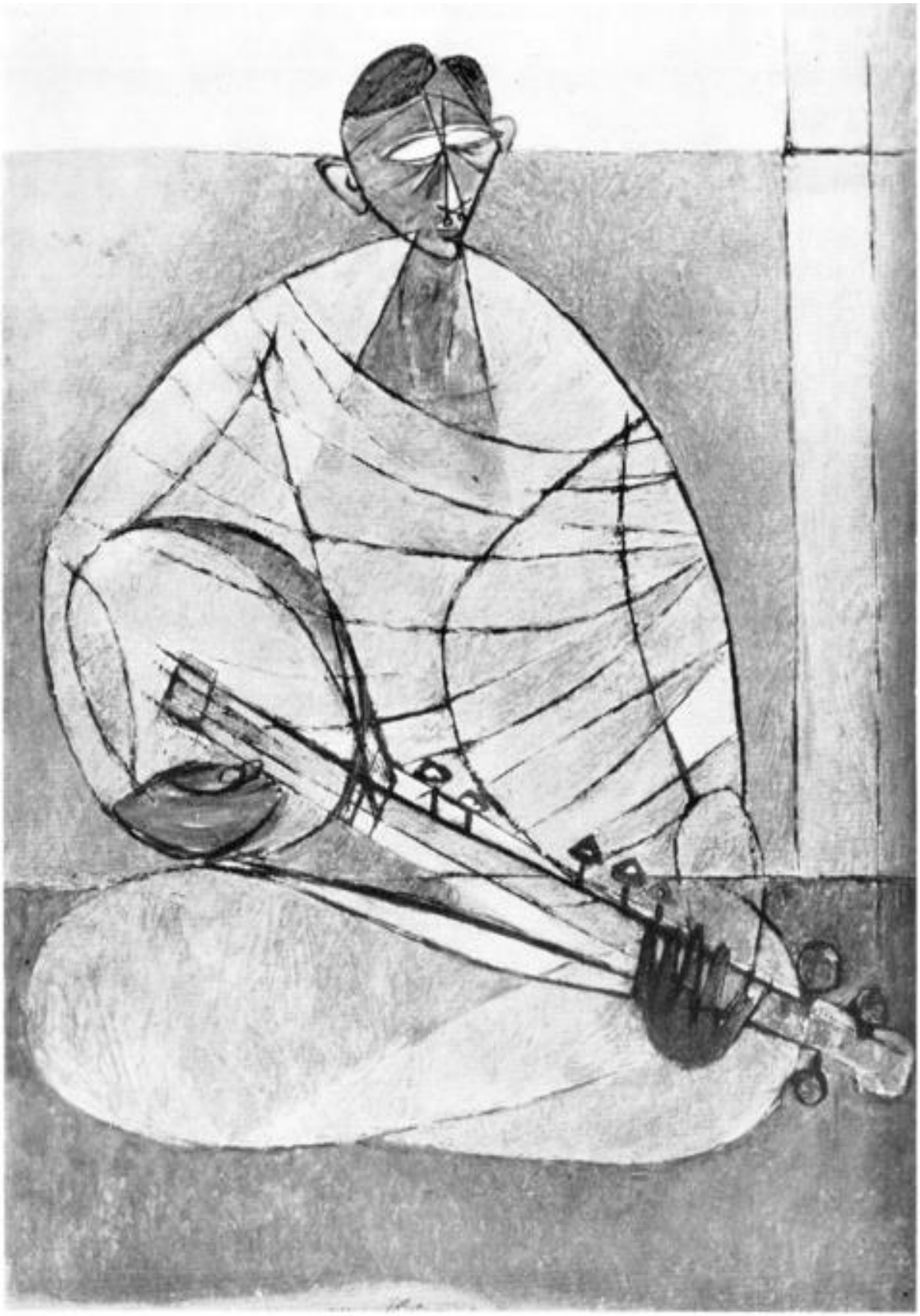

চিত্র-১৪৬ : The Sarod Player, তেলরং, 82×36in, 1951, Paritosh Sen

চিত্র-১৪৭ : Dreamboat, Abdur Rahman Chughtai

চিত্র-১৪৮ : Portrait of Shakir Ali, oil, Anna Molka Ahmed

চিত্র-১৪৯ : Person at Sandpit, oil on board, 36 ×48in, Sadequain

চিত্র-১৫০ : তিন আত্মা (Three Souls), ১৯৫৮, মোহাম্মদ কিবরিয়া

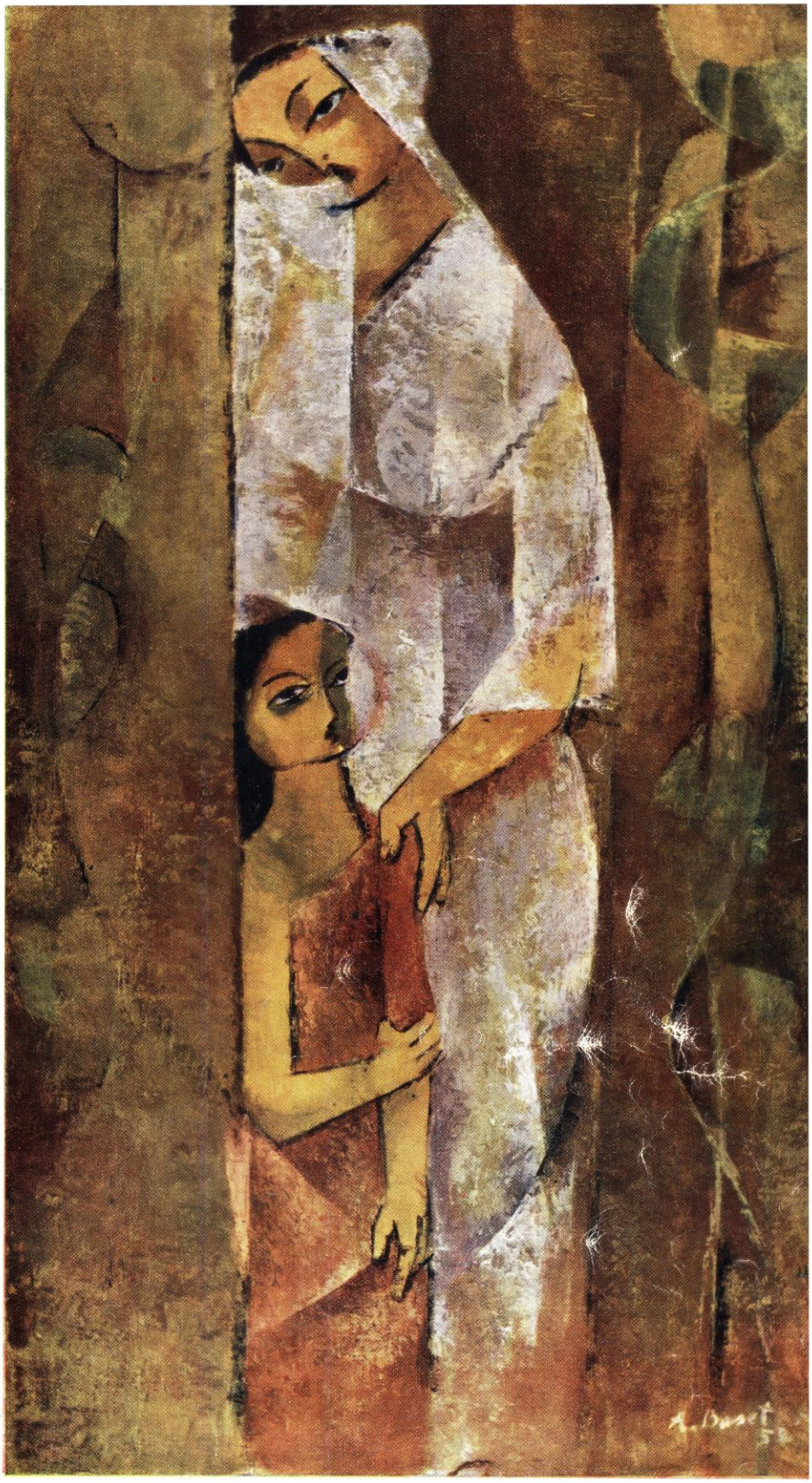

চিত্র-১৫১ : মা ও শিশু (Mother and Child), পঞ্চাশ দশকের শেষের দিক, কাজী আবদুল বাসেত

চিত্র-১৫২ : দুর্গত, তেলরং, ৬১×৯১ সেমি, ১৯৫৮, আমিনুল ইসলাম

চিত্র-১৫৩ : দেয়াল-৪৮, ক্যানভাসে তেলরং, ১২১×৮৮ সেমি, ১৯৬৭, মুর্তজা বশীর

চিত্র-১৫৪ : গোধূলি-১, মেসোনাইটে তেলরং, ৭০×৯১ সেমি, ১৯৬৫, কাইয়ুম চৌধুরী

চিত্র-১৫৫ : ঝরাপাতায় শিশিরবিন্দু, তেলরং, ষাটের দশক, কাজী আবদুল বাসেত

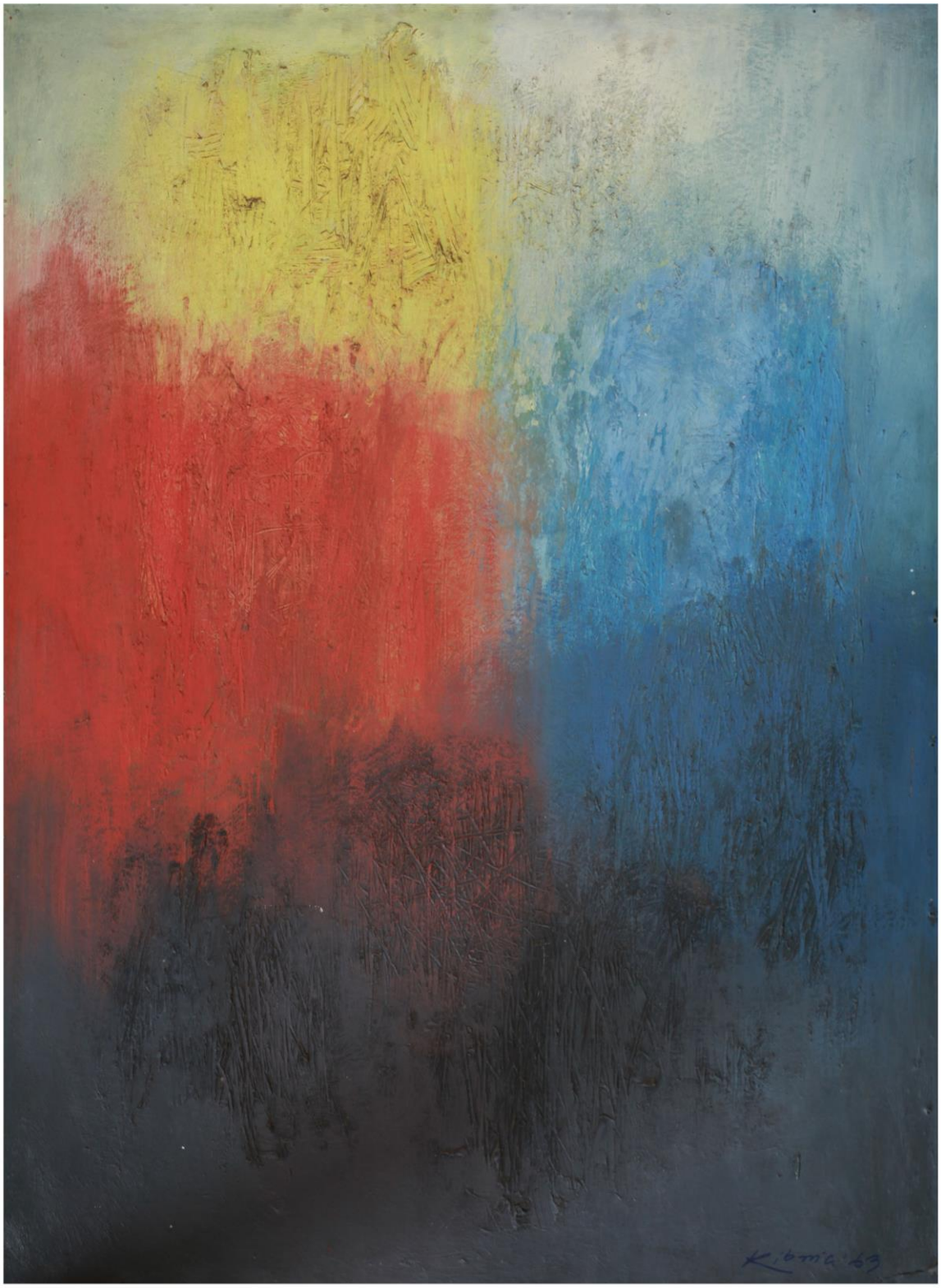

চিত্র-১৫৬ : (শিরোনাম পাওয়া যায়নি) বোর্ডে তেলরং, ১১৪×৪৮ সেমি, ১৯৬৩, মোহাম্মদ কিবরিয়া

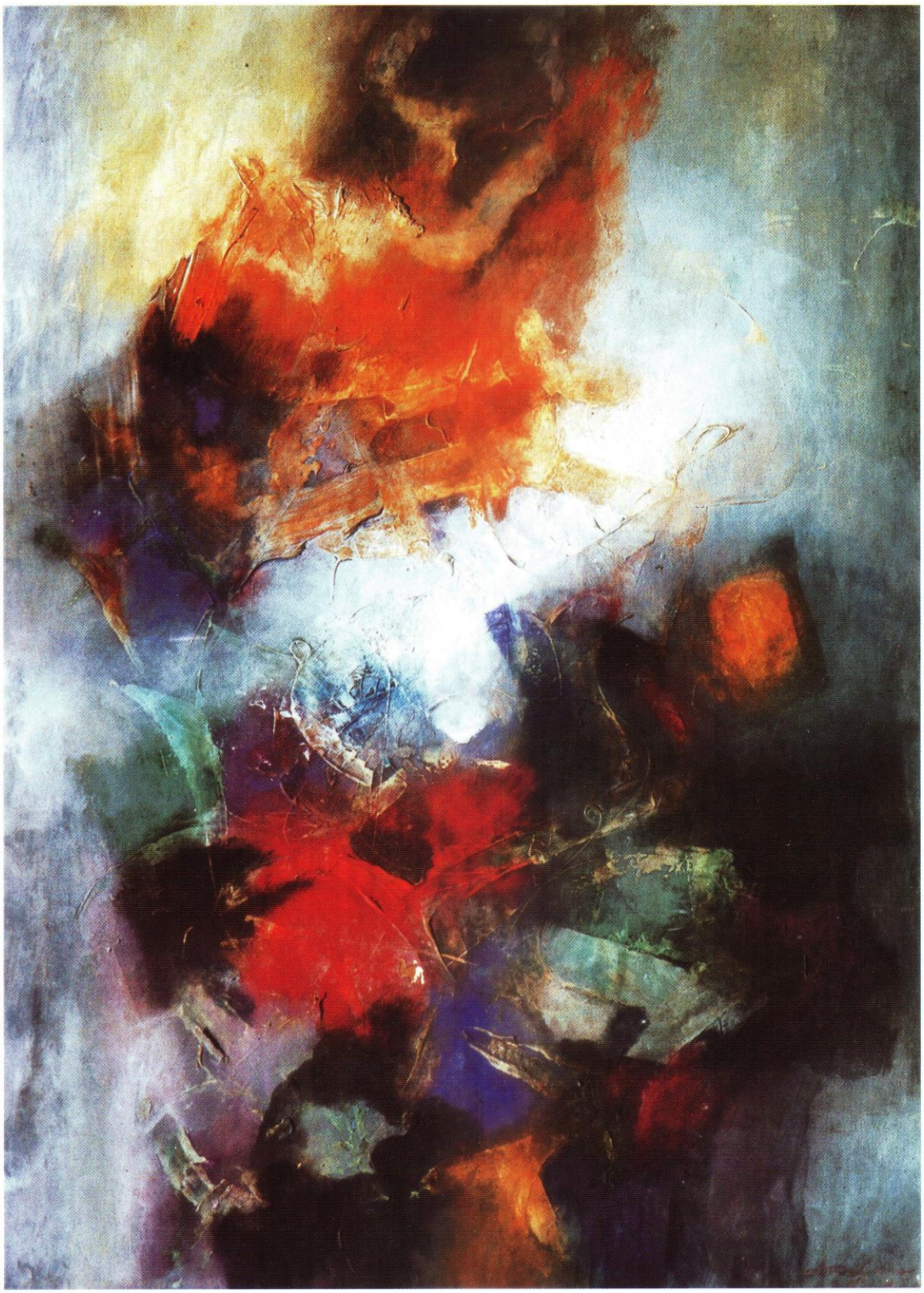

চিত্র-১৫৭ : রূপান্তর-১, অ্যাক্রেলিক, ৫৫×৭০ সেমি, ১৯৬৭, আমিনুল ইসলাম

চিত্র-১৫৮ : দেয়াল-৫৮, ক্যানভাসে তেলরং, ১০৪×১৩৭ সেমি, ১৯৬৯, মুর্তজা বশীর

চিত্র-১৫৯ : নৌকা, মেসোনাইটে তেলরং, ৭২×৬১ সেমি, ১৯৬৭, কাইয়ুম চৌধুরী

উপসংহার

'বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা : চল্লিশ থেকে ষাটের দশক' শীর্ষক আমার গবেষণাকর্মে '৪০ থেকে ৬০'-এর দশকের চিত্রশিল্পচর্চার বিশ্লেষণে যা দেখতে পাওয়া গেল, তা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিল্প ধর্মকে আশ্রয় করে অভিজাত শ্রেণি বা শাসক শ্রেণির তত্ত্বাবধানে রচিত হতো। আধুনিক সময়ে এসে চিত্রকলাচর্চা ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছাধীন হয়েছে। আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (যদিও তা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটবিবর্জিত নয়) এবং নিরীক্ষাধর্মিতা–এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলাচর্চার যাত্রা শুরু হয়েছে। এর সাথে আর একটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এই লড়াই করতে গিয়ে প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে আত্মপরিচয় নির্মাণ করা হয়েছে। পশ্চিম থেকে জাতীয়তাবাদের ধারণা নিয়ে নিজেদের জাতীয়তাবাদ নির্মাণ করেছে উপনিবেশের শোষিত মানুষ। ভারত উপমহাদেশে এভাবেই জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করেছে। শিল্পীরা অতীতের থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করে আত্মপরিচয় নির্মাণ করেছে। কাজেই ব্রিটিশ উপনিবেশের সময়ে আধুনিক শিল্প ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরীক্ষাধর্মিতার সাথে আত্মপরিচয় নির্মাণ–এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছে।

শিল্পের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নিরীক্ষাধর্মিতা আধুনিক যুগের বিষয়। আধুনিক যুগের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী। কাজেই সার্বিকভাবে শিল্প সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকাণ্ড নয়। সমাজের ভাবনাচেতনা শিল্পকে প্রভাবিত করে। সে কারণে '৪০, '৫০ ও '৬০-এর দশকের বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অঞ্চলে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে এবং আমাদের আধুনিক চিত্রশিল্পের অগ্রপথিকেরা তাঁদের চিত্রকলার চর্চা শুরু করেছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে যুক্তিবাদী ভাবনা, স্বাজাত্যবোধ, জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রভৃতি শিক্ষিত ভারতবাসীর মাঝে বিকাশ লাভ করে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভাবনা ভাবতে সহায়তা করে। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলিত প্রতিরোধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। শিল্পীরাও জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা, তেলরঙের প্রচলন, স্বভাববাদী রীতির চর্চা, অবনীন্দ্রনাথের নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনা অনেকগুলো নতুন দিক উন্মোচিত করে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে শিল্পীদের জাতীয়তাবাদী ভাবনা, দেশজ চেতনা, শিল্পের রীতি নিয়ে নিরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলো বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়। মুসলমান জনগোষ্ঠীর শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে

মুসলমানদের আগমন ঘটে অনেক পরে। ধর্মীয় বাধা থাকলেও বাংলায় ইসলামের মিথস্ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যের কারণে এ অঞ্চলের মুসলমানদের চিত্রকলাচর্চায় অংশগ্রহণ অস্বাভাবিক ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের উপনিবেশবিরোধী পরিবেশবাদ শান্তিনিকেতন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে কলকাতা শিল্পবিদ্যালয়ে প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া জয়নুলের নিজ গ্রাম এবং নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর বিষয় ভাবনাকে নির্ধারণ করে। এই দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই তিনি সারা জীবন দেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে ছবি করেছেন। জয়নুল সাধারণ প্রান্তিক মানুষের অসহায়ত্ব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান দুর্ভিক্ষের সময়ে। তাঁর দুর্ভিক্ষের ছবিতে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রান্তিক মানুষের এই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদস্বরূপ ছিল। ব্রতচারী আন্দোলনে অংশগ্রহণের সময় কামরুল হাসানকে পটচিত্রের কৌশল এতটাই অভিভূত করে যে পরবর্তীকালে তিনি পটচিত্ররীতিকে তাঁর নিরীক্ষামূলক ছবির অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছিলেন। এই দুই শিল্পীর চিত্রশিক্ষা এবং চিত্রচর্চার শুরু হয় দেশাত্মবোধ ও মানবিকতাবোধের মাধ্যমে অতিসাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্যবাদের বিপক্ষে সাধারণ মানুষ ও বাঙালি সংস্কৃতিকে সমর্থন দানের মধ্য দিয়ে। শুরু থেকে এভাবেই তাদের শিল্পমানস গঠনের প্রক্রিয়া চলমান থাকে।

সফিউদ্দিনের ক্ষেত্রেও এ কথা বলা যায়, কারণ তিনিও সাধারণ গ্রামীণ মানুষকে বিষয় করে ছবি এঁকেছেন। তাঁর মধ্যে একটি দার্শনিক ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। সেটি হলো তিনি এই গ্রামীণ মানুষকে দেখেছেন প্রকৃতির বিশালতার মাঝে। সে ক্ষেত্রে বিশাল প্রকৃতির মাঝে মানুষের আকৃতি হয়েছে ক্ষুদ্র, কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছবিতে। একধরনের পরিবেশবাদী ভাবনা এসেছে তাঁর ছবিতে। এভাবে নিজস্ব বিষয়-ভাবনার মধ্য দিয়ে তাঁর ছবি একাডেমিক গণ্ডি অতিক্রম করে। ছবি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও তিনি একাডেমিক গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নয়, বরং রঙের মাধ্যমে বিষয়ের নির্যাসটুকু ধরার চেষ্টা করেছেন। জয়নুল আবেদিনে ক্ষেত্রেও ছবি সম্পাদনার এই প্রচেষ্টা ছিল। আঞ্চলিক বিষয়কে তুলে আনার মধ্য দিয়ে এই তিন শিল্পী দেশাত্মবোধকে মুখ্য করে তোলেন। এ দেশাত্মবোধে ধর্মনির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে সমাজের ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। এই তিন শিল্পীর ছবি এভাবে বিভাগ-পূর্ব কালের একাডেমিক রীতি এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বের আত্মপরিচয় নির্মাণের তাত্ত্বিক কাঠামোর গণ্ডি অতিক্রম করে।

দেশবিভাগের পর ঢাকায় এসে জয়নুলরা আরেকটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাক্ষী হলেন। এর দ্বারা আন্দোলিত হলেন এবং নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত হলেন। এই নতুন পরিবেশে, নতুন অভিজ্ঞতা এবং ভাবনার মাধ্যমে তাঁদের দ্বারা ছবির নতুন ভাষা বিকাশ লাভ করল। এই ভাষা হয়ে উঠল আমাদের আধুনিক চিত্রকলার প্রথম পর্যায়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী

ভাবনা থেকে আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার সাথে নিরীক্ষাধর্মিতা যুক্ত হয়ে এই ভাষা নির্মিত হয়। কলকাতা পর্ব থেকেই দেশাত্মবোধের মধ্য দিয়ে তাঁদের শিল্পমানস গড়ে ওঠে। দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলায় চলে আসার পর দেশাত্মবোধের সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই চেতনা প্রকাশের ভাবনা তাঁদের মনে দৃঢ় অবস্থান করে নেয়। তাঁরা অনেকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয় একটি পরিণত মানসিক পর্যায়ে এবং তা তাদের শিল্পভাবনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।

পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকের বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বিকাশ লাভ করে। এ দেশের সাধারণ মানুষ, গ্রামীণ সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মাঝে বাঙালি আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান শুরু হয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ নির্মাণে। চিত্রচর্চায় বাংলার গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি, লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য আত্মপরিচয় নির্মাণের উপাদান হয়ে ওঠে। জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পরীতির (ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম, ফোবিজম, এক্সপ্রেশনিজম প্রভৃতি) বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় করে নিরীক্ষামূলক ছবি নির্মাণ করেন। তাঁদের ছবির বিষয়জুড়ে ছিল বাংলার গ্রামীণ মানুষ ও প্রকৃতি। সফিউদ্দিনের খুব অল্পসংখ্যক ছবিতে লোকশিল্পের প্রভাব ছিল। তিনিও সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতিকে উপজীব্য করে ছবি আঁকেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী এবং পানি, বিশেষ করে বন্যার অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রভাবিত করে। শহরের সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষও তাঁর নিরীক্ষামূলক ছবির বিষয় হয়ে ওঠে। এস. এম. সুলতানও গ্রামীণ মানুষ নিয়ে ছবি আঁকেন। একাডেমিক রীতিকে উপেক্ষা করেই তিনি চিত্র সম্পাদন করেন। এই চার শিল্পীর প্রধান যে মিলের জায়গা, সেটি হলো গ্রাম ও শহরের অতিসাধারণ প্রান্তিক মানুষ ও গ্রামীণ প্রকৃতিকে ছবির বিষয়ে পরিণত করা। এই অধস্তন মানুষেরই ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তি। মূলত এরাই শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে অবাঙালি শাসকের দ্বারা। এ ছাড়া আবহমান বাঙালি ঐতিহ্যের ধারক এই গ্রামীণ মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশ। শিল্পীরা এই গ্রামীণ মানুষ ও প্রকৃতিকে আত্মপরিচয়ের ভাবনার প্রতীক হিসেবে প্রকাশ করেছেন তাঁদের নিরীক্ষামূলক ছবিতে। পাকিস্তানি অবাঙালি শাসকদের উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তাঁদের চিত্রগুলো নির্মিত হয়েছে এ পর্বে। তাঁদের ছবিতে যে বাঙালিয়ানা তা অবাঙালি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হয়েছে। আর এই চিত্রভাষাই হয়েছে আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার প্রথম পর্যায়। এই চিত্রচর্চা আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির অংশ। শুধু চিত্রচর্চা নয়, জয়নুলের লোকশিল্পের প্রদর্শনীর আয়োজন, কামরুলের লোকশিল্পকে নাগরিক রুচির মধ্যে প্রোথিত করার প্রচেষ্টা–সবই তাদের শিল্পমানসের অংশ ছিল। এভাবে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক পর্বে বাঙালি গ্রামীণ ঐতিহ্যকে আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা।

প্রথম পর্বের চিত্রকলাচর্চায় ঐতিহ্যের ব্যবহার কিছু বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আধুনিকতার নির্মাণে ঐতিহ্যের ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে লালা রুখ সেলিম বলেন, এই উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক জাতি হিসেবে আধুনিক শিল্প বিকশিত হয়েছে 'ঐতিহ্য' আর 'আত্মপরিচয়ের' ডিসকোর্সকে ঘিরে। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় ঐতিহ্য বিপরীত শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঐতিহ্য' এবং 'আত্মপরিচয়' (যে আত্মপরিচয় ঐতিহ্য দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে) বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে, স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধিকার আন্দোলনে প্রতিরোধের ভাষার শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (Lala Rukh, 2019 : 118)।[১] তিনি আরো বলেন, জাতীয়তাবাদ যে আত্মপরিচয়কে ব্যবহার করেছে ঔপনিবেশিতার বিরুদ্ধে বা স্থানীয় স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তা অর্থাৎ বাংলার প্রকৃতি, প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষকে বিষয় করে এবং লোকশিল্পের অনুপ্রেরণাকে সতর্কভাবে ব্যবহার করে একটি অসাম্প্রদায়িক পথ তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের অস্তিত্বের ভিত্তি তৈরি করেছে (Lalla Rukh, 2019 : 135)।[২] এই অসাম্প্রদায়িকতার প্রভাব চিত্রকলাচর্চার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের সংস্কৃতিকে (যা ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে) চিত্রের বিষয় হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, তা হলো শিল্পীদের (অর্থাৎ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির) দ্বারা এ প্রান্তিক মানুষ 'অপর' বা 'অন্য' হিসেবে গণ্য হচ্ছে কি না? এ ক্ষেত্রে গীতা কাপুরের বিশ্লেষণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

> Already in the nationalist phase the colonial intelligentsia contextualizes the terms tradition and modernity via patriotic norms of belonging. For the early Coomaraswamy tradition covers anthropological terrain in a richly material sense. It stands in opposition to the anthropology adopted by western modernists when they make formal correlations with primitive cultures. Even though nationalism as ideology introduces its own measure of abstraction into the concept of tradition it also, at the very moment of inventing it, poses the problematic in urgent, contemporary terms. It thereby sees it as *process*, as tradition-in-use (Geeta, 2001 : 279).

তিনি আরো বলেন, বিকল্প সভ্যতাকে বিষয় হিসেবে দূরে রাখা, যা পশ্চিমের 'বিষয়ীগততা' (subjectivity)-র দ্বারা প্রক্রিয়াজাত, তা না করে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতই উদ্‌গ্রীবতা এবং দায়িত্ববোধের দ্বারা নিজেদের সমাজে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন ঐতিহ্যকে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন শান্তিনিকেতনের নন্দলাল, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্করের নন্দন ভাবনার (Geeta, 2001 : 279)।[৩] জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ, কামরুল হাসান ঐতিহ্যকে এভাবেই ব্যবহার করেছেন। তাঁরা গ্রামীণ সংস্কৃতিকে 'অপর' হিসেবে দেখেননি। নিজেদের জীবনের সাথে অভিন্ন করে দেখেছেন। তাঁদের শিল্পীসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ করেছেন।

স্বদেশভাবনা এবং দেশপ্রেম তাঁদের এভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজ 'শ্রেণির সংকীর্ণ স্বার্থগণ্ডি অতিক্রম' করে ব্যক্তিগতভাবে প্রগতিশীলতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন (দুলালকৃষ্ণ, ২০০৮ : ৪০)। দেশাত্মবোধের ভাবনা থেকেই এই অঞ্চলে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন জয়নুল আবেদিন অন্যদের নিয়ে। জয়নুলের নেতৃত্বে আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলে আধুনিক শিল্পচর্চার দ্বার উন্মুক্ত করে। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল এটি। দেশ ও সমাজের অগ্রগতি ও মানবকল্যাণের ভাবনা কাজ করেছে এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পশ্চাতে। যদিও জয়নুল কোনো নির্দিষ্ট শিল্পরীতির মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হননি, তথাপি তাঁর ভাবনায় শিল্পকে জীবনঘনিষ্ঠ করার বাসনা ছিল। কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হলেও জয়নুলের শিল্পদর্শনের প্রভাবে শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই সাধারণ মানুষের জীবন অবলোকন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়। শিক্ষার্থীদের শিল্পচর্চায় এই প্রভাব বজায় থাকে এবং চিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

আমিনুল, হামিদুর, রশিদ, মুর্তজা, রাজ্জাক, কাইয়ুম, দেবদাস, জাহাঙ্গীর, বাসেত, কিবরিয়া প্রমুখ শিল্পী যখন নিরীক্ষাধর্মী কাজ শুরু করেন, তখনো তাঁদের ছবির বিষয়-ভাবনা ছিল দেশজ প্রকৃতি, সাধারণ মানুষ। এই সময় তাঁরা পাশ্চাত্য আধুনিক চিত্রধারার (পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনজিম, কিউবিজম, ফোবিজম, অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম প্রভৃতি) বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং বিমূর্ত ছবি নির্মাণ করেন। '৫০-এর দশকের মধ্য পর্ব থেকে তাঁদের এই প্রচেষ্টা বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রচর্চার দ্বিতীয় পর্ব নির্মাণ করে। আমিনুলদের প্রথম দিকের বিমূর্তকরণের মাঝে অবয়বের উপস্থিত ছিল। শিল্পীদের অন্বেষা ছিল চিত্রতলের দুই মাত্রার বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়ে, স্পেসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে ধারণামূলক বাস্তবতা তৈরি করা (Arnason, 1977 : 52)।

আমিনুলরা প্রত্যেকেই নিজের মতো করে এই বিমূর্তরীতির ভাবনা ভেবেছেন এবং ছবির মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। তবে তাঁরা কোনো মতাদর্শের অধীনে সংগঠন গড়ে তোলেননি। তাঁদের এই অবয়বনির্ভর বিমূর্ত ছবিগুলো দিয়ে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্বের যাত্রা শুরু হয়। পাশ্চাত্যের বিমূর্তকরণ পদ্ধতি আত্তীকরণ করলেও তাঁদের ছবির বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ মানুষ ও বাংলার প্রকৃতি। আমিনুলদের শিল্পমানসে জয়নুলদের প্রভাব সব সময়ই ছিল। বাংলার প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে নিয়ে জয়নুলের যে শিল্পদর্শন গড়ে উছেছিল তার প্রতিফলন পাওয়া যায় আমিনুলদের বিষয় নির্বাচনে। এর সাথে পাশ্চাত্যের বিমূর্তকরণের নিরীক্ষাধর্মিতা যুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাবে আমাদের চিত্রচর্চা নতুন মাত্রা লাভ করে এবং সমৃদ্ধ হয়। চিত্রচর্চা যেমন দেশ সমাজের ঊর্ধ্বে নয়, তেমনি বৈশ্বিক চিত্ররীতি বা অন্য দেশের চিত্রচর্চা বা চিত্রচর্চার ইতিহাসকে উপেক্ষা করে চিত্রচর্চা সম্ভব হয় না। চিত্রচর্চা বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতি চর্চার অংশ। সে ক্ষেত্রে গ্রহণ-বিনিময়ের মাধ্যমে সংস্কৃতি যেমন এগিয়ে যায়, তেমনি শিল্পচর্চাও এগিয়ে যায় এবং সমৃদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে থমাস ম্যাকিভ্যালি

(Thomas McEvilley) লিখেছেন, সাংস্কৃতিক উপাদান এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কালক্রমকে অনুসরণ করে না এবং স্বাভাবিকভাবেই তা দ্বিধার জন্ম দেয়। তবে সভ্যতা এভাবেই অগ্রসর হয়। শিল্পের নতুনত্বও এভাবে তৈরি হয়। অর্থাৎ সব শিল্পই উৎস থেকে উদ্ভূত এবং সেই উৎসের সংস্কৃতিও তৈরি হয়েছে নানা সংস্কৃতির পুনঃসমাহারের মাধ্যমে। এই জন্য আমরা দেখি আফ্রিকার আদর্শ পিকাসোকে নাড়া দিয়েছে কিংবা মাতিসের আদর্শ অন্য কাউকে। কে প্রথম রীতি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, এটা মুখ্য নয়, বরং প্রত্যেক সংস্কৃতি বা শিল্পী সেই রীতি নিয়ে কী করলেন, কীভাবে ব্যবহার করলেন, কীভাবে নিজেদের প্রেক্ষাপট প্রয়োগ করলেন এবং অর্থপূর্ণ করে তুললেন, সেটাই মুখ্য বিষয় (McEville, 1992 : 118-119)।[৪] আমাদের শিল্পীরা পাশ্চাত্যের বিমূর্ত রীতি গ্রহণ করে নিজেদের প্রেক্ষাপটে নিজেদের মতো করে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমাদের চিত্রকলাচর্চার প্রবাহকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং এ অঞ্চলের চিত্রচর্চার নতুন ভাষা নির্মাণ করেছে। এই নতুন ভাষা দেশজ চেতনাকে ধারণ করেই বিকশিত হয়েছে। রং, আকার প্রভৃতি নির্বাচনে দেশীয় পরিবেশ, সংস্কৃতির প্রাধান্য তা প্রমাণ করে। '৫০-এর দশকের শেষ থেকে আমিনুলরা নিরাবয়ব বিমূর্ত রীতির চর্চা শুরু করেন। পাশাপাশি অবয়বধর্মী বিমূর্ত রীতির চর্চাও করেন।

বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ বা অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের প্রভাবে শিল্পীরা মূলত অবয়বহীন বিমূর্ত ছবি নির্মাণ শুরু করেন। বিমূর্ত (অবয়বহীন) রীতির চর্চার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সমালোচকরা ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন। যদিও অবয়বধর্মী চিত্রচর্চাও পাশাপাশি চলমান ছিল। তবে এটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে বিমূর্ত শিল্পকে শিল্পীরা অগ্রসরমাণ আধুনিক শিল্পরীতি হিসেবে গণ্য করেছিলেন বিশ্বব্যাপী অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের প্রসার ও আধিপত্যের কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী আমেরিকার প্রাধান্য বিমূর্ত প্রকাশবাদকে আধিপত্য বিস্তারকারী চিত্রধারায় পরিণত করে। বিমূর্ত শিল্পকে পুঁজিবাদী ভাবাদর্শের আশ্রয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এর পৃষ্ঠপোষকেরা অর্থাৎ মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট এবং শিল্পসমালোচক ক্লিমেন্ট গ্রিনবার্গ এবং হ্যারল্ড রোজেনবার্গ প্রমুখ। এ প্রকাশকে সমাজতন্ত্রের সমষ্টিগত ভাবনার বিপরীত হিসেবে দেখা হয়। ভেনিস বিয়েনালসহ আন্তর্জাতিক অনেক প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই রীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের শিল্পীদের কাছে এই রীতির বিশ্বজনীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য একে আধুনিক চিত্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। তবে বিশ্বব্যাপী এই রীতির প্রসারের পেছনে যে রাজনীতি সে বিষয়ে সচেতনতা থেকে আমাদের শিল্পীরা এই রীতি গ্রহণ করেননি। ক্যানভাসের দুই মাত্রার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে রং, অপরিচিত আকার, বুনটের মাধ্যমে আবেগ-অনুভূতিকে প্রকাশ করার বিষয়টি আমাদের শিল্পীদের আকৃষ্ট করে। অবয়বনিরপেক্ষ হলেও নিজেদের দেশ ও সমাজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই আবেগ-অনুভূতির জন্ম হয়েছে। তাই আমার মতে, এই বিষয়নিরপেক্ষ ভাষারীতির মধ্যেও এ দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে রং এবং নির্বস্তুক আকার এ দেশের

ভাবনাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। আমার পর্যালোচনায় আমিনুল, কাইয়ুম, বাসেত প্রমুখের চিত্রভাষা তা প্রমাণ করে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করেই তাঁদের ছবিতে বিমূর্ততা এসেছে। সে ক্ষেত্রে তাঁদের ছবি পুরোপুরি বিমূর্ত ভাষার মধ্য দিয়ে এ দেশের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে। এভাবে আমিনুলরা নিরাবয়ব এবং অবয়বধর্মী বিমূর্তরীতির মধ্য দিয়ে নতুন একটি চিত্রভাষা নির্মাণ করেছেন। '৫০-এর দশকের মধ্য থেকে '৬০-এর দশক পর্যন্ত তাঁরা যে বিমূর্তরীতির নিরীক্ষাধর্মী ছবিগুলো করেন, তা আমাদের আধুনিক চিত্রচর্চার দ্বিতীয় পর্যায় তৈরি করেছে।

এভাবে '৪০ থেকে '৬০-এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার দুটি পর্যায় নির্মিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঐতিহ্যের সমন্বয়ে অবয়বনির্ভর চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, যা উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ভাষা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পের বিমূর্তরীতিকে আত্মস্থ করে দেশজ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বিমূর্তরীতিতে চিত্র সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ের ('৪০ থেকে '৬০-এর দশক) চিত্রকলায় বাংলাদেশের শিল্পীরা পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পকে সক্রিয়ভাবে (actively) নিজেদের প্রসঙ্গে রূপান্তর (transform) করে নিজেদের মতো করে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে আমাদের শিল্প ইতিহাসবেত্তা ও সমালোচকেরা ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন ফয়েজুল আজিম এই পর্যায়ের শিল্পকে 'আঙ্গিকসর্বস্ব' বলেছেন (ফয়েজুল, ২০০০ : ১০০-১০১)।[৫] আবুল মনসুর আমিনুলদের শিল্পকে 'বিন্যাস চাতুর্য' এবং 'চিত্রতলের দৃষ্টি সুখকর বিন্যাস' বলে অভিহিত করেছেন (আবুল মনসুর, ২০০৭ : ৪০-৪১)[৬] এবং সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম 'social compulsion' ভাবনার কথা বলেছেন (সৈয়দ মনজুরুল, ১৯৯৯ : ২০-২১)।[৭] এই মতামতগুলোর বিপরীতে এই অভিসন্দর্ভে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছি আমাদের শিল্পীরা পাশ্চাত্যের রীতিকে নিষ্ক্রিয়ভাবে (Passively) গ্রহণ করেননি, তাঁরা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জারিত করে নিরীক্ষার মাধ্যমে চিত্রের নতুন ভাষা তৈরি করেছেন। এই নতুন ভাষা আমাদের নিজস্ব আধুনিক চিত্রভাষা। জয়নুলদের দিয়ে এই আধুনিকতার শুরু হয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি, তা হলো সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আমিনুলদের কাজ সম্পর্কে লিখেছেন, 'Abstraction and non-figurative art became the primary means of expression for many, with a hugely creative and new interpretation given to colour, line, space and texture. For many viewers, these abstract compositions were synonymous with modern art' (Syed Manzoorul, 1999 : 19)। তিনি আরো লেখেন :

> This attitude certainly helped bridge the gap that existed between 'modern' (in the sense of abstract) art and the viewing public. By the sixties, therefore, modern art in Bangladesh had assumed its own pronounced content, and its own language of expression' (Syed Manzoorul, 1999 : 20).

এ ছাড়া এই অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে মুর্তজা বশীরের উক্তি আলোচনায় এসেছে, যেখানে তিনি বলেছেন, 'বিমূর্ত ছবি আঁকছি না বলে একধরনের হীনম্মন্যতা ও বন্ধুদের কাছে অনাধুনিক হিসেবে গণ্য হচ্ছি' (মুর্তজা, ২০১৪ : ৪৩)। আমিনুলদের ছবি নিয়ে এই যে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে বিমূর্ততাই হলো আধুনিক শিল্প, সেটিও খণ্ডন করা জরুরি মনে করছি। কারণ, আধুনিক শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্রত্য এবং নিরীক্ষাধর্মিতা। সেদিক থেকে দেখতে গেলে জয়নুলদের '৪০-এর দশক থেকে নির্মিত ছবিতে আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং তাঁদের ছবির মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার চর্চা শুরু হয়েছে।

এভাবে '৪০ থেকে '৬০-এর দশকের মধ্যে চিত্রকলাচর্চার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা আমাদের নিজস্ব আধুনিক চিত্রকলার ভাষা তৈরি করেছেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই চিত্রচর্চার অবস্থান কোথায় বা কীভাবে এর অবস্থান নিরূপণ করা হবে? গীতা কাপুর ভারতের ক্ষেত্রে লিখেছেন, '...peripheral initiatives-national, regional, local interventions, seen as culture-specific, are assiduously appropriated for the sake of that higher universal purpose (Geeta, 2001 : 296)। তিনি আরো লেখেন, উত্তর উপনিবেশিক তত্ত্বে তৃতীয় বিশ্বের সকল টেক্সটই আবির্ভূত হয় জাতীয়তার রূপক (rational allegories) হিসেবে। এই জাতীয়তার রূপক হারিয়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের অখণ্ড ধারণাকে পুনরুদ্ধার করেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের আনুশাসনিক ভাবমূর্তিকে পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে এই পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া চলেছে (Geeta, 2001 : 279)।[৮] গীতা কাপুরের এই ভাবনার মধ্যে ফ্রেডরিক জেমসনের ভাবনার প্রভাব বিদ্যমান (Geeta, 2001 : 278)। ফ্রেডরিক জেমসন (Fredric Jameson) ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> Third-world texts, even those which are seemingly private and invested with a properly libidinal dynamic-necessarily project a political dimension in the form of national allegory : *the story of the private individual destiny is always an allegory of the embattled situation of the public third-world culture and society* (Jameson, 1986 : 69).

জেমসন তৃতীয় বিশ্বকে রূপক হিসেবে এবং প্রথম বিশ্বকে ব্যক্তিগত বনাম গণজীবন হিসেবে বর্ণনা করেছেন (Strongman, 2008 : 4)। প্রথম বিশ্ব সম্পর্কে তিনি লেখেন :

> ...the culture of the western realist and modernist novel, is a radical split between the private and the public, between the poetic and the political, between what we have come to think of as the domain of sexuality and the unconscious and that of the public world of classes, of the economic, and of secular political power... We have been trained in a deep cultural conviction that the lived experience of our private existence is somehow incommensurable with the abstractions of economic science and political dynamics (Jameson, 1996 : 69).

জেমসন তৃতীয় বিশ্বকে অনগ্রসর হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যেখানে মানবজাতির সামাজিক সংগঠন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যে কারণে সেখানে ব্যক্তির নিজস্ব সৃষ্টিশীল এবং মুক্ত উদ্দীপনা জনসাধারণ, সম্প্রদায় বা জাতীয়তার আশ্রয় ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব হয় না (Strongman, 2008 : 4-5)।[৯] জেমসন যেভাবে প্রথম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে বিভাজন করেছেন তা প্রশ্নবিদ্ধ (Strongman, 2008 : 5)।[১০] মূলত তৃতীয় বিশ্বের তত্ত্ব নির্মাণের মধ্যেই এই অবমূল্যায়নের কৌশল নিহিত ছিল। তিনটি বিশ্বের ধারণা উদ্ভূত হয়েছে 'ইউরো-আমেরিকান সামাজিক বিজ্ঞানের আধুনিকতার ডিসকোর্সের' অনিচ্ছাকৃত ফল হিসেবে যা বিকাশ লাভ করে ১৯৫০-এর দশকে। রাজনৈতিক অর্থে আধুনিকায়ন ডিসকোর্সের লক্ষ্য ছিল ইউরো-আমেরিকান আধিপত্যকে স্থির এবং প্রসারিত করা (Smit, 2013 : 2)।[১১] এ প্রসঙ্গে ইজাজ আহমেদ বলেন, জেমসন বারবার জোর দিয়েছেন জাতীয় অভিজ্ঞতার ওপর, যা তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করেছে। জেমসনের মতে, এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে শুধু 'জাতীয়তার' রূপক হিসেবে। কিন্তু এই 'জাতীয়' শব্দটি সমাজ, সংস্কৃতি বা সমষ্টি ইত্যাদি বিস্তৃত ক্ষেত্রের একটি অংশ। সমাজের একজন ব্যক্তি তার একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা শ্রেণি, লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্মীয় সম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল, গ্রাম, বন্দিনিবাস ইত্যাদি বিভিন্ন সমষ্টিগত প্রেক্ষিতের ভাবনার সাথে যুক্ত করে। এবং এ কারণে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত এবং গণজীবনের মিশ্রণ। ব্যক্তিগত কখনো কখনো 'জাতীয়তা'কে সম্পৃক্ত না করেও তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে রূপকে পরিণত করে (Aijaz, 1995 : 82)।[১২] কাজেই এখানে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চিত্রচর্চাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের শ্রেণি বিভাজনে না ফেলে এর সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শ্রেণি ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে শিল্পীর অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পচর্চার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে এবং এ অভিসন্দর্ভে সেভাবেই চিত্রচর্চার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে প্রতিরোধ, জাতীয়তাবাদ এবং আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়াও এসেছে। তবে এরই সাথে শিল্পীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, রুচি, ভাবনাও স্থান পেয়েছে। যেমন, জয়নুল আবেদিনের বিদেশভ্রমণে স্বদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা জাগ্রত হওয়া, নিজ গ্রামের প্রতি তাঁর অনুরাগ কিংবা আমিনুলদের বিদেশে শিল্পশিক্ষা লাভের ফলে চিত্ররীতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন ইত্যাদি। এ ছাড়া জয়নুল এককভাবে '৫০ ও '৬০-এর দশকের শিল্পচর্চায় অনেকখানি প্রভাব ফেলেছেন। শিল্পচর্চা নিয়ে জয়নুলের ব্যক্তিগত ভাবনা শিল্পীদের মানস চেতনায় প্রভাব ফেলেছে। সামগ্রিকভাবে শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবন এবং বাইরের জগতের যৌথ অভিজ্ঞতা নিয়েই তাদের শিল্পকর্ম রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের চিত্রকলা বা শিল্পকলা হিসেবেই এই চর্চা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জায়গা করে নিতে পারে। দিপেশ চক্রবর্তী যেমন বলেছেন :

> No Country, thus, is a model to another country, though the discussion of modernity that thinks in terms of "catching up" precisely posits such models. There is nothing like the "cunning of reason" to

> ensure that we all converge at the same terminal point in history in spite of our apparent, historical differences. Our historical differences actually make a difference. This happens because no human society is a *tabula rasa*. The universal concepts of political modernity encounter pre-existing concepts, categories, institutions and practices through which they get translated and configured differently (Dipesh, 2008 : xii).

বাংলাদেশের অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই কালের পরিক্রমায় সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রে রূপ লাভ করেছে। প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চল তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। বাংলাদেশের বিশ শতকের '৪০, '৫০ ও '৬০-এর দশকের চিত্রকলাচর্চা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় একটি পর্যায়ের সাংস্কৃতিক বিকাশকে চিহ্নিত করে। এ অঞ্চলের আধুনিক চিত্রকলা নির্মাণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় এই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে নির্দিষ্ট চিত্রভাষা রীতি গঠনের মাধ্যমে। আমাদের আধুনিক চিত্রকলার গোড়াপত্তন এবং বিকাশ এই সময়ে হয়েছে চিত্রভাষারীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এবং এই চিত্রভাষা রীতির সৃষ্টি আমাদের ইতিহাস নির্মাণের অংশ হয়েছে। '৪০, '৫০ ও '৬০-এর দশকের চিত্রকলা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের চিত্রকলা তথা শিল্পকলার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

টীকা

[১] 'As a colonised nation, modern art evolved around the discourses of 'tradition' and 'identity' in the subcontinent. 'Tradition' has been used as an oppositional force in the struggles of nineteenth-century nationalism in the process of decolonisation... 'identity' and the 'traditions' which created that identity, were again put into play by Bangladeshis against the hegemony of West Pakistan, as an oppositional force of resistance during the movement for autonomy and finally, independence' (Lala Rukh, 2019 : 118).

[২] 'Identity that was used by nationalism against colonialism or against local dictatorial regimes had turned to tradition, the nature of Bangladesh, rural or working people as subjects and mostly folk art for formal inspiration and carefully selected a secular path because of the reason for the existence of Bangladesh'(Lala Rukh, 2019 : 135).

[৩] 'Consider again Tagore's Santiniketan and the aesthetic project as realized by the three luminaries at Kala Bhavana : Nandalal Bose, Benodebehari Mukherjee, Ramkinkar Baij. ...Rather than distancing alternative civilizations into objects to be processed by western subjectivity, the nationalist intelligentsia makes some genuinely anxious, and responsible appropriations within their own societies' (Geeta, 2001 : 279).

[৪] 'But it must be stressed that the history of diffusion rarely follows chronological niceties; as a transfer of elements from one culture to another, diffusion necessarily confuses. This is how a civilization spreads and grows. Ultimately, the whole issue of the newness of art in involved, for in a sense, of course, all art is derived from sources, and most culture is made up in large part of elements once diffused in chaotic recombinations from elsewhere...We can see the African model that moved Picasso, and we can see the Matissean model that moved someone else. The useful question now is not who first thought of the look, but what did each culture or artist do with the look, how it was used, contextualized, filled with meaning-how it functioned' (McEvilley, 1992 : 118-119).

[৫] 'বাংলাদেশের শিল্পান্দোলনের শুরুর পর্যায়ে এর ভ্রান্তির দিকটি হয়তো এই যে, এই সময়ে শিল্পীরা শিল্পকলায় আঙ্গিককে বিশেষ করে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শিল্পাঙ্গিককে সর্বস্ব ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। নির্মিতকে মুখ্য বিবেচনা করে একটি শিল্পকলার জন্মের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও এর দার্শনিক দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিল। ফলে খোলস সর্বস্ব অভিনব আঙ্গিক চর্চাই হয়ে উঠেছিল এই শিল্পান্দোলনের মূল প্রবণতা...

বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ, অতীতমুখী, গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে স্বাভাবিকভাবেই সেই পরিস্থিতি অনুপস্থিত ছিল, যা পাশ্চাত্যে বিমূর্তাশ্রয়ী শিল্পান্দোলনের জন্ম দিয়েছে। ফলে এ শতকের পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশের আধুনিক বিমূর্ত শিল্পীরা পাশ্চাত্য শিল্পের আঙ্গিক অর্থাৎ বাইরের আবরণটুকু গ্রহণ করে, শিল্পচর্চায় আঙ্গিক সর্বস্বতাকে মুখ্য করে তুলেছিল' (ফয়েজুল, ২০০০ : ১০০-১০১)।

[৬] 'পঞ্চাশের দশকের প্রধান শিল্পীদের দুএকজন ছাড়া অন্য সকলেই ষাটের দশকে পরিণত হয়েছিলেন পুরোপুরি বিমূর্তধারার শিল্পীতে এবং শিল্পচর্চা পরিণত হয়েছিল চিত্রতলে শুধু একটি বিমূর্ত বিন্যাস রচনায়। বিষয় বা বক্তব্যের চেয়ে মাধ্যমের দক্ষতা এবং বিন্যাসের চাতুর্যই শিল্পীদের কাছে অধিকতর বিবেচ্য হয়ে উঠেছিল এ সময়। অধিকাংশ শিল্পীই পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন বিমূর্ত শৈলীর অনুকরণে প্রবৃত্ত হন এবং বিমূর্তারও বিশেষ কয়েকটি ধরন গড়ে ওঠে। অবশ্য কিছু শিল্পী আধা-বিমূর্ত ঢঙে দেশীয় বিষয় ও প্রেক্ষাপটে এ সময় চিত্র রচনা করেছেন, কারো কারো মধ্যে ঐতিহ্যের বিভিন্ন মোটিফ সংযোজনের প্রয়াসও দৃষ্টিগোচর। তবে চিত্রতলের দৃষ্টিসুখকর বিন্যাসই মুখ্য বিবেচ্য হিসেবে বিরাজ করেছে' (আবুল, ২০০৭ : ৪০-৪১)।

[৭] 'The fifties painters took to abstraction as their predecessors took to depicting social realities for two reasons. First, it was an inner compulsion, an urge to express themselves through a language, through metaphors, images, sensibilities and symbolism that they thought most clearly represented their artistic, emotional and intellectual understanding of their art. The second reason can be ascribed, in a large measure, to a social compulsion. The establishment-meaning the state, the clergy, the power blocks and the conservative class that dominated the power blocks-openly disapproved of any human or figurative representation as it supposedly contravened religious strictures : therefore sculptural art was denounced as simple iconography, and depiction of human figure was branded as 'Hindu culture' and 'anti-Islamic' (Syed Manzoorul, 1999 : 20-21).

[৮] '...in the postcolonial ethos all third-world texts appear to be national allegories, all national allegories attempts to restore conceptual wholeness to lost communities through the process of decodifying precisely the canonical images of an inherited tradition' (Geeta, 2001 : 279).

[৯] 'The differences that Jameson outlines for the First World as private versus public, and the Third World as allegorical, serves to re-articulate a developmental discourse which emplots the Third World as backward and at a stage in which the basic structures of human societal organization have not yet been sufficiently established as to allow for the free and disencumbered creative spirit of the subject to narrate its "inner truth" without recourse or parallel to the public, the communal or the national' (Strongman, 2008 : 4-5).

[১০] '...the division he makes between the First and Third Worlds is questionable...' (Strongman, 2008 : 5).

[১১] 'The three worlds idea itself emerged as an unintended consequence of "modernization discourse in Euro-American social science",[20] which was developed in the 1950s as a response to the "entanglement of colonialism and anti-colonial movements in an emergent Cold War that impelled the globe to division between two major power blocs"-[21] In political terms, modernization discourse aimed to ensure and prolong Euro-American hegemony,...'(Smit, 2013 : 2).

[১২] 'Jameson insists over and over again that the *national* experience is central to the cognitive formation of the Third World intellectual, and that the narrativity of that experience takes the form exclusively of a 'national allegory'. But this emphatic insistence on the category 'nation' itself keeps slipping into a much wider, far less demarcated vocabulary of 'culture', 'society', 'collectivity', and so on. ...

[O]ne may indeed connect one's personal experience to a 'collectivity'-in terms of class, gender, caste, religious community, trade union, political party, village, prison-combining the private and the public, and in some sense 'allegorizing' the individual experience, without involving the category of 'the nation' or necessarily referring back to the 'experience of colonialism and imperialism'᾽ (Aijaz, 1995 : 82).

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান, ১৯৯৯। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, প্রতিভাস, কলকাতা।

আনিসুজ্জামান, ২০০৩। *দেবদাস চক্রবর্তী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

আবুল মনসুর, ২০০৩। *রশিদ চৌধুরী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল মওদুদ, ১৯৬৯। *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

আবুল মনসুর, ২০০৭। 'ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল' *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

আবুল মনসুর, ২০১৬। *শিল্পকথা, শিল্পীকথা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম, ২০০৩। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর প্রথম পর্ব ১৯৪৭-১৯৫৬*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

উর্মি রহমান, ১৯৯০। 'কামরুল হাসানের একটি সাক্ষাৎকার' *কামরুল হাসান* (সম্পাদনা : আবুল হাসনাত), থিয়েটার, ঢাকা।

উমা চক্রবর্তী, ২০১১। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ব্রাত্যজনের চোখে*, সেতু, কলকাতা।

এ আর দেশাই, ২০০১। *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, (ভাষান্তর : মনস্বিতা সান্যাল), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

এনায়েতুর রহিম, ২০০৭। 'মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব' *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস* (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদক : সাজাহান মিয়া), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, ২০১৫। *ওরিয়েন্টালিজম*, (ভাষান্তর : ফয়েজ আলম), সংবেদ, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ, ১৯৮৩। *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ওসমান জামাল, ২০০৪। *আমিনুল ইসলাম*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহমদ, ১৯৭০। *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

কামাল উদ্দিন আহমেদ, ২০০৭। 'স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস*, (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদক : সাজাহান মিয়া), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

কামরুল হাসান, ২০১০। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আজিজুল হক), প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

কাইয়ুম চৌধুরী, ১৯৯০। 'কামরুল ভাই', *কামরুল হাসান*, (সম্পাদনা : আবুল হাসনাত), থিয়েটার, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী, ২০১৪। *বাঙলা ভাগ হল, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

জন আর ম্যাকলেন, ২০০৭। 'বঙ্গবিভাগ, ১৯০৫ : রাজনৈতিক বিশ্লেষণ', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস*, (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদক : সাজাহান মিয়া), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

জাহেদা আহমদ, ২০০৭। 'রাষ্ট্র ও শিক্ষা', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদক : সাজাহান মিয়া), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

ড. হারুন-অর-রশিদ, ২০০৩। *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ড. আবুল ফজল হক, ২০১৪। *বাংলাদেশ : রাজনৈতিক সংস্কৃতি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, ড. এ বি এম মাহমুদ এবং ড. সিরাজুল ইসলাম, ২০১৩। *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

ডি এন ঝা, ২০০৮। *আদি ভারত একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (অনুবাদ : গৌরীশংকর দে), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

ঢালী আল মামুন, ২০০৭। 'মুর্তজা বশীর', *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* (সম্পাদনা : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

তপোধীর ভট্টাচার্য, ২০০৪। *আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস, ২০০৮। *বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বরূপ*, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা।

নজরুল ইসলাম, ২০০২। *জয়নুল আবেদিন : তাঁর কাজ ও কথা*, সমাবেশ, ঢাকা।

নাসিমা হক মিতু, ২০০৭। 'আবদুর রাজ্জাক' *চারু ও কারু কলা, 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদনা : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

নেপাল মজুমদার, ১৪০২। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট : রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ', *পশ্চিমবঙ্গ*, অবনীন্দ্র সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।

নাসিমা হক মিতু, ২০০৭। 'রশিদ চৌধুরী' *চারু ও কার ্কলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদনা : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

নিসার হোসেন, ২০০৭। 'জয়নুল আবেদিন', *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

নজরুল ইসলাম, ২০১২। 'ষাটের দশকের শিল্প ও শিল্পী : বিমূর্ত আঙ্গিকের প্রাধান্য', *শিল্প ও শিল্পী*, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা।

পরিতোষ সেন, ২০০২। *কিছু শিল্পকথা*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

ফয়েজুল আজিম, ২০০০। *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর, ২০০৭। 'ভাষা আন্দোলন', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস*, (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদক : সাজাহান মিয়া), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

বেলাল চৌধুরী, ১৯৮৮। 'সুন্দরীভবনের রশিদ চৌধুরী', *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর ৮৭–মার্চ ১৯৮৮, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ১৯৯০। *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ১৯৯১। *কামরুল হাসান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ২০০৫। *ইতিহাস নির্মাণের ধারা*, বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা।

মাহমুদ আল জামান, ১৯৯০। 'কামরুল হাসানের রমণীরা', *কামরুল হাসান*, (সম্পাদনা : আবুল হাসনাত), থিয়েটার, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান, ২০১২। *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

মৃণাল ঘোষ, ২০০৫। *বিংশ শতাব্দীর ভারতের চিত্রকলা আধুনিকতার বিবর্তন*, প্রতিক্ষণ, কলকাতা।

মাহমুদ আল জামান, ২০০৪। *কাজী আবদুল বাসেত*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মইনুদ্দীন খালেদ, ২০০৭। 'আমিনুল ইসলাম', *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মইনুদ্দীন খালেদ, ২০০৭। 'হামিদুর রাহমান' *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মাহমুদুল হোসেন, ২০০৭। মোহাম্মদ কিবরিয়া, *চারু ও কারু কলা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদনা : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

মাহমুদ আল জামান, ২০০২। *সফিউদ্দীন আহমেদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মুর্তজা বশীর, ২০১৪। *আমার জীবন ও অন্যান্য*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

রানা রাজ্জাক, ২০০৭। 'সাংস্কৃতিক জীবনে বিবর্তন : আধুনিক যুগ', (মূল ইংরেজি-অনুবাদক, এ বি এম শামসুদ্দীন আহমদ), *সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪*, (সম্পাদনা : কে এম মোহসীন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

রোজিনা কাদের, ২০০৪। *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সুবর্ণ, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান, ১৯৯৭। *বাংলাদেশের উপান্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ, ১৯৪৭-১৯৮৭*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৪। 'পূর্ব ও পশ্চিম', *রবীন্দ্রনাথের প্রগতিভাবনা নির্বাচিত প্রবন্ধ*, (সংকলন ও সম্পাদনা : অলোক রায়), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।

রবিউল হুসাইন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ১৯৯৮। *সৈয়দ জাহাঙ্গীর*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী, ১৯৮৬। 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরী', *বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা*, (সম্পাদনা : শোভন সোম এবং অনিল আচার্য), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলিকাতা।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২। 'ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং আধুনিকতা', *আমাদের আধুনিকতার কয়েকটি দিক*, (সম্পাদনা : পরিমল ঘোষ), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।

শাওন আকন্দ, ২০০৯। 'একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা', *শিল্পরূপ*, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা।

শাওন আকন্দ, ২০০৯। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতাসংগ্রাম : বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা, *শিল্পরূপ*, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ঢাকা।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১৪১৭। *নিবেদিতা লোকমাতা, চতুর্থ খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

শ্রী অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৬৯। *ভারতের শিল্প ও আমার কথা*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলিকাতা।

শোভন সোম, ১৯৯৮। *শিল্পশিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, নিউ দিল্লি।

শোভন সোম, ১৪০২। 'জয়নুল আবেদিন', *নিরন্তর*, চতুর্থ সংখ্যা, বর্ষা সংকলন, শ্রাবণ, ঢাকা।

শোভন সোম, ১৪১২। 'কামরুল হাসান : রঙে রূপে রেখায়', *নিরন্তর*, ষষ্ঠ সংখ্যা, শীত সংকলন পৌষ, ঢাকা।

শোভন সোম, অনিল আচার্য (সম্পাদিত), ১৯৮৬। *বাংলা শিল্প সমালোচনার ধারা*, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা।

শোভন সোম, ১৯৯৩। *ওপেনটি বাইস্কোপ*, ক্যাম্প, কলকাতা।

শোভন সোম, ২০০৭। 'সফিউদ্দীন আহমেদ' *চারু ও কারু কলা*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদনা : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

শাহাদুজ্জামান, ১৯৯০। 'সুলতানের সঙ্গে আলাপ', *নূ*, সাহিত্য ও শিল্প সংকলন, সংখ্যা-১, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০৭। *বাঙালির জাতীয়তাবাদ*, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম, ২০০৭। 'রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, *প্রথম খণ্ড*, *রাজনৈতিক ইতিহাস*, (সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদক : সাজাহান মিয়া), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম, ২০০৭। 'সামাজিক চিন্তা ও চেতনা', (মূল : ইংরেজি অনুবাদক, শাহীদা আখতার), *সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪*, (সম্পাদনা : কে এম মোহসীন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সাঈদ-উর-রহমান, ২০০১। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সালাহ্উদ্দীন আহমদ, ২০০০। *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

স্বপন বসু, ২০১১। *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, সুবর্ণ, ঢাকা।

সুপ্রকাশ রায়, ২০০৯। *ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম*, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা।

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০৯। *আধুনিক ভারত বৃটিশরাজ থেকে পূর্ণ স্বরাজ* ১৮১৮-১৯৬৪, মিত্রম্, কলকাতা।

স্বাতী ঘোষ, অশোক সরকার, ২০১৫। *কবির পাঠশালা পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের ইতিহাস*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ১৯৯৮। *কামরুল হাসান জীবন ও কর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০০৪। *নিগর্স ও মানবের গাথা : জয়নুল আবেদিন চিত্রভুবন*, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০০৭। 'কাইয়ুম চৌধুরী', *চারু ও কারু কলা*, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদনা : লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৩। *সফিউদ্দীন আহমেদ*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৫। *জয়নুল আবেদিন সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৫। *কাইয়ুম চৌধুরী শিল্পীর একান্ত জীবনকথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ২০০৪। *মোহাম্মদ কিবরিয়া*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২। *ঠাকুরবাড়ীর কথা*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

হাসনাত আবদুল হাই, ২০০৪। *মুর্তজা বশীর*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

হাসান উজ্জামান, ১৯৯২। *বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম*, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।

Abrams, M. H. 1993. *A Glossary of Literary Terms*, Prism Books Pvt Ltd. Bangalore, India.

Aijaz Ahmad, 1995. 'Jameson's Rhetoric of otherness and the 'National Allegory'' *The Post-colonial studies reader*. Ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths & Helen Tiffin. Routledge, London and New York.

Archer, Mildred. 1992. *Company Paintings Indian Painting of the British Period*, Victoria and Albert Museum, Mapin Publishing Pvt. Ltd. India.

Archer, Mildred. Archer, W G 1955. *Indian Painting for the British 1770-1880*, Oxford University Press, London.

Archer, Mildred. Lightbown, Ronald. 1982. *India Observed India as Viewed by British Artists 1760-1860*, Victoria and Albert Museum, London.

Arnason, H H 1977. *A History of Modern Art*. Thames and Hadson, London.

Ashcroft, Bill. Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen. 2007. *Post-Colonial studies The key concepts*. Routledge, London and New York.

Asok Kumar Das. 1978. *Mughal Painting During Jahangir's Time*. The Asiatic Society, Calcutta, India.

Bender, Thomas. 1984. 'Behind the Scene of Abstract Expressionism'. *The New York Times*. Archives, https//www.nytimes.com.

Burger, Peter. 1992. 'On the Problem of the autonomy of Art in Bourgeois Society'. *art in Modern culture an Anthology of Critical Texts.* (Ed. Francis Frascina and Jonathan Harris). Phaidon Press Limited, London.

Battaglia, Louis. 2008. 'Clement Greenberg : A Political Reconsideration'. *Shift. Queen's Journal of Visual and Material Culture*. Issue 1, shiftjournal.org.

B K Jahangir. 1964. 'Aminul Islam', *Contemporary Arts in Pakistan*. Ed. Jalal Uddin Ahmed. Autumn, Vol-11, No.3.

B V Rao. 1989. *History of Modern Europe 1789-1975*. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi.

Cahoone, Lawrence E. 1996. *From Modernism to Postmodernism: An Anthology*. Blackwell, UK, USA.

Chilvers, Ian. Osborne, Harold & Farr, Dennis. (Edited). 1988. *The Oxford Dictionary of Art.* Oxford University Press, New York.

Cockcroft, Eva. 2000. 'Abstract Expressionism Weapon of the cold War'. *Pollock and after The Critical Debate*. Ed. Francis Frascina, Routledge, London & New York.

Dipesh Chakraborty. 2000. *Provincializing Europe Postcolonial Thought and Historical Difference.* Princeton University Press, Princeton and Oxford, New Jersey and Oxfordshire.

Geeta Kapur. 1982. 'Modern Indian Painting : A Synoptic View'. *Journal of Arts and Ideas*. Oct-Dec.

Geek Kapur. 2001. *When was Modernism*. Tulika Books, New Delhi, India.

Golding, John. 1997. 'Cubism', *Concepts of Modern Art From Fauvism to Postmodernism*. Thames and Hudson, London.

Havell E B 1980. *Indian Sculpture and Painting with an explanation of Their Motives and Ideals*. Cosmo Publications, New Delhi, India.

Holler, Manfreed J. Klose-Ullamann, Barbara. 2010. 'Abstract Expressionism as a weapon of Cold War', *https: www.researchgate.net>publication.*

Jalal Uddin Ahmed. 1962. *Art in Pakistan.* Pakistan Publication, Karachi.

Jameson, Fredric. 1986. 'Third-World literature in the Era of Multinational Capitalism'. *Social Text.* Autumn, No. 15, PP. 65-88, Duke University Press, Stable URL : https ://www.jstor.org/stable/466493.

Ladani, Zahra Junnessari. 2014. 'William Faulkner's Dialogue with the Pastoral Genre'. *International Letters of Social and Humanistic Sciences.* Vol. 36, Switzerland.

Livasgani, Raimond. 2004. *Artists and Prints : Masterworks from the Museum of Modern Art*. Deborah Wye. The Museum of Modern Art, New York, moma.org.

Lala Rukh Selim. 1998. '50 Years of the fine Art Institute' *ART*. Vol. 4. No. 2, October-December, Dhaka.

Lala Rukh Selim. 2019. 'Globalisation and local Anxieties in the art of Bangladesh : The interface of history and the contemporary'. *Iintersections of contemporary Art Anthropology and Art History in South Asia Decoding visual worlds*. Ed. Sasanka Perara and Dev Nath Pathak, Springer, Switzerland.

Murphy, Veronica. 1990. 'The Later Provincial Courts and British Expansion'. *Arts of India : 1550-1990*. Ed. John Guy and Deborah Swallow. Victoria and Albert Museum, Mapin publishing pvt Ltd India.

McEvilley, Thomas. 1992. *Art and Otherness Crisis in Cultural Identity*. Documentext, McPherson and Company, New York.

Neelima Vashishtha. 2010. *Tradition and Modernity in Indian Arts During the Twentieth Century*. Indian Institute of Advanced Study, Shimla, Aryan Books International, New Delhi.

Partha Mitter. 1992. *Much Maligned Monsters A History of European Reactions to Indian Art*. The University of Chicago Press, Chicago and London.

Partha Mitter. 1994. *Art And Nationalism in Colonial India 1850-1922 Occidental Orientations.* Cambridge University Press, Great Britain.

Partha Mitter. 2003. 'Mechanical reproduction and the world of the colonial artists' *Beyond Apprearances? Visual Practices and Ideologies in Modern India*. Ed. Sumathi Ramaswamy, Sage Publication, New Delhi.

Partha Mitter. 2007. *The Triumph of Modernism India's Artists and the Avant-Garde 1922-1947*. Reakton Books, London.

Partha Mitta. 2008. 'Decentering Modernism : Art History and Avant-Garde Art from the Periphery'. *The Art Bulletin*, Vol. 90. No.4 December, pp. 531-548, College art Association, http://www.jstor.org

Partha Mitter. 2014. 'Modern Global Art and Its Discontents'. *Avant-Garde Critical Studies*. Vol-30.p.35.https://www.societyforasianarh.org.

Rhodes, Colin. 1994. *Primitivism And Modern Art*. Thames and Hudson, New York.

Suler, John. 2013, *Phootographic Psychology : image and Psyche.* Truecenter Publishing.com.

Shri Jogesh Chandra Bagal. 1966. 'History of the Govt. College of Art and Craft'. *Centerary Government College of Art Craft*. Calcutta.

S. Amjad Ali. 1959. 'National Art Exhibition'. *Pakistan Quarterly*. Vol. viii, No.4 Spring.

Schapiro, Meyer. 1979. 'Nature of Abstract Art (1937)' *Modern Art 19th and 20th Centuries selected Papers*. George Braziller, New York.

Strongman, Roberto. 2008. 'A Caribbean Response to the Question of Third World National Allegories : Jameson, Ahmad and the Return of the Repressed'. *Anthurium : A Caribbean Studies Journal*. Volume 6, Issue 2, December, http://scholarlyrespository.miami.edu/anthurium.

Smith, Nico. 2013. 'The Continued Relevance of the 'Third World' concept'. https://www.e-ir.info/2013/03/26/the-continued-relevance-of-the-third -world-concept/.

Syed Manzoorul Islam. 1999. 'From Bengal School to Bangladeshi Art : A Brief History'. *Contemporary Art in Bangladesh, Special Volume, Arts and the Islamic world*. Chairman Board of Editors : Muazzam Ali, No. 34-Autumn, Art and Islamic world (UK) Limited.

Tapati Guha-Thakurta. 1992. *The Making OF A New 'Indian' Art, Artists, aesthetics and nationalism in Bengal c. 1850-1920*. Cambridge University Press, Great Britain.

Tapati Guha-Thakurta. 1995. "Visualizing the Nation the Iconography of a 'National Art' in Modern India". *Journal of Art and Ideas*. Numbers 27-28, March.

William, Raymond. 1988. *Keywords a Vocabulary of Culture and Society.* Fontana Press. London.

চিত্রসূচি ও প্রাপ্তিস্বীকার

চিত্র-১ : অর্জুন ও উর্বশী, ৩৭২.৫×৬৮.৫ সেমি, ওলিওগ্রাফ, ১৯০০, রামাপদ ব্যানার্জী

উৎস : *Art of Bengal 1850-1950*, An Exhibition organized by Caltutta Metropolitan Festival of Art to celebrate the 50th year of India's Independence, Calcutta Metropolitan Festival of Art, 13 December-24 December 1997, Gaganendra Pradarshan Shala, Calcutta Information Centre, Page-40.

চিত্র-২ : ভারতমাতা, জলরং, ১৯০৫, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎস : *ঠাকুরবাড়ির চিত্রকলা*, আর পি জি চিত্রকলা, আর পি জি এন্টারপ্রাইজ, কলিকাতা, ১৯৯১

চিত্র-৩ : শম্ভুগঞ্জ ঘাট, কাগজে কলম, ১২.৫×১৮.৫ সেমি. ১৯৩৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : জয়নুল আবেদিন, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-৬৪

চিত্র-৪ : ঘাটে বাঁধা নৌকা, ৩৯×২৯ জলরং, ১৯৩৬, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *Early Works of Shilpacharya Zainul Abedin*, 19-28 February 2009, গ্যালারী চিত্রক, ঢাকা

চিত্র-৫ : পল্লী প্রাণ, ক্যানভাসে তেলরং, ১৯২১, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

উৎস : *The Triumph of Modernism, India's Artists and the Avant-garde, 1922-1947*, Partha Mitter, Oxford University Press, 2007 New Delhi, Page-134

চিত্র-৬ : পদ্মা নদীতে সূর্যাস্ত, ক্যানভাসে তেলরং, ৩০×৪৭ সেমি, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী

উৎস : *Art of Bengal 1850-1950*, An Exhibition organized by Caltutta Metropolitan Festival of Art to celebrate the 50th year of India's Independence, Calcutta Metropolitan Festival of Art, 13 December-24 December 1997, Gaganendra Pradarshan Shala, Calcutta Information Centre, Page-93

চিত্র-৭ : Bengal Tiger, কাগজে পেনসিল স্কেচ, ১৯২২, অতুল বসু

উৎস : *The Triumph of Modernism, India's Artists and the Avant-garde, 1922-1947*, Partha Mitter, Oxford University Press, 2007 New Delhi, পৃষ্ঠা-১৩১

চিত্র-৮ : ব্রহ্মপুত্র নদীতে নৌকা, জলরং, ৩৯×২৯ সেমি, ১৯৩৯, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *Early Works of Shilpacharya Zainul Abedin*, 19-28 February 2009, গ্যালারি চিত্রক, ঢাকা

চিত্র-৯ : দুমকা, কাগজে জলরং, ২৮.৫×৩৮.৫ সেমি, ১৯৪৫, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৫১

চিত্র-১০ : Drawing the Net, ড্রাইপয়েন্ট এচিং, ১৯৩৮, মুকুল দে

উৎস : *Centenary*, Government College of Art Craft Calcutta, 1966

চিত্র-১১ : Santals in Birbhum landscape, line and wash on paper, c.1920s, নন্দলাল বসু

উৎস : *The Triumph of Modernism, India's Artists and the Avant-garde, 1922-1947*, Partha Mitter, Oxford University Press, 2007 New Delhi, পৃষ্ঠা-৯১

চিত্র-১২ : Santal Family, Cast Cement, ১৯৩৮, রামকিঙ্কর বেইজ

উৎস : *The Triumph of Modernism, India's Artists and the Avant-garde, 1922-1947*, Partha Mitter, Oxford University Press, 2007 New Delhi, পৃষ্ঠা-৯৭

চিত্র-১৩ : দুর্ভিক্ষ চিত্র-১৪, কালি ও তুলি, ১৯৪৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৮

চিত্র-১৪ : দুর্ভিক্ষ চিত্র-১৩, কালি ও তুলি, ১৯৪৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৭

চিত্র-১৫ : মাছ ধরা, কাগজে জলরং, ৫৭.৫×৭৭.৫ সেমি, ১৯৪৬, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৫৩

চিত্র-১৬ : ফসল তোলা, কাগজে জলরং, ৫৭.৫×৭৭.৫ সেমি, ১৯৪৮, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, আবুল মনসুর, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ২০১৩

চিত্র-১৭ : পলাশবনে সাঁওতাল নারী, তেলরং, ১৯৪৮, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *Zainul Abedin*, Pakistan Publication, 1958

চিত্র-১৮ : মা ও শিশু, কাগজে টেম্পেরা, ৫৪.৫×২৬ সেমি, ১৯৫১ জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৮৫

চিত্র-১৯ : কলসি কাঁখে নারী, কাগজে জলরং, ৫৪×৪১ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৮৬

চিত্র-২০: গুণটানা, কাগজে গোয়াশ, ২৫×৩৫ সেমি, ১৯৫৫, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৬

চিত্র-২১ : দুইবোন, কাগজে গোয়াশ, ২৯×২৩ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৮

চিত্র-২২ : নারীমুখ, বোর্ডে গোয়াশ, ৭০×৫৪ সেমি, ১৯৫০-এর দশক, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৮০

চিত্র-২৩ : পাইন্যার মা, কাগজে গোয়াশ, ৩২×২৩ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৯

চিত্র-২৪ : বাঙালি রমণী, কাগজে রঙিন কালি, ৩৫×২৬.৫ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৭০

চিত্র-২৫ : কৃষক, কাগজে জলরং, ৩০.৫×১৮ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৯৬

চিত্র-২৬ : মহিলার মুখ, কাগজে গোয়াশ, ২৬.৫×২০ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৯৩

চিত্র-২৭ : মা ও শিশু, কাগজে রঙিন কালি, ৩৩×১৯ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৮৮

চিত্র-২৮ : চিন্তা, কাগজে টেম্পেরা, ৩৭.৫×২৭ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৯৪

চিত্র-২৯ : মা ও শিশু, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৯০

চিত্র-৩০ : মা ও শিশু, কাগজে টেম্পেরা, ৫৩×৩৪.৫ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৮৫

চিত্র-৩১ : পরিবার, কাগজে জলরং, ৭০×৩৮ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৯৮

চিত্র-৩২ : বিশ্রামরত তিন রমণী, কাগজে টেম্পেরা, ৩৮×২৮ সেমি, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৯৩

চিত্র-৩৩ : চার মুখ, ক্যানভাসে তেলরং, ৪৩×৬৮ সেমি, ১৯৫৭, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৭১

চিত্র-৩৪ : মা ও শিশু, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-১৯০

চিত্র-৩৫ : আয়নাসহ বধূ, তেলরং, ১৯৫৩, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৭

চিত্র-৩৬ : বিদ্রোহী গরু, কাগজে জলরং, ৫৮.৫×৭৬ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬১

চিত্র-৩৭ : মই দেওয়া, কাগজে জলরং, ৫৮×৭৫ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬২

চিত্র-৩৮ : কালবৈশাখী, কাগজে জলরং, ৫৭×৭৫ সেমি, ১৯৫১, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৬৩

চিত্র-৩৯ : সংগ্রাম, টেম্পেরা, ৬০×২৪৩ সেমি, ১৯৫৪, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, সৈয়দ আজিজুল হক, প্রথমা, ২০১৫

চিত্র-৪০ : Yellow flowers, তেলরং, জুবেইদা আগা

উৎস : *Contemporary Arts in Pakistan*, Autumn 1961 : Vol. II, No. 3, Page-15

চিত্র-৪১ : Leda and the Swan, Shakir Ai

উৎস : *Contemporary Painting in Pakistan*, Marcella Nesom Sirhandi, Ferozsons (Pvt) LTD, Lahore-Karachi-Rawalpindi, 1992, Page-46

চিত্র-৪২ : Untitled, Sheikh Sufdar

উৎস : *Contemporary Painting in Pakistan*, Marcella Nesom Sirhandi, Ferozsons (Pvt) LTD, Lahore-Karachi-Rawalpindi, 1992, Page-48

চিত্র-৪৩ : Faces, তেলরং, ষাটের দশক, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *National Exhibition of paintings 64-65*, Pakistan Arts Council, Dacca

চিত্র-৪৪ : মাছ ধরা, ৬.৫×৩০ সেমি, কাগজে তেলরং, ১৯৬০-এর দশক, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *A Saga of Man and Nature, The Art of Zainul Abedin*, The National Zainul Festival 2004, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-৭৪

চিত্র-৪৫ : আত্মপ্রতিকৃতি, কাগজে কালি ও তুলি, ২১×১৬.৫ সেমি, ষাটের দশক, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-২৩১

চিত্র-৪৬ : প্রসাধন, ক্যানভাসে তেলরং, ৭৬×১০২ সেমি, ১৯৬৭, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *A Saga of Man and Nature, The Art of Zainul Abedin*, The National Zainul Festival 2004, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-৩৭

চিত্র-৪৭ : প্রসাধন, কাগজে কালি ও তুলি, ২১×১৬.৫ সেমি, ষাটের দশক, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-২৩১

চিত্র-৪৮ : কলসি কাঁখে রমণীরা, কাগজে মিশ্র মাধ্যম, ১৫.৫×২০.৫ সেমি, ১৯৬৫, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-২৩৩

চিত্র-৪৯ : নবান্ন (নবান্ন ছবির অংশ), কাগজে জলরং ও মোম, মূল ছবির মাপ ১০৫×১৯৫০ সেমি, ১৯৭০, জয়নুল আবেদিন

উৎস : *জয়নুল আবেদিন*, সম্পাদনা : Rosa Maria Falvo, স্কিরা (Skira) বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, পৃষ্ঠা-২৬৬

চিত্র-৫০ : মাছ ধরা, তেলরং, ৯১×৬১ সেমি, ১৯৫০, কামরুল হাসান

উৎস : কামরুল হাসান, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৮

চিত্র-৫১ : মা ও শিশু, জলরং, ৬০×৪৬ সেমি, পঞ্চাশের দশক, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৯

চিত্র-৫২ : মোরগ-১, জলরং, ৭৫×৩৭ সেমি, পঞ্চাশের দশক, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫০

চিত্র-৫৩ : তিন কন্যা-১, মেসোনাইটে তেলরং, ৭০×৯১ সেমি, ১৯৫৫, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫১

চিত্র-৫৪ : একাকিত্ব, জলরং, ১৯৬২, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৬

চিত্র-৫৫ : জলকেলি, পেনসিল, ১৯৬২, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৫২

চিত্র-৫৬ : স্নান, তেলরং, ১৫০×৭৫ সেমি, ১৯৫৬, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫২

চিত্র-৫৭ : জেলে, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১০

চিত্র-৫৮ : তিন রমণী, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৫

চিত্র-৫৯ : গরুর স্নান, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৪২

চিত্র-৬০ : বাউল, জলরং, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৪৩

চিত্র-৬১ : কন্যার মালা গাঁথা, জলরং, ৬০×৫০ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৪

চিত্র-৬২ : বাউল, পোস্টার রং, ৭৫×৫১ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৫

চিত্র-৬৩ : জলকেলি-১, জলরং, ৭৫×৫৬ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৬

চিত্র-৬৪ : সুসজ্জিতা, পোস্টার রং, ৭৫×৫০ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৭

চিত্র-৬৫ : বংশীবাদক, পোস্টার রং, ৭৫×৫২ সেমি, ১৯৬৮, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৮

চিত্র-৬৬ : Birds, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

উৎস : *Pakistan Quarterly,* Vol. xiii, No. 2 and 3 Autumn and Winter 1965, Page-103

চিত্র-৬৭ : The Bride, জলরং, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

উৎস : *Contemporary Arts in Pakistan,* Vol. IV, No.3 Autumn 1963, Page-5

চিত্র-৬৮ : Village maid, টেম্পেরা, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

উৎস : *Pakistan Quarterly,* Vol. xiii, No. 2 and 3 Autumn and Winter 1965, Page-103

চিত্র-৬৯ : গল্পগুজব, তেলরং, ৯০×৬৪ সেমি, পঞ্চাশের দশক, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১১৬

চিত্র-৭০ : Vision, জলরং, ষাটের দশক, কামরুল হাসান

উৎস : *Contemporary Arts in Pakistan,* Vol. IV, No.3 Autumn 1963, পৃষ্ঠা-১০২

চিত্র-৭১ : উঁকি, গোয়াশ, ৭৫×৩৭ সেমি, ১৯৬৭, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৩

চিত্র-৭২ : বাংলা একাডেমির বটবৃক্ষে অক্ষর বৃক্ষের প্রথম উদ্বোধন, ১৯৬৯, কামরুল হাসান

উৎস : *কামরুল হাসান*, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২৭

চিত্র-৭৩ : মাছ ধরা, জলরং, ১৬×২৭ সেমি, ১৯৩৮, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৭৪ : ময়ূরাক্ষী, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৭ সেমি, ১৯৪৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৭৫ : সূর্যালোকে কুটির, বোর্ডে তেলরং, ২০×২৯ সেমি, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৭৬ : দুমকার কর্মচঞ্চল জীবন, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৪৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৭৭ : দুমকার পথ-২, বোর্ডে তেলরং, ২১×২৯ সেমি, ১৯৪৫, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৭৮ : দুমকার পথ-৩, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৪৫, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৭৯ : গোপীবাগ, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৮০ : বুড়িগঙ্গা-১, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৮১ : বুড়িগঙ্গা-২, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-৮২ : মুন্সিগঞ্জ, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৮৩ : ধানের হাট, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫২, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৮৪ : বুড়িগঙ্গা-৩, বোর্ডে তেলরং, ২২×৩৪ সেমি, ১৯৫২, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৮৫ : ধান মাড়ানো, ক্যানভাসে তেলরং, ৪৫×৫৬ সেমি, ১৯৫২, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৮৬ : শরবতের দোকান-১, ক্যানভাসে তেলরং, ৬২×৯২ সেমি, ১৯৫৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৮৭ : মুরগির খাঁচা, ক্যানভাসে তেলরং, ৬০×৯০ সেমি, ১৯৫৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৮৮ : মাছ ধরা-১, বোর্ডে তেলরং, ৫৪×১২২ সেমি, ১৯৫৪, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৮৯ : কাঠমিস্ত্রি, বোর্ডে তেলরং, ৬৪×১২২ সেমি, ১৯৫৬, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯০ : গুণটানা-১, তুলি ও কালি, ২৬×৩৪ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯১ : মাছ ধরা, তুলি ও কালি, ১৯×২৩ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯২ : দম্পতি, তুলি ও কালি, ৫১×৩২ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯৩ : বেহালাবাদকসহ ছাদ পেটানো-১, তুলি ও কালি, ২৭×১৫ সেমি, ১৯৫০, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯৪ : গুণটানা-৩, তুলি ও কালি, ৩৪×২২ সেমি, ১৯৫১, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯৫ : জেলের স্বপ্ন (Fisherman's dream), কপার এনগ্রেভিং, ৩১×৪১ সেমি, ১৯৫৭, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯৬ : হলুদ জাল (Yellow Net), কপার এনগ্রেভিং ও সফট গ্রাউন্ড, ২৬×৩৯ সেমি, ১৯৫৭, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯৭ : ঝড়ের পূর্বে (Before the Storm), এচিং এবং অ্যাকুয়াটিন্ট, ৩৮×২৪ সেমি, ১৯৫৮, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯৮ : মাছ ধরা সময়-১, এচিং এবং অ্যাকুয়াটিন্ট, ২৬×৪৭ সেমি, ১৯৬২, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-৯৯ : বিক্ষুব্ধ মাছ (The Angry Fish), এচিং এবং অ্যাকুয়াটিন্ট, ২৬×৪৬ সেমি, ১৯৬৪, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-১০০ : জাল ও মাছ-২ (Net and Fish-2), এচিং এবং চারকোল, ২৫×৫০ সেমি, ১৯৬৬, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-১০১ : Jeuxd' Eau, Copper plate engraving and soft ground etching with stencil colouring on hand made oatmeal Lauriet Paper, 62×48 cm, Stanly William Hayter
Drm : artsy.net

চিত্র-১০২ : বাদাম বিক্রেতা-১, চারকোল ও ক্রেয়ন, ২৪×৩৬ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ
উৎস : www.safiuddinahmed.com

চিত্র-১০৩ : ড্রইং-১, কন্টে ক্রেয়ন (Conte′ Crayon), ২৪×৩৬ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-১০৪ : বেহালাবাদকসহ ছাট পেটানো-২, চারকোল ও ক্রেয়ন, ২৮×৩০ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-১০৫ : শরবতের দোকান (Sherbet Stall), চারকোল ও ক্রেয়ন, ২৫×৩৩ সেমি, ১৯৬০, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-১০৬ : নৌকা এবং গাছ, চারকোল ও ক্রেয়ন, ৫১×৭৬ সেমি, ১৯৬৬, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-১০৭ : পারাপার, তেলরং, ৭৫×৫৫ সেমি, ১৯৫৩, এস. এম. সুলতান

উৎস : *এস. এম. সুলতান*, সাদেক খান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫২

চিত্র-১০৮ : কলসি কাঁখে রমণী, তেলরং, ১২০×৬৮ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

উৎস : *এস. এম. সুলতান*, সাদেক খান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৪

চিত্র-১০৯ : মা ও শিশু, তেলরং, ১২০×৭৫ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

উৎস : *এস. এম. সুলতান*, সাদেক খান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৫

চিত্র-১১০ : নাইয়র, তেলরং, ১২০×৮০ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

উৎস : *এস. এম. সুলতান*, সাদেক খান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৬

চিত্র-১১১ : মাছ ধরা-১, তেলরং, ২৪০×১২০ সেমি, ১৯৬৯, এস. এম. সুলতান

উৎস : *এস. এম. সুলতান*, সাদেক খান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৭

চিত্র-১১২ : রাতে গানের আসর, জলরং, ৪৭×৬১ সেমি, ১৯৫১, আমিনুল ইসলাম

উৎস : *আমিনুল ইসলাম*, ওসমান জামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৪৩

চিত্র-১১৩ : ফ্লোরেন্স, তেলরং, ৬৪×৮৯ সেমি, ১৯৫৪, আমিনুল ইসলাম

উৎস : *আমিনুল ইসলাম*, ওসমান জামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৪৬

চিত্র-১১৪ : ভুলে যাওয়া সুরের ছন্দ, তেলরং, ৯০×৭৫ সেমি, ১৯৬২, আমিনুল ইসলাম

উৎস : *আমিনুল ইসলাম*, ওসমান জামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৫৬

চিত্র-১১৫ : রোডা, তেলরং, ৭৫×১২০ সেমি, ১৯৬০, হামিদুর রাহমান

উৎস *: হামিদুর রাহমান,* Contemporary Art Series of Bangladesh-31, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮৪

চিত্র-১১৬ : আমার প্রিয় রুমাল, তেলরং, ১৯৬৫, হামিদুর রাহমান

উৎস : *হামিদুর রাহমান*, সম্পাদনা : সাঈদ আহমদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫০

চিত্র-১১৭ : জলকেলি, তেলরং, ৯১×৬০ সেমি, ১৯৫৩, মোহাম্মদ কিবরিয়া

উৎস : *মোহাম্মদ কিবরিয়া*, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৫২

চিত্র-১১৮ : কম্পোজিশন হলুদ, মিশ্র মাধ্যম, ষাটের দশক, মোহাম্মদ কিবরিয়া

উৎস : ১৬ *জন শিল্পীর প্রদর্শনী* ১৯৬৫, ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, ঢাকা-২

চিত্র-১১৯ : আবেগ, তেলরং, ৭৬×৫১ সেমি, ১৯৫৪, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১০৯

চিত্র-১২০ : আগামী দিনের অপেক্ষায়-২, তেলরং, ৭৬×৫১ সেমি, ১৯৫৫, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১০৯

চিত্র-১২১ : দুই প্রেমিকার জন্য সঙ্গীত, ক্যানভাসে তেলরং, ৮৫×৯৬ সেমি, ১৯৫৯, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৫৩

চিত্র-১২২ : রমণী ও তক্ষক, মেসোনাইটে ল্যাকার, তেলরং ও কাঠের গুঁড়া, ৫৫×৬৬ সেমি, ১৯৬১, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৫৬

চিত্র-১২৩ : লাল জামা পরিহিতা রমণী, মেসোনাইটে তেলরং ও এনামেল, ৭৩×৬১ সেমি, ১৯৬২, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৫৮

চিত্র-১২৪ : দেয়াল-২৮, ক্যানভাসে তেলরং, ১৫৩×৮৩ সেমি, ১৯৬৭, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৬১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১২৫ : নবান্ন-১, তেলরং, ৯০×৬৭ সেমি, ১৯৫৯, রশিদ চৌধুরী
উৎস : *রশিদ চৌধুরী*, আবুল মনসুর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪২

চিত্র-১২৬ : কিষান-কিষানি, ট্যাপিস্ট্রি, ১৮০×১৫০ সেমি, ১৯৬৫, রশিদ চৌধুরী
উৎস : *রশিদ চৌধুরী*, আবুল মনসুর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৭

চিত্র-১২৭ : নৃত্যরত, গোয়াশ, ৪৫×৩৪ সেমি, ১৯৬৯, রশিদ চৌধুরী
উৎস : *রশিদ চৌধুরী*, আবুল মনসুর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৭

চিত্র-১২৮ : মহাজন, ক্যানভাসে তেলরং, ৫১×৭১ সেমি, ১৯৫৬, কাইয়ুম চৌধুরী
উৎস : *কাইয়ুম চৌধুরী*, মফিদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৫০

চিত্র-১২৯ : পালতোলা, ক্যানভাসে তেলরং, ৯২×৬১ সেমি, ১৯৬৩, কাইয়ুম চৌধুরী
উৎস : *কাইয়ুম চৌধুরী*, মফিদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৫৭

চিত্র-১৩০ : কদলীবৃক্ষ, মেসোনাইটে তেলরং, ৭০×৯১ সেমি, ১৯৬৬, কাইয়ুম চৌধুরী
উৎস : *কাইয়ুম চৌধুরী*, মফিদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৫৭

চিত্র-১৩১ : কম্পোজিশন-৪, বোর্ডে তেলরং, ১৯৬১, আবদুর রাজ্জাক
উৎস : *Abdur Razzaque Retrospective, Rhythms of Figures, Forms and Nature*, Bengal Gallery of Fine Arts, 2008

চিত্র-১৩২ : চাঁদ, নদী ও জলমগ্ন নৌকা, তেলরং, ৮৮×১২০ সেমি, ১৯৫৮, সৈয়দ জাহাঙ্গীর
উৎস : *সৈয়দ জাহাঙ্গীর*, রবিউল হুসাইন ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৫

চিত্র-১৩৩ : ধানভানা-১, তেলরং, ৯০×৭৭ সেমি, ১৯৫৮, কাজী আবদুল বাসেত
উৎস : *কাজী আবদুল বাসেত*, মাহমুদ আল জামান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮

চিত্র-১৩৪ : প্রতিবিম্ব, তেলরং, ৯০×৫৭ সেমি, ১৯৬৮, কাজী আবদুল বাসেত
উৎস : *কাজী আবদুল বাসেত*, মাহমুদ আল জামান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৪৩

চিত্র-১৩৫ : The Hairdresser and the Lazy Women, তেলরং, ষাটের দশক, দেবদাস চক্রবর্তী

উৎস : *Contemporary Arts in Pakistan*, Volume IV, Numbers 1 and 2 : Spring and Summer 1963, Page-18

চিত্র-১৩৬ : কম্পোজিশন, তেলরং, ১৯৬৬, দেবদাস চক্রবর্তী

উৎস : *পঞ্চাশ দশকের নির্বাচিত শিল্পীদের বিশেষ প্রদর্শনী*, ১৯৯৮, বাংলাদেশের চারুকলার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

চিত্র-১৩৭ : বন্যাকবলিত গ্রাম (Flooded Village) এচিং, ২৮×৩৬ সেমি, ১৯৫৮, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-১৩৮ : নেমে যাওয়া বান (Receding Flood), সফট-গ্রাউন্ড অ্যাকুয়াটিন্ট, ৩৭×৫০ সেমি, ১৯৫৯, সফিউদ্দীন আহমেদ

উৎস : *www.safiuddinahmed.com*

চিত্র-১৩৯ : Le Couple, Engraving, soft-ground etching and scorper, 44×29.2 cm, 1952, Stanly William Hayter

উৎস : *artsy.net*

চিত্র-১৪০ : রাখাল, তেলরং, ৯০×১২০ সেমি, ১৯৫৪, আমিনুল ইসলাম

উৎস : *আমিনুল ইসলাম*, ওসমান জামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৪৮

চিত্র-১৪১ : Bacchanal (The Battle of love), oil on canvas, 15×18.5in ,1875-76, Paul Cezanne

উৎস : *nga.gov/collection/art-object-page.53120.html*

চিত্র-১৪২ : The Bay from; L, Estaque, 31.5×38.5in , oil on canvas, 1886, Paul Cezanne

উৎস : *Commons.wikimedia.org*

চিত্র-১৪৩ : Les Demoisells d'Avignon, 96×92in , oil on canvas, 1907, Pablo Picasso

উৎস : *artsy.net*

চিত্র-১৪৪ : মসজিদে লাল মাছ, তেলরং, ১৯৬১, কাইয়ুম চৌধুরী

উৎস : *Contemporary Arts in Pakistan*, Winter 1961 : Vol.II, No.4, Page-14

চিত্র-১৪৫ : জড়জীবন, ক্যানভাসে তেলরং, ২৮×৪৩ সেমি, ১৯৫৭, দেবদাস চক্রবর্তী

উৎস : *দেবদাস চক্রবর্তী*, আনিসুজ্জামান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৯

চিত্র-১৪৬ : The Sarod Player, তেলরং, 82×36in, 1951, Paritosh Sen

উৎস : *Paritosh Sen, Contemporary Indian Art Series*, Editor Jaya Appasamy, Lalit Kala Akademi, 1975

চিত্র-১৪৭ : Dreamboat, Abdur Rahman Chughtai

উৎস : *Contemporary Painting in Pakistan*, Marcella Nesom Sirhandi, Ferozsons (Pvt) LTD Lahore-Karachi-Rawalpindi, 1992, Page-35

চিত্র-১৪৮ : Portrait of Shakir Ali, oil, Anna Molka Ahmed

উৎস : *Art in Pakistan*, Jalal Uddin Ahmed, Pakistan Publications, 1954, Page-95

চিত্র-১৪৯ : Person at Sandpit, oil on board, 36 ×48in, Sadequain

উৎস : *Contemporary Arts in Pakistan*, Volume 1, Number 5, May 1960, Page-2

চিত্র-১৫০ : তিন আত্মা (Three Souls), ১৯৫৮, মোহাম্মদ কিবরিয়া

উৎস : *Pakistan Quarterly*, Vol. viii, No.4, Spring-1959, Page-32

চিত্র-১৫১ : মা ও শিশু (Mother and Child), পঞ্চাশ দশকের শেষের দিক, কাজী আবদুল বাসেত

উৎস : *Pakistan Quarterly*, Vol. viii, No.4, Spring-1959, Page-33

চিত্র-১৫২ : দুর্গত, তেলরং, ৬১×৯১ সেমি, ১৯৫৮, আমিনুল ইসলাম

উৎস : *আমিনুল ইসলাম*, ওসমান জামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৫৩

চিত্র-১৫৩ : দেয়াল-৪৮, ক্যানভাসে তেলরং, ১২১×৮৮ সেমি, ১৯৬৭, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৬৫

চিত্র-১৫৪ : গোধূলি-১, মেসোনাইটে তেলরং, ৭০×৯১ সেমি, ১৯৬৫, কাইয়ুম চৌধুরী

উৎস : *কাইয়ুম চৌধুরী*, মফিদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৮

চিত্র-১৫৫ : ঝরাপাতায় শিশিরবিন্দু, তেলরং, ষাটের দশক, কাজী আবদুল বাসেত

উৎস : ১৬ *জন শিল্পীর প্রদর্শনী* ১৯৬৫, ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, ঢাকা-২

চিত্র-১৫৬ : (শিরোনাম পাওয়া যায়নি) বোর্ডে তেলরং, ১১৪×৪৮ সেমি, ১৯৬৩, মোহাম্মদ কিবরিয়া

উৎস : *Permanent Art collection*, Faculty of Fine Arts, University of Dhaka.

চিত্র-১৫৭ : রূপান্তর-১, অ্যাক্রেলিক, ৫৫×৭০ সেমি, ১৯৬৭, আমিনুল ইসলাম

উৎস : *আমিনুল ইসলাম*, ওসমান জামাল, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৫৮

চিত্র-১৫৮ : দেয়াল-৫৮, ক্যানভাসে তেলরং, ১০৪×১৩৭ সেমি, ১৯৬৯, মুর্তজা বশীর

উৎস : *মুর্তজা বশীর*, হাসনাত আবদুল হাই, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৬৬

চিত্র-১৫৯ : নৌকা, মেসোনাইটে তেলরং, ৭২×৬১ সেমি, ১৯৬৭, কাইয়ুম চৌধুরী

উৎস : *কাইয়ুম চৌধুরী*, মফিদুল হক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৬০